সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

ভ. বুজুয়েভ. ভ. গরোদনভ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

টাৎ-/ ১৩৩/২

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

ভ. বুজুয়েভ, ভ. গরোদনভ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার
সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভোলকভ (প্রধান সম্পাদক),
ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক),
ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন,
ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউরলভ

ABC социально-политических знаний

В. Бузуев, В. Городнов

ЧТО ТАКОЕ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ?

На языке бенгали

ABC of social and political knowledge

V. Buzuev, V. Gorodnov

WHAT IS MARXISM-LENINISM?

In Bengali

© Progress Publishers, 1987
© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Б $\frac{0104000000-258}{014(01)-88}$ 295—88

ISBN 5-01-000807-6

সূচি

পাঠকের প্রতি ৫

মুখবন্ধ ৯

প্রথম অধ্যায়। **মার্কসবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পর্যায়** ১১

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ১২

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ১৭

লেনিনবাদ — মার্কসবাদের বিকাশে নতুন পর্যায় ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়। **মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দার্শনিক ভিত্তি** . ৫৩

১। দ্বান্দিক বস্তুবাদ ৫৭

বস্তুসত্তা, তার ধর্ম ও অস্তিত্বের রূপ . . . ৫৭

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ৬৬

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রজ্ঞান তত্ত্ব ৭৮

২। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ৮৩

সামাজিক বিকাশের প্রধান কথা — বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের পদ্ধতি ৮৩

শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রাম আর রাষ্ট্র ৯১

সামাজিক চেতনা ও ভাবাদর্শ ৯৮

ইতিহাসে জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকা . . . ১০২

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের তাৎপর্য . ১০৪

তৃতীয় অধ্যায়। **মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অর্থনৈতিক মূলনীতি** ১০৬
রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র কী নিয়ে চর্চা করে . . ১০৬
মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ ১০৯
সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায় ১২৪
সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র ১৪১
চতুর্থ অধ্যায়। **বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব** ১৫৭
বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উদ্ভব ও মর্মার্থ . ১৫৮
শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক ব্রত . . . ১৬৩
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ১৭২
বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা এবং রূপের বৈচিত্র্য ১৮০
পঞ্চম অধ্যায়। **বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের মহতী শক্তি — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ** ১৯০
মহান অক্টোবর ও বাস্তব সমাজতন্ত্র . . . ১৯২
সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা — বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের নির্ধারক শক্তি ২১৪
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন ২২৯
জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ২৪৮
যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ২৬৯
ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ ২৯৩

পাঠকদের প্রতি

নতুন একবিংশ শতাব্দী আসতে আর বিশেষ দেরি নেই। মানবজাতির সামনে খুলে যাচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় অগ্রগতির নতুন দিগন্ত।

বর্তমান শতক ইতিহাসে স্থান পাবে বিপুল বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের একটা যুগ বলে, বিশ্বের চেহারা যাতে আমূল বদলে গেছে। বিশ্ব-ঐতিহাসিক একটা ঘটনা হল ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়, যাতে উন্মুক্ত হয় সমাজতন্ত্রের যুগ। সোভিয়েত ইউনিয়নে গঠিত হচ্ছে বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ, ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমজীবী মানুষ পরিণত হল দেশের সত্যকার মালিকে, নিজের ভাগ্যের সক্রিয় ও সচেতন বিধাতায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সঙ্গে

নতুন ন্যায়সঙ্গত সমাজ নির্মাণের পথ নিয়েছে অন্যান্য অনেক দেশ।

আমাদের প্রজন্মের চোখের সামনে ধ্বসে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের কলংকজনক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা: এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ স্বাধীন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রশস্ত পথে এসে দাঁড়িয়েছে; আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন একচেটিয়া পুঁজির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অর্জন করেছে প্রভূত সাফল্য।

এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তনে প্রমাণিত হয়েছে একালের মহত্তম মতবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিকতা। তার অক্ষয় শক্তি নিহিত অবিরাম বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভের সামর্থ্যে। প্রতিটি নতুন প্রজন্মের মানুষই এ মতবাদে পাচ্ছে তাদের সম্মুখস্থ সমস্যার জবাব।

প্রতিটি লোক, প্রতিটি জনগোষ্ঠীই তাদের নিজেদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ন্যায্য ব্যবস্থা ও শান্তিপূর্ণ জীবনের স্রষ্টা। বর্তমানে মানুষের প্রাথমিক অধিকার, শান্তি ও মুক্তির পরিস্থিতিতে জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর কিছু নেই।

জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা থাকবে 'প্রগতি' প্রকাশনের 'সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ' নামে জনবোধ্য গ্রন্থমালায়।

এ গ্রন্থমালা বিশটির বেশি বই নিয়ে। আমাদের কালে বিশ্বের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিকাশ

বোঝার পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ সব প্রসঙ্গ নিয়ে তা রচিত। বইগুলিতে থাকবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের মূলকথা, লেখা সহজ বোধগম্য ভাষায়। বইগুলি বোঝার জন্য কোনোরকম বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে পাঠকেরা নিজে নিজেই সেইসব জরুরি সমস্যা ও বাস্তব নিয়মগুলির জ্ঞান লাভ করে যা অনুসারে বিকশিত হচ্ছে বিশ্বের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, জনগণের এবং প্রতিটি মানুষের জীবন।

গ্রন্থমালা শুরু হচ্ছে 'সমাজবিদ্যার পাঠসহায়িকা' দিয়ে। তাতে থাকবে ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস, ভ. ই. লেনিনের মূল রচনাদি থেকে উদ্ধৃতি। তার পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, দর্শন, রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, রাষ্ট্র, পার্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে বই।

প্রতিটি বইয়ের সঙ্গেই থাকবে ব্যবহৃত পরিভাষার ব্যাখ্যা। সেগুলি এমনভাবে রচিত যাতে পাঠক সহজেই বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত করে উত্তরোত্তর কঠিন প্রশ্নের অধ্যয়নে চলে যেতে পারেন।

সামাজিক বিকাশের সমস্যায় যাঁরা আগ্রহী, নিজেদের জনগণ ও সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নিয়ে যাঁরা ভাবিত, 'সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ' গ্রন্থমালা তাঁদের জন্য রচিত বলে তা ছাপা হচ্ছে নানা ভাষায়। ১৯৮৫ সাল থেকে তা বেরতে শুরু করেছে ইংরেজি, স্পেনীয়, ফরাসী, পর্তুগীজ, ইতালীয়,

গ্রীক, বাংলা, হিন্দি, তামিল, সোহালি, আমহার, মালাগাসি প্রভৃতি ভাষায়।

যাঁরা লেখক, তাঁরা বড়ো দরের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ। আশা করি বইগুলি পড়তে পাঠকেরা আগ্রহ বোধ করবেন।

ভ. আফানাসিয়েভ,
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান
আকাদেমির আকাদেমিসিয়ান

বহু যুগ ধরে লোকে মুক্তি, ন্যায়, সর্বসাধারণের জন্য সুখী জীবনের পথ খুঁজে আসছে। নিজেদের চারপাশে জনগণের দুঃখকষ্ট ও দুর্দশা লক্ষ করে, তাদের দৈন্য ও অধিকারহীনতা দেখে চিন্তাশীল মহানুভব ব্যক্তিরা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেন নি। শোষিত জনগণকে তাঁরা উত্থিত করেছেন অত্যাচারী ও ধনীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে।

মুক্তি ও ন্যায়ের নামে, সর্বসাধারণের সুখের জন্য দেখা দিয়েছে বহু মতবাদ, সামাজিক আদর্শ। প্রস্তাবিত হয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত করার নানা পথ ও পদ্ধতি। কিন্তু যা হবে শ্রম, শান্তি, মুক্তি, সাম্য, সামাজিক ন্যায়ের রাজ্য,

তেমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ কেউ দেখাতে পারেন নি।

সমাজ বিকাশের সমস্ত পূর্বতন অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণা বিচার-বিশ্লেষণ করে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) গত শতকের মাঝামাঝি একটা নতুন বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তাঁদের সাধনার মহান উত্তরসাধক হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)।

মার্কস ও লেনিনের নাম অবলম্বনে এ মতবাদকে বলা হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কী জিনিস?

প্রথম অধ্যায়

মার্কসবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পর্যায়

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক তন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নীতিতে সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজার দায়িত্ব পড়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর ওপর। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল তার বিশ্ববীক্ষা। এ হল বিশ্বকে জানা ও তার বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের বিদ্যা, সমাজের, প্রকৃতির মানবিক চিন্তাধারা বিকাশের নিয়মগুলির বিদ্যা।

এই মহান বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। যে ধৈর্য ধরতে পারে, সত্য জানার প্রবল স্পৃহা যার আছে, সে অবশ্যই তা থেকে প্রগাঢ় সৃজনী

পরিতৃপ্তি লাভ করবে, প্রথম আত্মিক আবিষ্কারের আনন্দ পাবে। জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকে মার্কস তুলনা করেছেন উঁচু পাহাড়ে ওঠার সঙ্গে। তিনি সদুপদেশ দিয়েছেন: 'বিজ্ঞানে প্রশস্ত পাকা সড়ক কিছু নেই, তার দীপ্ত শিখরে কেবল সেই পোঁছতে পারবে, যে ক্লান্তির ভয় না করে তার পাথুরে হাঁটা-পথ দিয়ে হেঁচড়ে উঠবে।'*

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র

কমিউনিজমের স্বপ্ন

সুখের জীবন নিয়ে স্বপ্ন আর উপকথার শেষ ছিল না, এমন একটা সমাজ, নাগরিকেরা যেখানে মুক্ত আর সমাধিকারী, সবাই যেখানে একই রকম খাটে, সকলেরই আছে যথেষ্ট খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, তার কল্পনা লোকে করে আসছে শতকের পর শতক ধরে।

ষোল-সতেরো শতকের গভীর থেকে আমরা পেয়েছি ইংরেজ টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫) আর ইতালিয়ান তমাসো কাম্পানেলার (১৫৬৮-১৬৩৯) উজ্জ্বল ধ্যানধারণা। ন্যায়পরায়ণ এক সমাজের

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ২৫। (লাতিন হরফে দেওয়া উল্লেখ ছাড়া পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থ-নির্দেশিকাগুলি রুশ সংস্করণ অনুসারে। — সম্পাঃ)

মোহনীয় ছবি আঁকেন তাঁরা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, শোষণ বিলুপ্ত, সবাই খাটতে বাধ্য। ধনীদের, অলসদের ওপর তীব্র কষাঘাত করেন তাঁরা। টমাস মুর ক্ষেপে ওঠেন: 'তাম্রময় কী একটা ললাট, গাছের কাটা গুঁড়ির চেয়ে বুদ্ধি যেখানে বেশি নেই, ততটাই নির্লজ্জ যতটা নির্বোধ, সেই কিনা নিজের কাছে দাসত্বে বেঁধে রাখে বহু বুদ্ধিমান আর ভালো লোকেদের।' এই অবস্থার কারণ তিনি দেখেছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে, লোকেদের অধিকারের অসাম্যে।

'রাষ্ট্রের সর্বোত্তম ব্যবস্থা এবং নতুন দ্বীপ ইউটোপিয়া বিষয়ে স্বর্ণ গ্রন্থ, যা যেমন মজাদার তেমনি হিতকর' নামে বই লেখেন টমাস মুর। ('ইউটোপিয়া' হল গ্রীক শব্দ, তাতে বোঝায় এমন জায়গা যার অস্তিত্ব নেই)। দ্বীপের ইউটোপিয়া নামটা হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতিবাচক। তাই যাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রচার করেছেন, কিন্তু কী করে তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার উপায় জানতেন না, তাঁদের বলা হয় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। নিজের বইটায় মুর আশ্চর্য এক রাজ্য ইউটোপিয়ার কথা বলেছেন, সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, সম্পত্তি সবাকার, সবাই সেখানে খাটতে বাধ্য। শ্রমের ফলে যা উৎপন্ন হল, সেটা থাকে সমাজের দখলে। সামাজিক ভাণ্ডার থেকে তা বণ্টিত হয় যার যেমন চাহিদা সেই অনুসারে এবং বিনা মূল্যে। সবকিছুই সবার দখলে, এই হল ইউটোপীয় রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র।

আরেকজন ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী তমাসো

কাম্পানেলা তাঁর 'সৌর নগর' গ্রন্থে ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছেন। 'সৌর রাষ্ট্র' হল হাসিখুশি স্বাধীন লোকেদের ইউনিয়ন, মেহনতিদের মেল। তাদের কাছে শ্রম একটা হাড়ভাঙা কষ্টকর ব্যাপার কিছু নয়, বরং প্রীতিকর চিত্তাকর্ষক ক্রিয়াকলাপ, সম্মান আর গৌরবের বিষয়। শহরের প্রতীকধর্মী নামটাতেই যেন কেমন একটা কবিতা আর সঙ্গীতের ছোঁয়া লেগেছে। সেখানে জীবন্ত সবকিছুই সূর্যমুখী। সূর্য মানে আলোক আর আনন্দ। সূর্যকিরণে প্রকাশ পাচ্ছে কমিউনিজমের আদর্শ।

মুর আর কাম্পানেলার ধ্যানধারণায় খুবই প্রভাবিত হয় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের পরবর্তী পুরুষদের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এঁরা হলেন ফরাসি ক্লদ আঁরি সাঁ-সিমোঁ (১৭৬০-১৮২৫) আর শার্ল ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭), ইংরেজ রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮)। ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা, ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজ সম্পর্কে অনেক প্রতিভাদীপ্ত উক্তি করেন। তবে নিতান্ত সরলতাবশে তাঁরা ভেবেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা যদি লোকেরা একবার জেনে যায় তাহলেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাঁরা মনে করতেন যে সমাজের পুনর্গঠন হতে পারে সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, শিক্ষামূলক প্রচারে।

সাঁ-সিমোঁ আর ফুরিয়ের বৈশিষ্ট্য হল বুর্জোয়া সমাজের তীক্ষ্ম সমালোচনা, তার দোষত্রুটির উদ্‌ঘাটন। ফুরিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে

আগেকার ঐতিহাসিক ব্যবস্থাগুলির মতো বুর্জোয়া সমাজ একটা সাময়িক ব্যাপার, ভবিষ্যতের সুসমঞ্জস সমাজব্যবস্থার কাছে স্থান ছেড়ে দিতে তা বাধ্য হবে।

তবে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের স্বপ্নগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত হবার মতো ছিল না। যেমন, সাঁ-সিমোঁ তাঁর সমাজ সমন্বয়নের ধ্যানধারণা নিয়ে ইউরোপের রাজাদের কাছে আবেদন জানান এই আশায় যে তারা তাঁর স্বপ্নকে কাজে পরিণত করবে। নতুন সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অর্থ দান করার জন্য বড়োলোকদের কাছে ফুরিয়ে আবেদন ছাপান সংবাদপত্রে। রোজ বেলা বারোটায় তিনি বাড়ি ছুটতেন এই আশায় যে নির্ধারিত ঐ সময়টায় লাখপতিরা নিশ্চয় আসবে তাদের প্রথম চাঁদা দেবার জন্য। কিন্তু তেমন তাড়া ছিল না ধনীদের। উৎপীড়কেরা যে স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা, ঐশ্বর্য, বিশেষাধিকার বিসর্জন দেবে না, একথা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা বোঝেন নি।

রবার্ট ওয়েনের ক্রিয়াকলাপ কেবল ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ রচনাতেই সীমিত থাকে নি। ব্যবহারিক কাজকর্মেও নেমেছিলেন তিনি। যে কারখানাটার তিনি ছিলেন অন্যতম মালিক, সেখানে তিনি দুঃসাহসী পরীক্ষা চালাবার সংকল্প নেন। কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেন তিনি, শ্রমিকদের বেতন বাড়ান, শিশুদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন খোলেন। ১৮২৪ সালে আমেরিকায় যান সেখানে কমিউনিস্ট শ্রমসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তবে সে কমিউন অচিরেই ভেঙে যায়। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীর চমৎকার সব চিন্তাভাবনা নিষ্করুণ

বাস্তবের সংস্পর্শে, পংজিবাদী সমাজের আসল জীবনের সঙ্গে সংঘাতে বানচাল হয়ে যায়।

প্রতিভাবান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের অনুমান আর ধ্যানধারণা কেন অবাস্তব? কেননা তাঁরা মজুরি-দাসত্বের মর্মার্থ ধরতে পারেন নি, আবিষ্কার করতে পারেন নি সামাজিক বিকাশের নিয়মাদি, বোঝেন নি শ্রেণী-সংগ্রাম চালানোর আবশ্যিকতা, প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাঁদের কাছে শ্রমিকেরা ছিল হতভাগ্য, নিপীড়িত একটা শ্রেণী মাত্র, তেমন একটা মহতী বৈপ্লবিক শক্তি নয় যা পংজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণে সক্ষম।

অবশ্য প্রলেতারিয়েত তখন যথেষ্ট সংগঠিত ছিল না, তা সত্যি। শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য ছিল ঠিকই, কিন্তু নিজেরাই তারা নিজেদের অবস্থার কথা, মহতী সামাজিক ভূমিকার কথা বুঝবে, তেমন পরিস্থিতি ছিল না। ঠিক এই কারণেই সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনের দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্র হয় বৈজ্ঞানিক নয়, ইউটোপীয়। মহানুভব নিঃসঙ্গ স্বপ্নচারীর ভূমিকাই ছিল তাঁদের নির্বন্ধ, তাঁদের ধ্যানধারণা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সমাজতন্ত্রের নীতিতে বিশ্বকে রূপান্তরিত করার মতো একটা বৈষয়িক শক্তি হয়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের ধ্যানধারণার অপরিপক্বতা সত্ত্বেও তাদের ঐতিহাসিক অবদান অসাধারণ বৃহৎ। পংজিতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে, তাতে কষাঘাত করে তার স্থলে অন্য সমাজতান্ত্রিক

সমাজ স্থাপনার প্রশ্ন তাঁরাই তুলেছিলেন প্রথম। এঙ্গেলসের কথায়, সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে আর ওয়েন তাঁদের মতবাদের সমস্ত উৎকল্পনা আর ইউটোপীয়তা সত্ত্বেও মানবজাতির মহত্তম মনীষীর অন্তর্গত। ভবিষ্যৎ সমাজের অনেকগুলি দিক তাঁরা প্রতিভার সঙ্গে ধরতে পেরেছিলেন আগেই।

ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজ সম্পর্কে যেসব অনুমান ও ভাবনাদি উপস্থিত করেছিলেন ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা, বিজ্ঞানের দিক থেকে সেগুলিকে সুসিদ্ধ করেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন।

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা

মার্কসবাদ উদ্ভবের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত

মার্কসবাদের উদ্ভব পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায় ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্র গতিপথে। সর্বাগ্রে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ, তার বৈরবিরোধগুলির তীক্ষ্ণায়ণ, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক পরিপক্বতা বৃদ্ধি, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তার ক্রমেই পরাক্রান্ত অভিযানের ফলে।

নেদার্ল্যান্ডসে (ষোলো শতক), ইংলন্ডে (সতের শতক) আর ফ্রান্সে (আঠারো শতক) প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির ফলে সামন্ততন্ত্রের ওপর জয়লাভ করে পুঁজিতন্ত্র। ধ্বসে পড়ল ভূমিদাস প্রথা। ভূলুণ্ঠিত

হল পরারাজতান্ত্রিক সব সিংহাসন। পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উঠে দাঁড়াল ব্যাপক স্তরের জনগণ, প্রভুত্বকারী শ্রেণীদের দেখিয়ে দিল তাদের শক্তি।

নির্মম সংগ্রাম চালিয়ে প্রলেতারিয়েত শুধু বেতন বৃদ্ধি, শ্রমদিন হ্রাস প্রভৃতি অর্থনৈতিক দাবিতেই সীমাবদ্ধ থাকছিল না। রাজনৈতিক মুক্তির জন্যও লড়াই করছিল। যেমন, ফ্রান্সের লিয়োঁ শহরে অভ্যুত্থানী শ্রমিক ও কারুশিল্পীরা (১৮৩১ ও ১৮৩৪) জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্র ঘোষণারও দাবি করে। ইংলন্ডে শ্রমিকদের চার্টিস্ট আন্দোলন (ইংরেজি charter বা সনদ শব্দ থেকে) গত শতকের ৩০-ও ৪০-এর দশকে খোলাখুলি শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক লক্ষ্যও সামনে রাখে। চার্টিস্ট আন্দোলন হল প্রথম ব্যাপক, সত্যি করেই গণধর্মী, রাজনৈতিকভাবে দানাবাঁধা প্রলেতারীয় বৈপ্লবিক আন্দোলন।

জার্মানিতে সাইলেসিয়ার তাঁতিদের অভ্যুত্থান (১৮৪৪) হল শ্রমিক শ্রেণীর এক বৃহৎ অভিযান। এ অভ্যুত্থান হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মান প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের শুরু। ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মে তা খুবই প্রভাব ফেলে।

বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের আপোসহীন শ্রেণী-সংগ্রামই হল মার্কসবাদ উদ্ভবের প্রধান সামাজিক-অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক আয়তন লাভ

করে। সংগ্রামের নিম্ন অর্থনৈতিক রূপ থেকে তা উঠে যায় উচ্চতর রাজনৈতিক রূপে। সংখ্যার দিক থেকে বেড়ে উঠে শ্রমিক শ্রেণী বুঝতে শুরু করে যে এক-একজন কলমালিকের কাছে কেবল অর্থনৈতিক দাবি পেশ করাই যথেষ্ট নয়। বাস্তব জীবনই শ্রমিকদের শেখায় যে পুঁজিপতিদের পেছনে রয়েছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের সমগ্র ক্ষমতা, রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম না চালিয়ে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে লড়া যায় না। সেসময়কার সমাজতান্ত্রিক মতবাদে শ্রমিক শ্রেণী খুঁজছিল যেসব প্রশ্নে তারা আলোড়িত তার উত্তর কিন্তু মার্কসের আগেকার ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ছিল সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম।

সমাজ আর তার বিকাশ সম্পর্কে মতবাদে সত্যকার একটা বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

কার্ল মার্কস — মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ছিলেন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ও মহান বিপ্লবী। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁদের গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল, অবিরাম তাঁরা খোঁজ রাখতেন নবতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের, সামাজিক জীবনের ঘটনাবলির, সৃজনশীলতার সঙ্গে তা নিয়ে ভাবতেন, সামান্যীকরণে পেশছতেন। বিশেষ মন দিয়ে তাঁরা অনুধাবন করতেন

সারা বিশ্বের, সর্বাগ্রে ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলন। এতে তাঁদের সাহায্য করত বহু ভাষার জ্ঞান। মার্কস পড়তেন ও কথা বলতেন জার্মান ছাড়াও ফরাসি, ইংরেজি, স্পেনীয় ভাষায়, জানতেন লাতিন, গ্রীক। ২০টি ভাষায় দখল ছিল এঙ্গেলসের। মানব প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ যা-কিছু সৃষ্ট হয়েছিল, বিচারপূর্বক তা সব খতিয়ে দেখে তাঁরা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটান, বিশ্ব ঢেলে সাজার সুঠাম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন, আবিষ্কার করেন মানবিক ইতিহাস বিকাশের নিয়ম।

কার্ল মার্কসের জন্ম ১৮১৮ সালের ৫ মে প্রাশিয়ার ট্রিভস শহরে (রাইন প্রদেশ) আইনজীবী পরিবারে। তাঁর পিতা হেনরিখ মার্কস ছিলেন অতি সুশিক্ষিত, নিজের পেশায় সুদক্ষ, সন্তানদের মানুষ করেছেন ভলটেয়ার, রুসো, লেসিঙ্গের মতো অগ্রণী জ্ঞানপ্রচারক তথা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের ধ্যানধারণায়।

১৮৩০ সালে মার্কস ট্রিভস জিমনাসিয়ামে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর মানস জগৎ রূপ নিতে থাকে স্বাধীনভাবে, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্যের গ্রন্থাদি পাঠের মাধ্যমে। অল্প বয়স থেকেই তিনি মানুষের সুখের জন্য, ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে আত্মনিয়োগের কথা ভাবতে থাকেন। এইসব ভাবনাচিন্তা ও মনোভাব প্রতিফলিত হয় ‘পেশা নির্বাচন প্রসঙ্গে কিশোরের ভাবনা’ নামক তাঁর স্নাতক রচনায়। স্বাধীন পথের দ্বারদেশে মার্কসের মনে যে ভাবনাটা দানা বাঁধে, সেটা কার্যত হয়ে দাঁড়ায় তাঁর গোটা জীবনের মর্মবাণী —

মানবজাতির জন্য কাজ করে যেতে হবে। তিনি সচেতন ছিলেন যে পথটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু তাতে তিনি ভয় পান না। তাঁর নির্বাচিত পথের গুরুভার দায়িত্বের কথা তিনি ভালোই বুঝতেন: 'এমন পেশা যদি আমরা বেছে থাকি যার কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খাটা যাবে মানবজাতির জন্য, তাহলে তার ভারে আমরা নুয়ে পড়ব না...'*

ছাত্রজীবনে (বনে, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে) মার্কস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, আইন। ১৮৪১ সালে মার্কস সাফল্যের সঙ্গে তাঁর থিসিস সমর্থন করেন যাতে প্রকাশ পায় তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও ক্ষুরধার মনন শক্তি। এই প্রসঙ্গে তাঁর তারুণ্যের একজন বন্ধু মোজেস হেসের উক্তিটি চিত্তাকর্ষক। বন্ধুর কাছে পত্রে তিনি লেখেন: '...বৃহত্তম, বর্তমানে জীবিতদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র সত্যকার দার্শনিকের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য তৈরি থাকো। আমার এই অরাধ্যের নাম ডক্টর মার্কস, এখনো একেবারেই তরুণ (সম্ভবত ২৪ বছরের বেশি নয়); মধ্যযুগীয় ধর্ম আর রাজনীতির ওপর শেষ আঘাত হানছেন তিনি। তাঁর মধ্যে মিলেছে সূক্ষ্ম রসবোধের সঙ্গে প্রগাঢ় দার্শনিক গুরুগাম্ভীর্য; কল্পনা করো এক ব্যক্তির মধ্যে রুসো, ভলটেয়ার, গোলবাখ, লেসিঙ্গ, হাইনে আর হেগেলের যোগ; আমি বলছি

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৪০, পৃঃ ৭।

যৌগ, যান্ত্রিক মিশ্রণ নয় — তবেই কল্পনা করতে পারবে ডক্টর মার্কসকে।'

১৮৪২ সালে মার্কস হন 'রাইনিশে ত্সাইতুঙ্গ'এর কর্মচারী এবং পরে তার পরিচালক। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে সেই মঞ্চ যেখান থেকে মার্কস তীব্র আবেগে কষাঘাত করতেন অমানুষিক প্রুশীয় ব্যবস্থায়, সামন্তদের আধিপত্য আর আমলাতন্ত্রের জুলুম-জবরদস্তিতে, সম্প্রদায়ভেদী বিশেষাধিকারে, মুদ্রণের স্বাধীনতা দলিত করা সেন্সর প্রথায়। নিপীড়িত মেহনতি জনগণের পক্ষ নিতেন তিনি। এতে ক্রুদ্ধ হয় প্রুশীয় শাসকমহল। ১৮৪৩ সালের গোড়ায় পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়। মার্কস জার্মানি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তাঁর জীবনে নতুন একটা পর্ব শুরু হল জেনি ফন ভেস্টফালেনের সঙ্গে একত্রে। তাঁর মধ্যে মার্কস পেয়েছিলেন তাঁর গোটা জীবনের সহযাত্রিনীকে। এঙ্গেলসের কথায়, তিনি কেবল স্বামীর ভাগ্য, শ্রম, সংগ্রামের ভাগিদারই ছিলেন না, নিজেই তাতে অংশ নিতেন অসাধারণ সচেতনতায় আর দৃপ্ত আবেগে।

১৮৪৩ সালের শুরুতে মার্কস বাসা পাতেন প্যারিসে, সেখান থেকে প্রকাশ করেন 'জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী' নামে একটি পত্রিকা। তাতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধ 'আইনের হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ভূমিকা'। তাতে তিনি প্রথম প্রতিপাদন করেন এই প্রতিভাদীপ্ত ভাবনা যে প্রলেতারিয়েতই সেই বাস্তব শক্তি যা সক্রিয় বৈপ্লবিক কর্মে সক্ষম। প্রলেতারিয়েতই

হল তত্ত্ব আর প্রয়োগের মধ্যে, দর্শন আর জীবনের মধ্যে সংযোগ-গ্রন্থি। অন্য কথায়, প্রলেতারিয়েতের কাজ হল শোষণ থেকে মুক্ত সমাজের ধারণাটাকে বাস্তবে পরিণত করা।

নতুন সমাজ কেমন হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে মার্কস '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক দার্শনিক পাণ্ডুলিপি'তে কমিউনিজমকে বলেছেন সত্যকার, সুসম্পূর্ণ মানবতার সমাজ, যা তার সমস্ত সভ্যদের দেয় সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ। তিনি আরো এগিয়ে গিয়ে উদ্ঘাটন করেন সংগ্রামের সত্যকার লক্ষ্য — কমিউনিজমের আদর্শের জন্য সংগ্রাম, খুঁজে পান সেই বাস্তব শক্তিকে যা এ আদর্শ রূপায়িত করতে সক্ষম — শ্রমিক শ্রেণীকে।

এইভাবে ছাব্বিশ বছর বয়সে মার্কস উপনীত হলেন বিশ্ব সম্পর্কে, সমাজজীবন সম্পর্কে নতুন একটা সত্যকার, বৈজ্ঞানিক অভিমতে। সেটা সম্ভব হয়েছিল বিপুল সৃজনী ক্রিয়াকলাপের পরিণামে। দর্শনের, সামাজিক চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রের ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমগ্র উত্তরাধিকার আয়ত্ত করে, বিচার করে তাকে তিনি ঢেলে সাজেন।

মার্কসবাদের উদ্ভব হয় কেবল মানবজাতির আত্মিক কৃতিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা ও সাধারণীকরণ থেকে নয়, বুর্জোয়া সমাজের, ইতিহাসের দিক থেকে যে সমাজ সাময়িক, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তার বিকাশের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির অভিব্যক্তি হিশেবেও।

কমিউনিজমে মার্কস চূড়ান্তরূপে উত্তীর্ণ হন ১৮৪৪ সালে। ঠিক এই সময় থেকেই শুরু হয় বৈজ্ঞানিক কমিউনিস্ট বিশ্ববীক্ষা, মার্কসবাদের বিকাশ। তবে মার্কসীয় তত্ত্বকে সব দিকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল আরো বিপুল বৈজ্ঞানিক-গবেষণামূলক ও ব্যবহারিক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ। এই সুবিশাল কাজটা সম্পন্ন হয় এঙ্গেলসের সঙ্গে একত্রে। এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের প্রথম দেখা হয় প্যারিসে, ১৮৪৪ সালে। সেই সময় থেকে তাঁদের আন্তরিক সৌহার্দ্য আর একত্রে গুরুভার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের সূত্রপাত। ১৮৪৭ সালের বসন্তে মার্কস কমিউনিস্ট লীগের সঙ্গে যুক্ত হন। এঙ্গেলসের সঙ্গে একত্রে তিনি রচনা করলেন প্রখ্যাত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' — শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম কর্মসূচি। ১৮৪৯ সালে মার্কস উঠে আসতে বাধ্য হন লণ্ডনে, মৃত্যু অবধি সেখানেই তিনি থাকেন।

প্রবাসে মার্কসের জীবন ছিল খুবই কষ্টকর। এঙ্গেলসের কাছ থেকে আর্থিক পোষকতা না পেলে দারিদ্র্যের চাপে তিনি মারাই পড়তেন। অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়াত যে মাঝে মাঝে তিনি বাড়ি থেকে বেরতেই পারতেন না, কেননা পোশাক বাঁধা দিতে হয়েছে। এঙ্গেলসের নিকট পত্রে ১৮৫২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি লেখেন: 'আমার স্ত্রী অসুস্থ, জেনিখেন (কন্যা) অসুস্থ... ডাক্তার ডাকতে পারি নি, ওষুধের টাকা না থাকায় তা সম্ভবও নয়। ৮-১০ দিন ধরে আমাদের পরিবার পাঁউরুটি আর আলু খেয়ে

আছে, আজ সেটুকুও যোগাড় করতে পারব কিনা সন্দেহ।'*

তবে অভাব-অনটন সত্ত্বেও মার্কস বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে বেশ ব্যাপৃত থাকতেন। 'পুঁজি' গ্রন্থটি নিয়ে তিনি খেটেছেন চল্লিশ বছর। এর জন্য তিনি মালমশলাই টুকেছিলেন ৩০-৩৫ খন্ড। তাঁর নিজের কথায়, বুর্জোয়ার মাথায় যা কখনো দাগা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ গোলা হল 'পুঁজি'।** 'পুঁজি' গ্রন্থেই মার্কসের মতবাদ সবচেয়ে পরিপূর্ণ রূপলাভ করেছে। বিশ্বের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তার বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞানের সবচেয়ে পরাক্রান্ত অস্ত্র হিশেবে এখানে মার্কসবাদ আবির্ভূত। এ গ্রন্থেই সমাজতন্ত্র পেয়েছে তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিপাদন।

মার্কসের বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার অসাধারণ সুবিশাল। বহু খন্ডের 'পুঁজি' থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত ছোটো আয়তনের কাজ নিয়ে কয়েক ডজন বই, হাজার হাজার প্রবন্ধ, শ্রমিক আন্দোলনের দলিলাদি, চিঠিপত্র লিখেছেন তিনি। মার্কস ও এঙ্গেলসের বিদ্যমান রচনাবলির মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাকারে প্রকাশিত সংকলনটি (রুশ ভাষায়) ৫০টি

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খন্ড ২৮, পৃঃ ১০৬।

** মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খন্ড ৩১, পৃঃ ৪৫৩।

খণ্ড (৫৪টি গ্রন্থ) নিয়ে, তার অধিকাংশ রচনাই মার্কসের।

মার্কসের জীবনাবসান হয় ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ। লণ্ডনের হাইগেট সমাধিস্থলে তিনি সমাধিত। তাঁর অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'মানবজাতি এখন হয়ে দাঁড়াল একমাথা খাটো, আর একালে তাতে যত মাথা আছে, সে মাথাটা ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।'*

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস — কার্ল মার্কসের বন্ধু ও সহযোদ্ধা

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০ সালে ২৮ নভেম্বর, জার্মানির বারমেন শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন কলমালিক। ১৮৩৭ সালে পিতার জেদাজেদিতে এঙ্গেলস কারবারের কাজে ঢোকেন। কিন্তু কারবারে এঙ্গেলসের বিশেষ চাড় দেখা গেল না। যত পারেন সময় দিতে লাগলেন আত্মশিক্ষায়, সমাজবিদ্যা, সাহিত্য, ভাষা চর্চায়। ক্রীড়ায় তিনি ছিলেন উৎসাহী, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, অসিচালনা ইত্যাদিতে দক্ষতা ছিল।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের বিকাশ তিনি মন দিয়ে অনুধাবন করে যেতেন। এই সিদ্ধান্তে তিনি আসেন

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ৩৮৬।

যে পেকে-ওঠা সামাজিক সমস্যাদির পূর্ণ সমাধান সম্ভব কেবল কমিউনিজমে।

১৮৪২ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি এঙ্গেলস আসেন ইংলন্ডে ম্যাঞ্চেস্টার শহরে, সূতাকলের কারবার শিখতে, এর অংশীদার ছিলেন তাঁর পিতা। ইংলন্ড তখন ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শিল্পাগ্রগণ্য দেশ। সর্বাধিক বিকশিত শ্রমিক আন্দোলনও তখন এখানেই, ইংলন্ডের প্রলেতারিয়েত ততদিনে তাদের শক্তি টের পেয়েছে। তাদের অভিযান* হয়ে উঠেছে সংগঠিত, গণধর্মী। দেশের রাজনৈতিক জীবন, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা অনুধাবন করছেন এঙ্গেলস। শ্রমিক পাড়ায় তিনি যাচ্ছেন, কথা কইছেন প্রলেতারীয়দের সঙ্গে, দেখছেন তাদের হাড়ভাঙা খাটুনি, জীবনযাত্রার ভয়াবহ পরিস্থিতি, পরিচিত হচ্ছেন শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে। শ্রমিকদের শ্রম ও জীবনযাত্রা নিয়ে পরিসংখ্যান আর প্রামাণ্য তথ্য অধ্যয়ন করছেন।

অচিরেই এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা নিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠালেন 'রাইনিশে ত্সাইতুঙ্গ'এ, তৎক্ষণাৎ ছাপা হয় সেগুলি। তখন তার সম্পাদক ছিলেন মার্কস। প্যারিস থেকে মার্কস প্রকাশিত 'জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী'র জন্যও লন্ডন থেকে তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠান, তার মধ্যে ছিল 'রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে খসড়া'। মার্কস এটাকে বলেছিলেন প্রলেতারীয় রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের প্রতিভাদীপ্ত রূপরেখা। তাতে ছিল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অবস্থান থেকে পুঁজিতন্ত্রের মূলগত

ব্যাপারাদি ও বিরোধের বিশ্লেষণ, পুঁজিতন্ত্রের পরিষ্কার সমর্থক, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা।

এঙ্গেলসের আরেকটা রচনা, যেটা তিনি শুরু করেছিলেন ইংলন্ডে, কিন্তু শেষ হয় পরে, ১৮৪৫ সালে, সেটারও খুবই কদর করেছিলেন মার্কস। বইটির নাম 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'। লেখক এতে শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার একটা সত্য চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এতে তিনিই প্রথম দেখান যে প্রলেতারিয়েত কেবল কষ্টভোগী শ্রেণীই নয়, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্য সংগ্রামে তাদের বাধ্য করছে তাদের গুরুভার অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এ গ্রন্থে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'সমস্ত বিশ্বের সামনে আমি ইংরেজ বুর্জোয়াকে অভিযুক্ত করছি ব্যাপক হত্যাকান্ড, লুণ্ঠন এবং অন্যান্য অপরাধে...। তবে বলাই বাহুল্য, আমি ঘোড়া পিটালেও গাধাটাকে ভুলি নি, অর্থাৎ জার্মান বুর্জোয়াকে। তাদের আমি যথেষ্ট স্পষ্ট করেই বলছি যে তারা ইংরেজদের মতো একইরকম নচ্ছার, যদিও চামড়া ছোলায় মোটেই এতটা বেপরোয়া, পরিপাটি আর সুদক্ষ নয়।'*

১৮৪৫—৪৬ সালে মার্কস আর এঙ্গেলস একসঙ্গে লেখেন 'জার্মান ভাবাদর্শ'। তাতেই প্রথম দেওয়া হয়

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২৭, পৃঃ ১০।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির বিশদ বিবরণ। তাতে সূত্রবদ্ধ হয়েছে সামাজিক ব্যবস্থাগুলির নিয়মবদ্ধ পরিবর্তনের কথা, প্রমাণ করা হয়েছে যে পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য, দেখানো হয়েছে যে সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের বিকাশ।

১৮৪৭ সালে এঙ্গেলস তৈরি করলেন কমিউনিস্ট লীগের খসড়া কর্মসূচি — 'কমিউনিজমের মূলনীতি'। সেটাই ছিল মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'এর (১৮৪৮) ভিত্তি। এতেই মার্কসবাদ আত্মপ্রকাশ করে প্রলেতারিয়েতের একটা সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষা হিসেবে।

এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক কাজ অনেক, তার অন্যতম একটি বৃহৎ রচনা হল ড্যুরিং মহাশয়ের সমালোচনা — 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'। এতে সৃজনধর্মিতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে মার্কসবাদের তিনটি অঙ্গ — বস্তুবাদী দর্শন, রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র আর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম। মার্কসের মৃত্যুর পর তিনি 'পুঁজি'র ২য় ও ৩য় খণ্ড গুছিয়ে দেন ও প্রকাশ করেন। এ দুটিকে বলা যায় মার্কস ও এঙ্গেলসের মিলিত রচনা।

মার্কসের সুহৃদ ও মহান সহযোদ্ধা এঙ্গেলস সর্বদাই মনে করতেন যে বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রণয়নে প্রধান কৃতিত্ব মার্কসের। 'লুডভিগ ফয়েরবাখ ও ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: 'এখানে একটা ব্যক্তিগত নিবেদনের সুযোগ করে নিচ্ছি। এ তত্ত্ব রচনায় আমার অংশগ্রহণের কথা ইদানীং বলা

হচ্ছে বার বার। তাই এখানে আমি কয়েকটা কথা বলতে বাধ্য যাতে প্রশ্নটা চুকে যায়। মার্কসের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছর কাজের মধ্যে আর তার আগেও যে তত্ত্ব নিয়ে কথা হচ্ছে তার প্রতিপাদনে এবং বিশেষ করে তার বিস্তারণে স্বাধীন অংশ নিয়েছি-লাম, সেটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু যে মৌল চিন্তায় এ তত্ত্ব চালিত তার বিপুলতম অংশই, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে, আরো বেশি করে তার চূড়ান্ত ও নিখুঁত সূত্রায়ণ মার্কসেরই কৃতিত্ব। আমি যেটুকু দিয়েছি, মার্কস সেটা আমাকে ছাড়াই অনায়াসে করতে পারতেন, হয়ত দু-তিনটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদে। আর মার্কস যা করেছেন, সেটা আমি কখনোই করতে পারতাম না। মার্কস দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের সকলের উপরে, দেখেছেন অনেক দূর পর্যন্ত, উপলব্ধি করেছেন বেশি এবং দ্রুত। মার্কস ছিলেন প্রতিভা, আমরা বড়ো জোর গুণী। তাঁকে ছাড়া আমাদের তত্ত্ব মোটেই তেমন হত না, যেটা তা এখন। তাই সেটা সঙ্গত কারণেই তাঁর নাম ধারণ করে।'*

এঙ্গেলস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৯৫ সালের ৫ অগস্ট।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে। নিজেদের তাত্ত্বিক রচনায় আর প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২১, পৃঃ ৩০০-৩০১।

তাঁরা প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নতুন পর্যায়ের সূচনা করেন। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে তাঁদের মহত্তম কীর্তি এই যে স্বপ্নকল্পনার জায়গায় তাঁরা দিয়েছেন বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

কমিউনিজম ইউটোপিয়া নয় — বিজ্ঞান

নিজেদের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কমিউনিজম কোনো এক সৌভাগ্যবান প্রতিভাধরের আকস্মিক আবিষ্কার নয়, মানবসমাজের বিকাশপ্রসূত একটা অনিবার্য পরিণাম। এতে করে সমাজতন্ত্রকে তাঁরা পরিণত করেছেন ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে। লেনিন বলেছেন, ''নতুন' সমাজটা বুঝি তাঁর মন-বানানো, উৎকল্পনা, এই অর্থে ইউটোপীয়তা মার্কসের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই।'*

অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের বিশ্লেষণে মার্কস ও এঙ্গেলস এগুবার চেষ্টা করেছেন দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী হিসেবে। সামাজিক জীবনে কেন পরিবর্তন ঘটে, কিভাবে আর কোন ধারায় সমাজ বিকশিত হচ্ছে, এই প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা। তাঁরা দেখান যে ইতিহাসের স্রষ্টা হল মেহনতি জনসাধারণ, সমস্ত বৈষয়িক সম্পদ যারা সৃষ্টি করে। শ্রেণীবিভক্ত

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৪৮।

সমস্ত সমাজে (দাস-মালিকী, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক) বিকাশের চালিকা শক্তি হল শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা পুঁজিতন্ত্রের বিশ্লেষণ করে তার মূলগত বিরোধগুলি উদ্‌ঘাটন করেন। তন্নতন্ন করে তাঁরা বিচার করেছেন কিভাবে পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই গড়ে ওঠে তার স্খলন ও পতনের বৈষয়িক শর্ত। প্রলেতারিয়েতের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান সেই শক্তি যা পুরনো ব্যবস্থা চূর্ণ করতে সক্ষম, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকাকে তাঁরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদিত করেন।

কেন ঠিক প্রলেতারিয়েতই হল পুঁজিতন্ত্রের সমাধিখনক, সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা?

প্রথমত, বুর্জোয়া সমাজে কোনোরকম মালিকানার সঙ্গে প্রলেতারিয়েত বাঁধা নয়, কাজ করার দু'খানা হাত ছাড়া তার কিছু নেই। মালিকানার বোঝায় তাদের বৈপ্লবিক প্রয়াস দমিত নয়, তাই বিপ্লবে কেবল নিজের শেকল ছাড়া হারাবার কিছু নেই তাদের।

দ্বিতীয়ত, প্রলেতারিয়েত নির্মমভাবে শোষিত। বুর্জোয়া তার উল্লেখযোগ্য সমস্ত সম্পদ আহরণ করে তাকে লুঠ করে। এই অবস্থার কারণে শ্রমিক শ্রেণী হয়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বদ্ধপরিকর যোদ্ধা।

তৃতীয়ত, শ্রমিক শ্রেণী এমন যন্ত্রায়ত উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত যা সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং ক্রমাগত বিকাশমান। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে

সঙ্গে অনিবার্যতই বাড়ে আর শক্তিশালী হয় প্রলেতারিয়েত, যা সমাজের প্রধান উৎপাদনী শক্তি।

চতুর্থত, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশের অবজেকটিভ পরিণাম দাঁড়ায় এই যে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এক বৈপ্লবিক বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে শ্রমিক শ্রেণী। তারা হল বর্তমান কালের সবচেয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি, সবচেয়ে অগ্রণী বৈপ্লবিক তত্ত্বের অস্ত্রে তারা সজ্জিত, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলো তাদের পরিচালক।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম ব্যাখ্যা করেন যে নতুন সমাজটা কল্পনাবিলাসীর কোনো খেয়াল নয়, পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের অনিবার্য পরিণাম। সমস্ত দেশের বিপ্লবীদের কর্মসূচিগত দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা তাতে নিবদ্ধ করেছেন তাঁদের তত্ত্বের বনিয়াদি নীতি ও ধ্যানধারণা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলগত বক্তব্য, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রতিভাদীপ্ত রূপরেখা। যে পার্টির চারপাশে মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রলেতারিয়েত তার স্বাধীনতা ও শক্তি লাভ করবে, সে সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের মূল কথাও আছে তাতে। এ 'ইস্তাহার' সমাপ্ত হয়েছে এই দিব্যবাণীতে: 'কমিউনিস্ট বিপ্লবের সামনে কম্পমান হোক অধিপতি শ্রেণীরা। শেকল ছাড়া তাতে প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। কিন্তু জয় করবার জন্য আছে সারা বিশ্ব।

দুনিয়ার মজুর এক হও!'*

'ইস্তাহার'এ মার্কসবাদকে প্রথম উপস্থিত করা হয় বিশ্ব পুনর্গঠনের একটা সুসমঞ্জস কর্মসূচি হিসেবে। লেনিনের কথায়, 'রচনাটিতে প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতা আর ঔজ্জ্বল্যে বর্ণিত হয়েছে নতুন বিশ্ববীক্ষা, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সর্বমুখী ও সুগভীর মতবাদ হিসেবে দ্বান্দ্বিকতা, শ্রেণী-সংগ্রাম এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক ভূমিকার তত্ত্ব।'**

বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য মহান বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'এ। লেনিন বলেছেন, ছোটো এই পুস্তিকাটি বহু খণ্ডের সমতুল্য: অদ্যাবধি তার প্রেরণা নিয়ে বাঁচছে এবং এগিয়ে চলেছে সভ্য জগতের সংগঠিত ও সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত।

আমাদের কালে কী মূর্তনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশ পাচ্ছে 'ইস্তাহার'এর ধ্যানধারণা রূপলাভের প্রক্রিয়া?

— সর্বাগ্রে, সমাজতন্ত্রের দেশগুলিতে নতুন সমাজ নির্মাণে, তার সর্বদিকের সমুন্নয়নে; বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির ও প্রতিটি ভ্রাতৃকল্প

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪৫৯।

** লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪৮।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সর্বাঙ্গীন সংহতি ও সফল বিকাশে।

— শোষণ ও পীড়নের প্রতি আপোসহীনতায়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, জাতিতে জাতিতে শান্তির জন্য আত্মোৎসর্গী সংগ্রামে; বিশ্বের অসমাজতান্ত্রিক অঞ্চলের প্রলেতারিয়েতের বনিয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রামে, তার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষায়; জনগণের জাতীয় মুক্তির জন্য, তাদের বৈপ্লবিক অর্জন সংহত ও বর্ধিত করার জন্য লড়াইয়ে।

— প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি অটল নিষ্ঠায়, কমিউনিস্ট পঙক্তির ঐক্যের জন্য, বর্তমানকালের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির সংহতির জন্য সঙ্গতিশীল সংগ্রামে।

— বুর্জোয়া আর জাতিবাদী, সংস্কারবাদী আর শোধনবাদী, সমাজতন্ত্রের শত্রুস্থানীয় সর্ববিধ ভাবাদর্শের প্রতি আপোসহীনতায়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা, তার সৃজনধর্মী প্রয়োগ ও বিকাশের জন্য সংগ্রামে।

প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মার্কসবাদের প্রস্তুতি চলছিল সমগ্র মানব ইতিহাসের দীর্ঘ ও সুকঠিন বিকাশ, পূর্ববর্তী পুরুষদের বিজ্ঞানের বিকাশ মারফত। জার্মান ক্লাসিকাল দর্শন,

ব্রিটিশ রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র আর ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় মার্কসবাদের তাত্ত্বিক উৎস।

ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের প্রখ্যাত প্রতিনিধি হলেন গ. হেগেল (১৭৭০—১৮৩১) এবং ল. ফয়েরবাখ (১৮০৪—১৮৭২)। হেগেল প্রবর্তন করেন বিকাশের দার্শনিক মতবাদ — দ্বন্দ্বতত্ত্ব। কিন্তু হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ছিল তার ভাববাদী বনিয়াদে। তাঁর কাছে কথাটা ছিল বাস্তব জগতের বিকাশ নিয়ে নয়, কী-এক পরম ভাবসত্তার বিকাশ নিয়ে, যা নাকি বিশ্বের ভিত্তি এবং তার চূড়ান্ত কারণ। পক্ষান্তরে ফয়েরবাখ দেখান যে প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা যায় প্রকৃতিকে দিয়েই, কোনো রহস্যময় কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। কিন্তু ফয়েরবাখের বস্তুবাদ ছিল অধিবিদ্যক, তাতে বিকাশ বলে কিছু নেই, আছে কেবল পরিমাণগত পরিবর্তন। হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিপুল তাৎপর্য ফয়েরবাখ বোঝেন নি, পারেন নি তা প্রকৃতির ক্ষেত্রে ও সমাজের ইতিহাসে প্রয়োগ করতে। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব আর ফয়েরবাখের বস্তুবাদ হল মার্কসীয় দর্শন উদ্ভবের যাত্রাবিন্দু।

রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রে মার্কসবাদের পূর্বসূরী হলেন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যা. স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) এবং ড. রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)। তাঁরা দেখান যে সমাজের সমস্ত সম্পদের মূল উৎস হল শ্রম এবং তাতে করে বৈজ্ঞানিক অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

উনিশ শতকের মহান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী সাঁ-

সিমোঁ, ফুরিয়ে আর ওয়েন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন, ভবিষ্যৎ সমাজের প্রধান প্রধান দিকেরও একটা ছবি দেন। তবে তা প্রতিষ্ঠার বাস্তব পথ তাঁরা দেখাতে পারেন নি।

জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্র আর ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র রূপে উনিশ শতকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ যা-কিছু সৃষ্টি, তার বৈধ উত্তরাধিকারী হল মার্কসবাদ। তবে মার্কস ও এঙ্গেলস কেবল তাঁদের তাত্ত্বিক পূর্বসূরীদের ধারাবাহকই ছিলেন না। তাঁরা বিচার করে সেগুলি ঢেলে সাজেন, গড়ে তোলেন নতুন মতবাদ, যাতে প্রকাশ পায় সবচেয়ে প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক শ্রেণী — প্রলেতারিয়েতের মৌল স্বার্থ। মেহনতিদের সামাজিক মুক্তির ইতিহাসে তাঁরা সত্যকার একটা বিপ্লব ঘটান। সেটা অভিব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলিতে:

প্রথমত, ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলস দার্শনিক বস্তুবাদকে রক্ষা ও বিকশিত করেন। এ বস্তুবাদকে তাঁরা সমৃদ্ধ করেন দ্বান্দ্বিকতায়, অর্থাৎ অবজেকটিভ ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিশ্বের বিকাশ ও তার প্রজ্ঞান নিয়ে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মতবাদ দিয়ে। এতে করে তাঁরা গড়ে তোলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যা অধিবিদ্যক বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হয়ে ভাববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতা থেকে একেবারে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুবাদ আর দ্বান্দ্বিকতাবাদকে তাঁরা সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে প্রণয়ন করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা স্মিথ, রিকার্ডো এবং অন্যান্য ক্লাসিক বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীর ধ্যানধারণা অবলম্বনে আবিষ্কার করেন বাড়তি মূল্যের তত্ত্ব, যে মূল্যটা পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করছে। দেখা দিল মার্কসীয় রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করে তা এই সিদ্ধান্তে আসে যে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য।

অর্থশাস্ত্রের সমস্যা নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস খাটেন বাস্তবতার দার্শনিক বিশ্লেষণের সঙ্গে একই সময়ে। তাঁদের দার্শনিক বস্তুবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে আত্মিক মুক্তির পথ দেখায়, আর অর্থনৈতিক যে তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর হল বাড়তি মূল্যের তত্ত্ব, তা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে উদ্‌ঘাটিত করে পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে তার আসল অবস্থা।

তৃতীয়ত, মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা শ্রেণী-সংগ্রামের একটা বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি তুলে ধরেন। ইতিহাসে জনসাধারণের নির্ধারক ভূমিকা এবং পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থাপন ও সংহতিতে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা তাঁরা প্রতিপাদন করেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে।

চতুর্থত, ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধকে সুসিদ্ধ এবং তাঁদের সমকালীন বুর্জোয়া সমাজের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে তাঁরা পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতা আবিষ্কার করেন। এতে করে

তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনকে সশস্ত্র করেন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের কর্মসূচি, শ্রেণী-সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল দিয়ে, প্রতিষ্ঠা করেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

মার্কসীয় মতবাদের সর্বশক্তিমতার কারণ তার সঠিকতা। এর মধ্যেই রয়েছে তার শক্তি ও প্রভাবের অক্ষয় উৎস।

মার্কস ও এঙ্গেলস কেবল অপূর্ব প্রতিভাধর চিন্তা-নায়কই নন, মহত্তম বিপ্লবীও, বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের অধিনায়ক। তাঁরা চালিত হয়েছেন মার্কস কর্তৃক সূত্রবদ্ধ এই কথায়: 'দার্শনিকেরা এযাবৎ নানা ভাবে, পৃথিবীর **ব্যাখ্যাই দিয়েছেন,** কিন্তু প্রশ্ন হল তাকে **পরিবর্তিত করা।**'* আর বিশ্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাধনায় তাঁরা উৎসর্গ করেছেন নিজেদের সারা জীবন, তাঁদের অনন্যসাধারণ মননশক্তি।

মার্কস ও এঙ্গেলস গঠন করেন ইতিহাসে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন — কমিউনিস্ট লীগ। ১৮৬৪ সালে তাঁরা গড়ে তুললেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ, ইতিহাসে যা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে খ্যাত। সর্বাগ্রে তার কাজ ছিল বিভিন্ন দেশে প্রলেতারীয় গণ-পার্টি গঠন, বৈপ্লবিক তত্ত্বে শ্রমজীবী জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। আন্তর্জাতিকের কর্মসূচিগত বনিয়াদি দলিল — 'প্রতিষ্ঠা ঘোষণাপত্র' আর 'নিয়মাবলি' — মার্কসের রচনা।

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪।

তাতে এই কথাটা তুলে ধরা হয় যে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া উচিত খোদ শ্রমিক শ্রেণীরই নিজেদের কাজ এবং তাদের প্রধান কর্তব্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় আর সমাজতন্ত্র নির্মাণ। লেনিন বলেছেন, 'প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪-১৮৭২) পুঁজির ওপর বৈপ্লবিক আঘাতের প্রস্তুতির জন্য শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভিত পাতে... সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক সংগ্রামের বনিয়াদ স্থাপন করে।'*

মার্কস ও এঙ্গেলস এইভাবে হয়ে দাঁড়ান বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবর্তক। তাঁরা ছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে অনুপ্রাণিত মনীষী বিপ্লবী।

লেনিনবাদ — মার্কসবাদের বিকাশে নতুন পর্যায়

লেনিন — মার্কস ও এঙ্গেলসের মহান উত্তরসাধক

রুশ জনগণের মহাসন্তান ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) রচনা ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে অনুবর্তিত ও পরিবিকশিত হয়েছে মার্কসবাদ।

উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিকালে পুঁজিতন্ত্র প্রবেশ করে তার সর্বশেষ, সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে। উদীয়মান

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৮, পৃঃ ৩০২-৩০৩।

অবস্থা থেকে তা পরিণত হয় পরজীবী, পচনশীল, মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্রে। এই পর্বে রুশ প্রলেতারিয়েত হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রবাহিনী। রাশিয়ায় জারতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক জের আটকে রাখছিল দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ। সামাজিক বিরোধগুলি এখানে অসাধারণ তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম চালায় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, কৃষকেরা লড়ে ভূস্বামীদের সঙ্গে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ — দুনো জোয়াল: জার স্বৈরতন্ত্র আর নিজেদের নিপীড়কদের বিরুদ্ধে। শ্রমিক, কৃষক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরণ ও শক্তিবর্ধন করে ঘনিয়ে আনছিল রুশ বুর্জোয়া-জমিদারি ব্যবস্থার পতন। এর ফলে রাশিয়া ক্রমেই হয়ে উঠতে থাকে বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের শৃঙ্খলে সবচেয়ে দুর্বল গ্রন্থি। মার্কস ও এঙ্গেলসের মহাসাধনার ধারা বিকাশের ভার নিলেন লেনিন। রাশিয়া হয়ে দাঁড়াল লেনিনবাদের জন্মভূমি।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের (উলিয়ানভ) জন্ম ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল সিম্বির্স্ক শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভস্ক শহর)। তাঁর পিতামাতা ছিলেন প্রগতিশীল রুশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোক। পিতার জন্ম দরিদ্র সংসারে। নিজের একাগ্র পরিশ্রম আর উল্লেখযোগ্য সামর্থ্যের কল্যাণে তিনি সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেন, শিক্ষকতার কাজ নেন, পরে হন সিম্বির্স্ক গুবের্নিয়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক।

মা ছিলেন গুণী মহিলা। কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন, সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহী, অনেক পড়াশুনা

করেছিলেন। এমনিতে শীর্ণকায়া হলেও সাহস, আত্মত্যাগশীলতা, দৃঢ়তা তাঁর ছিল অসাধারণ। উলিয়ানভ পরিবারকে একাধিকবার যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সে সময় তাঁর গুণগুলি চমৎকৃত করেছে লোককে। ১৮৮৬ সালে তাঁর স্বামীবিয়োগ আর একবছর বাদেই জারের প্রাণনাশের আয়োজনে অংশ নেবার জন্য ফাঁসি হয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেকসান্দরের। পরবর্তীকালেও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে যোগ দেবার জন্য তাঁর অন্যান্য সন্তানদের গ্রেপ্তারও তিনি সহ্য করে যান দৃঢ়চিত্তে।

সেসময় রাশিয়ায় যে নিষ্ঠুর দমননীতির রাজত্ব চলছিল, তার মধ্যে দিন কাটে কিশোর লেনিনের। সেটা ছিল বল্গাহীন পাশবিক প্রতিক্রিয়ার পর্ব।

গত শতকের ৮০'র দশকের মাঝামাঝি থেকে কিশোর লেনিন স্বাধীনভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের তত্ত্ব নিয়ে প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ১৮৮৫ সালের গ্রীষ্মে প্রথম তাঁর হাতে পড়ে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থটি — পিটার্সবুর্গ থেকে এটি নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বড়দা। ১৮৮৮ সালের শীতে তিনি এটির বিশদ সার সংক্ষেপ করেন, ভালোরকম পরিচিত হন মার্কস ও এঙ্গেলসের অন্যান্য রচনার সঙ্গেও।

লেনিনের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয় যখন তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে সতের বছরের ছাত্র। গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করার পর ১৮৯২-৯৩ সালে তিনি সামারা শহরের মার্কসবাদী চক্র এবং পরে 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম লীগে' ঐক্যবদ্ধ পিটার্সবুর্গ

মার্কসবাদী চক্রের নেতৃত্ব করেন, রাজধানীর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে প্রচারমূলক-সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন ব্যাপকাকারে।

১৮৯৮ সালে নতুন ধরনের পার্টি, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি স্থাপন লেনিনের একটা মহতী কীর্তি। এ পার্টি প্রতিষ্ঠায় সূচিত হয় রুশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে একটা নতুন পর্যায়। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম একটা সংগঠন প্রলেতারিয়েত পেল এই প্রথম।

নিজের ক্রিয়াকলাপে লেনিন সৃজনশীলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন মার্কসবাদ, সর্বদাই ছিলেন তার প্রত্যয়সিদ্ধ তেজস্বী প্রচারক। নিজের প্রথম দিককার রচনাতেই তিনি মার্কসের বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রতি সৃজনধর্মী মনোভাবের নিদর্শন দেন। 'জনগণবন্ধুরা কী, আর কীভাবে তারা লড়ে শোস্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে' (১৮৯৪) গ্রন্থটিতে তিনি রাশিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের যে প্রক্রিয়া চলছিল, তা নিয়ে প্রগাঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য অনুসন্ধান চালান। তাতে উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির সাধারণ নিয়মগুলি বেশ ফুটে উঠেছিল। এই গ্রন্থে তিনি নারদনিকদের (জনবাদী)—কৃষক বিপ্লব মারফত রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের পক্ষপাতীদের তাত্ত্বিক ভ্রান্তির সমালোচনা করেছিলেন।

১৮৯৬ সালে জার সরকার লেনিনকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠায় সাইবেরিয়ায়, শুশেনস্কোয়ে গ্রামে। নির্বাসিতা নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়াও

আসেন সেখানেই। তাঁর সঙ্গে লেনিনের পরিচয় হয়েছিল আগেই, ১৮৯৪ সালে, পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদী চক্রে। ক্রুপস্কায়া হলেন লেনিনের স্ত্রী, তাঁর বিশ্বস্ত সুহৃদ, সহযোদ্ধা, সমভাবী।

নির্বাসনে লেনিন শেষ করেন একটি বড়ো রচনা — 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' (১৮৯৯)। এতে তিনি বিপুল তথ্যের সাহায্যে, সমস্ত দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তন্নতন্ন করে পরীক্ষিত এবং নিজের কষা সমাকলিত পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান যে গ্রামসমাজ ভেঙে পড়েছে, কৃষকেরা স্তরবিভক্ত হয়ে পড়েছে ক্ষেতমজুর ও কৃষক বুর্জোয়ায়, গড়ে উঠেছে সারা রুশ বাজার। বিশদে তিনি অনুধাবন করেন রাশিয়ায় বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বিকাশ, দেখান শিল্পোৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক চরিত্র, প্রলেতারিয়েতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।

জারতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সঙ্গতিপরায়ণ যোদ্ধা হিসেবে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অধিনায়ক হিশেবে রুশ প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রতিপন্ন করেন লেনিন। 'যখন তাদের অগ্রণী প্রতিনিধিরা আত্মস্থ করবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা, রুশ শ্রমিকের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা, যখন এইসব ধারণা ব্যাপক প্রচার লাভ করবে এবং শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে উঠবে পাকাপোক্ত সংগঠন যা শ্রমিকদের বর্তমান খন্ডবিখন্ড অর্থনৈতিক লড়াইকে পরিণত করবে সচেতন শ্রেণী-সংগ্রামে, — তখন সমস্ত গণতান্ত্রিক উপাদানের উপরে উত্থিত রুশ শ্রমিক

পরারাজতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করবে, **রুশ প্রলেতারিয়েতকে (সমস্ত দেশের** শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে) নিয়ে যাবে **বিজয়ী কমিউনিস্ট বিপ্লবের দিকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামের সোজা রাস্তায়।'***

শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বৈপ্লবিক জোটের কথাটা লেনিনই প্রথম গভীরভাবে প্রতিপাদন করেন। এই জোটের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সেই শক্তি যা জারতন্ত্রকে উৎসাদিত করতেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণেও সক্ষম।

নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হতেই লেনিন মার্কসবাদের তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নীতির ভিত্তিতে দেশের বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নামেন। তবে পুলিসি তাড়নায় ১৯০০ সালের গ্রীষ্মে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন বাইরে থেকেই।

লেনিন সর্বদাই মন দিতেন প্রলেতারীয় পার্টির দিকে, সে পার্টিকে হতে হবে নতুন ধরনের পার্টি, মেহনতি জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, এমন পার্টি যার কাজ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ পরিচালনা। কিন্তু বৈপ্লবিক পার্টি থাকতে পারে না বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছাড়া, প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ যে তত্ত্বে রূপায়িত, জীবনেরই বাস্তবতার সঙ্গে যা

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ১, পৃঃ ৩১১-৩১২।

নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজকর্মের পরিস্থিতি, স্থান ও কাল নির্বিশেষে এ সিদ্ধান্ত যে-কোনো বৈপ্লবিক পার্টির ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে অগ্রণী, বৈপ্লবিক তত্ত্ব হল সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে বেশি করে কর্মের দিশারি।

সত্যকার বৈপ্লবিক পার্টি গঠনের সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্ব ধরে লেনিনের দুটি রচনা — 'কী করণীয়?' (১৯০২) আর 'এক পা এগিয়ে দুই পা পিছনে' (১৯০৪)। 'কী করণীয়?' গ্রন্থে লেনিন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। 'সমালোচনার স্বাধীনতা' — এই বাগাড়ম্বরী বুলির আড়ালে সুবিধাবাদীরা বুর্জোয়া ধ্যানধারণার প্রচারে আপোসমূলক মনোভাব নিত, তার সমালোচনা করত না। এরূপ অবস্থানের ফলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বৈপ্লবিক থেকে সংস্কারবাদী পার্টিতে পরিণত হওয়া ছিল অবধারিত।

'এক পা এগিয়ে দুই পা পিছনে' গ্রন্থে লেনিন পার্টির গুণগত চরিত্র, পার্টি জীবনের আদর্শ কঠোরভাবে পালন, তার ঐক্যের সংহতি ও শৃঙ্খলার দিকে খুব মন দেন। তিনি বলেন, 'ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রলেতারিয়েতের অন্য কোনো অস্ত্র নেই।... প্রলেতারিয়েত বিজয়ী শক্তি হতে পারে এবং অবশ্যই হবে কেবল এই কারণে যে মার্কসীয় নীতিতে তার ভাবাদর্শীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয় সংগঠনের ঐক্যে, যা লক্ষ লক্ষ মেহনতিকে সম্মিলিত করবে শ্রমিক শ্রেণীর সৈন্যবাহিনীতে। এ বাহিনীর সামনে

দাঁড়াতে পারবে না রুশ স্বৈরতন্ত্রের একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়া ক্ষমতাও, পারবে না আন্তর্জাতিক পুঁজির জরাজীর্ণ হতে থাকা ক্ষমতাও।'*

জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তাল সময়টায়, ১৯০৫ সালের শরতে লেনিন পিটার্সবুর্গে ফেরেন। তাঁর মনোযোগ তখন নিবদ্ধ বৈপ্লবিক সংগ্রামের কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলিতে।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভা থেকে প্রকাশিত হল লেনিনের 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল'। এতে তিনি বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ রণনৈতিক পরিকল্পনা আর রণকৌশলগত লাইনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেন। তাতে তিনি এই কথায় জোর দেন যে **'স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধ সবলে চূর্ণ আর বুর্জোয়ার অস্থিরমতিত্বকে বিকল করে দেবার জন্য কৃষকসাধারণকে সঙ্গে টেনে প্রলেতারিয়েতকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বুর্জোয়ার প্রতিরোধ সবলে চূর্ণ আর কৃষক এবং পেটি বুর্জোয়ার অস্থিরমতিত্বকে বিকল করে দেবার জন্য অধিবাসীদের আধা-প্রলেতারীয় অংশদের সঙ্গে টেনে প্রলেতারিয়েতকে সাধন করতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।'****

প্রথম রুশ বিপ্লব পরাজিত হয়। পার্টি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে লেনিন

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৮, পৃঃ ৪০৩-৪০৪।

** লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ১১, পৃঃ ৯০।

রাশিয়া ত্যাগ করেন। শুরু হল তাঁর দ্বিতীয় প্রবাস জীবন, দেশ থেকে বহুদূরে তাঁকে কাটাতে হয় 'নারকীয় রকমের কষ্টকর' গোটা দশেক বছর।

১৯০৮ সালের এপ্রিলে বেরুল তাঁর 'মার্কসবাদ ও শোধনবাদ' প্রবন্ধ। এতে তিনি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বাহক হিশেবে শোধনবাদের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটিত করেন। মার্কসের মতবাদ 'সংশোধন', 'পুনর্বিচার' করার নামে শোধনবাদীরা চেষ্টা করছিল মার্কসবাদের শ্রেণীগত মর্মার্থই নাকচ করার, শ্রেণী-সংগ্রামে 'আপত্তি', প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, এমনকি সমাজতন্ত্রের ধারণাটাই বাতিল করার, শ্রমিক আন্দোলনকে সংস্কারবাদ আর বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের পথে ফেরাতে চাইছিল।

১৯১২-১৯১৩ সালে লেনিন ৫০টিরও বেশি প্রবন্ধ লেখেন জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিয়ে মার্কসীয় তত্ত্ব বিকশিত করা হয়েছে তাতে, সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে পার্টির জাতীয় কর্মসূচির মূলনীতি, যথা, জাতির পরিপূর্ণ সমাধিকার, আত্মনির্ধারণের অধিকার ইত্যাদি।

মার্কসবাদের বিকাশে নতুন পর্যায় সূচিত হয় লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' (১৯১৬) গ্রন্থে। এতে তিনি সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক মর্মার্থ, তার বিরোধাদি এবং ধ্বংসের অনিবার্যতা উদ্‌ঘাটিত করে দেখান এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্‌কাল। এ রচনাটি মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের মূল বক্তব্যগুলির প্রত্যক্ষ অনুবর্তন ও সৃজনী বিকাশ। সাম্রাজ্যবাদের

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লেনিন চালিয়ে যান তাঁর পরবর্তী আরো অনেক রচনায়। বিপুল বাস্তব তথ্য আর তাত্ত্বিক মালমশলার সামান্যীকরণ করে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ অসমান এবং উল্লম্ফনধর্মী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয় লাভ করতে পারে প্রথমে অল্প কয়েকটি, এমনকি পৃথক একটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশেও। বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের কাছে এ সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অসাধারণ বিপুল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কালে লেনিন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধের ঘোর বিরোধী এবং তাতে সঙ্গতিনিষ্ঠ। গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তে তিনি আসেন যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান সম্ভব কেবল আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় ঐক্য শক্তিশালী করে জনসাধারণের বৈপ্লবিক প্রতিরোধের বিকাশ মারফত।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হবার পর লেনিন স্বদেশে ফেরেন ৩ এপ্রিল। শেষ হল তাঁর বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় প্রবাস। তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থটি (সেপ্টেম্বর, ১৯১৭) মার্কসবাদের বিকাশে এক বিরাট অবদান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতি প্রলেতারিয়েতের মনোভাব, প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে সুসমঞ্জস মতামত দেওয়া হয়েছে তাতে, কমিউনিজমে রাষ্ট্রের শুকিয়ে ঝরে পড়ার প্রশ্নেও আছে প্রগাঢ় তাত্ত্বিক বিচার।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের বৈজ্ঞানিক পথ নির্দেশ হল লেনিনের সৃষ্টিধর্মী তাত্ত্বিক কর্মের শিরোমণি। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্বে তার নিয়মানুগতা আর প্রধান প্রধান দিকগুলি উদ্ঘাটিত করেন তিনি। এতে করে তিনি নতুন সমাজ নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদকে গভীরতর এবং সৃজনধর্মিতায় বিকশিত করে তোলেন, সে সমাজের ব্যবহারিক গঠন-প্রক্রিয়ায় জনগণকে সংগঠিত করার নীতি রচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেন মার্কসবাদকে।

লেনিনের এবং তৎসৃষ্ট পার্টির নেতৃত্বেই রাশিয়ার মেহনতিরা ১৯১৭ সালে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব সাধন করে, চূর্ণ করে শোষকদের ক্ষমতা, মানব ইতিহাসে এনে দেয় নতুন একটা যুগ।

অসাধারণ বীর্যমণ্ডিত লেনিনের জীবন। সে জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন মননের সৃষ্টির কাজে, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মে, ভাবাদর্শীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রামে। তাঁর মধ্যে রূপ নিয়েছে প্রলেতারীয় বিপ্লবীর সবকিছু সদ্গুণ — বিপুল মনন, সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি, দাসত্ব ও উৎপীড়নে পবিত্র ঘৃণা, বৈপ্লবিক হৃদয়াবেগ, সঙ্গতিশীল আন্তর্জাতিকতা, জনগণের সৃজনী ক্ষমতায় অসীম বিশ্বাস, অভূতপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভা। লেনিনের শিক্ষামালা, বৈপ্লবিক তত্ত্বে তাঁর অবদানকে বলা হয় লেনিনবাদ।

নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে নিজের মহাগুরুদের তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারকে লেনিন পরিবিকশিত ও পরিবর্ধিত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন

মার্কসবাদের সবকটি অঙ্গই — দর্শন, রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম। সতেজে তিনি লড়েছেন তেমন সব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, যার লক্ষ্য হল মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদকে একটা শিলীভূত মৃত আপ্তবাক্যে পরিণত করা। তিনি লেখেন, 'মার্কসের তত্ত্বকে আমরা পরিসমাপ্ত, স্পর্শাতীত কিছু-একটা বলে আদৌ মনে করি না। উলটে বরং আমাদের কোনো সন্দেহই নেই যে এ তত্ত্ব যে বিদ্যার কেবল ভিত্তিপ্রস্তর পেতে গেছে, জীবন থেকে পিছিয়ে থাকতে না হলে সমাজতন্ত্রীদের উচিত সে বিদ্যাকে সব দিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।'*

লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ার যুগ, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে মানবজাতির উত্তরণ, বিশ্বায়তনে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জয়যাত্রার যে যুগ, সেই যুগের মার্কসবাদ। বৈপ্লবিক তত্ত্বে লেনিনের অবদান এতই বিপুল যে উত্তরকালে তার নাম হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল সারা বিশ্বের প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক মতবাদ।

শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা গড়ে তুলেছে যেসব দার্শনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল তার একটা বৈজ্ঞানিক তন্ত্র, জগতের জ্ঞান ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিজ্ঞান; প্রকৃতি,

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৮৪।

সমাজ, মানবিক মননের বিকাশাদির নিয়ম, পংজিতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর, সমস্ত মেহনতিদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল চিরজীবী তত্ত্বকোষ, জনগণের সংগ্রাম আর গঠন কর্মের অভিজ্ঞতা নিয়ে সৃজনী ভাবনাচিন্তার একটা সার্থক প্রণালী, কর্মের অবিচল দিশারি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণশক্তির রহস্য এইখানে যে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের মতবাদ, তার পদ্ধতি, নীতি আর আদর্শ কোটি কোটি জনগণের কাছে বোধগম্য, তাদের মনের মতো। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম যেসব প্রশ্নে আলোড়িত, এতে তারা খংজে পায় তার উত্তর। মানবজাতির ভবিষ্যতের পথ তা আলোকিত করছে, সারা বিশ্বে নিয়ে আসছে শান্তি আর প্রগতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দার্শনিক ভিত্তি

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম সামান্যীকরণের ভিত্তিতে মার্কস ও এঙ্গেলস একটি নতুন দর্শনের অবতারণা করেন — দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। নতুন ঐতিহাসিক যুগের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের পরবর্তী বিকাশ ঘটে লেনিনের রচনায়। সৃজনধর্মী মতবাদ হওয়ায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন অবিরাম বিকশিত হচ্ছে বিশ্ব-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাফল্যের ভিত্তিতে। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের যে মতবাদ, তার দার্শনিক ভিত্তি, প্রকৃতি, সমাজ আর চিন্তনের সর্বাধিক সাধারণ নিয়মগুলির বিজ্ঞান।

দর্শনের মূলপ্রশ্ন

আমরা যাকে বলি দর্শনশাস্ত্র, সেই 'ফিলসফি' কথাটা এসেছে প্রাচীন গ্রীক থেকে। তা গঠিত দুটি শব্দ দিয়ে: phileo — 'ভালোবাসি' আর sophia — 'প্রজ্ঞা'। আক্ষরিক অর্থে তা হল প্রজ্ঞাপ্রেম।

দর্শনের উদ্ভব অতি প্রাচীনকালে, যখন লোকে ভাবতে শুরু করে চারিপাশের জগৎ দেখা দিল কিভাবে, কেমন তার চরিত্র, কী সেখানে মানুষের স্থান।

যে জগৎ মানুষকে ঘিরে আছে, সেটা মন দিয়ে লক্ষ করে বোঝা গেল যে এই সমস্ত ব্যাপারই হয় বস্তুগত, নয় ভাবগত, আত্মিক। আর পুরাকাল থেকেই লোকেদের ভাগাভাগি হতে থাকল বস্তুবাদী আর ভাববাদীতে। দর্শনের মূলগত প্রশ্ন নিয়ে তাদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলছে যুগ যুগ ধরে। দর্শনের মূল প্রশ্ন হল অস্তিত্বের সঙ্গে চিন্তনের, বৈষয়িকের সঙ্গে আত্মিকের সম্পর্ক নিয়ে।

বস্তুবাদী মনে করে যে **বস্তুসত্তা** (matter) **হল আদি, চেতনা গৌণ, তৎপ্রসূত**। মানুষকে ঘিরে আছে যে বিশ্ব, সেটা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, কোনো একটা চৈতন্য বা আত্মা থেকে তা উদ্ভূত নয়, লোকেদের চেতনায় প্রতিফলিত হয় অবজেকটিভ বস্তু, যার অস্তিত্ব স্বাধীন, চেতনার ওপর নির্ভরশীল নয়।

ভাববাদীরা দাবি করে যে ভাবসত্তা (চৈতন্য, আত্মা ইত্যাদি) ছিল প্রকৃতির আগেই, তা-ই প্রকৃতির স্রষ্টা।

কোন চৈতন্য বিশ্বের 'স্রষ্টা', তা নিয়ে ভাববাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। সাবজেকটিভ ভাববাদীরা মনে করে যে বহির্জগৎ গড়ে ওঠে এক-একজন সাবজেকট বা বিষয়ীর চেতনা থেকে। 'সমস্ত বিশ্ব আমারই অনুভূতির একটা যৌগিক সমাহার' — এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় সাবজেকটিভ ভাববাদ। অবজেকটিভ ভাববাদীদের ধারণা, বৈষয়িক জগৎ এমন একটা বিশ্ব চৈতন্যের সৃষ্টি যা বিদ্যমান মনুষ্য চৈতন্যের বাইরে।

দর্শনের মূলপ্রশ্নটার দুটো দিক আছে। প্রথম দিকটা যেক্ষেত্রে বস্তুসত্তা ও চেতনার আদিত্ব সম্পর্কে, দ্বিতীয় দিকটা সেখানে এই প্রশ্ন নিয়ে: বিশ্বকে কি জানা সম্ভব, প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে, তার নিয়মাদি উদ্ঘাটিত করতে মানুষ কি সক্ষম? বস্তুবাদীরা দাবি করে **বিশ্ব প্রজ্ঞানের অধিগম্য।** কিছু ভাববাদী, যাদের নাম হয়েছে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic — গ্রীক a — 'না', gnosis — 'জ্ঞান') তা অস্বীকার করে। সাবজেকটিভ ভাববাদীরা বলে, জানা যায় কেবল নিজের চিন্তা, নিজের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা। অবজেকটিভ ভাববাদী মনে করে জানা সম্ভব কেবল 'বিশ্ব চৈতন্য', রহস্যময় 'ভাবসত্তা' ইত্যাদিকে।

চিন্তন আর অস্তিত্বের মধ্যে সম্পর্ক, বিশ্বকে জানা সম্ভব কিনা, এই হল দর্শনের মূলপ্রশ্ন, কেননা তার উত্তরের ওপরেই নির্ভর করে অন্যান্য দার্শনিক সমস্যা, যথা পারিপার্শ্বিক বিশ্বের বিকাশের নিয়মাদির চরিত্র, তা জানার উপায় কী, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদি যদি হয় চৈতন্য, আত্মা, ভাবসত্তা,

তাহলে বিদ্যমান শোষণ ব্যবস্থাকে বলতে হয় অটল এবং চিরন্তন, কেননা সেটা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। আর আদি যদি হয় বস্তুসত্তা, তাহলে লোকেরা নিজেরাই তাদের কাছে ঘৃণ্য ব্যবস্থাটার উচ্ছেদ করে শোষকহীন নতুন সমাজ গড়তে পারে। ভাববাদে প্রকাশ পায় সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলির স্বার্থ, বস্তুবাদে — প্রগতিশীল বৈপ্লবিক শক্তির স্বার্থ।

১। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

বস্তুসত্তা, তার ধর্ম ও অস্তিত্বের রূপ

বস্তুসত্তা ও গতির বোধ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দর্শনের মূলপ্রশ্নের কী সমাধান দেওয়া হয়? তা এই কথা থেকে এগোয় যে আমাদের চারিপাশের জগৎ, তার অস্তিত্ব অবজেকটিভ, আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল নয়। এটা হল বস্তুজগৎ। একসময় লোকে অবলোহিত কিরণ, অতিধ্বনি তরঙ্গের কথা জানত না। তার মানে এই নয় যে তেমন কোনো ব্যাপারই ছিল না। তা ছিল, শুধু মানুষ তাকে তখনও জেনে উঠতে পারে নি। বিষয়ী মানুষের চেতনা থেকে স্বাধীন এই অবজেকটিভ অস্তিত্বের লক্ষণ দিয়েই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন বিভিন্ন জিনিস আর ঘটনাকে একটি সাধারণ বোধে চিহ্নিত করে — বস্তুসত্তা বা matter.

বস্তুসত্তাকে আবিষ্কার করা যায় কিভাবে? বাহ্য জগতের দ্রব্যাদির বস্তুধর্মিতা প্রকাশ পায় এইজন্য যে তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়াপাত করে, প্রতিফলিত হয় আমাদের অনুভবে। বলা বাহুল্য, সবকিছু চোখে দেখা বা ইন্দ্রিয়যোগে অনুভব করা সম্ভব নয়। বেতার-তরঙ্গ বা চৌম্বক ক্ষেত্র হাত দিয়ে পরখ করা যায় না। কিন্তু তা আবিষ্কার করা যায় কলকব্জার সাহায্যে। তবে যে অসাধারণ রূপেই তার থাক, বস্তুসত্তা শেষ পর্যন্ত নিজের জানানি দেয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে।

'বস্তুসত্তা' বলতে একটা ব্যাপক অর্থ বোঝায়। বস্তুসত্তাকে তার কোনো একটা মূর্ত রূপের (যথা, পদার্থ, ক্ষেত্র ইত্যাদি) সঙ্গে এক করে দেখা চলে না। বস্তুসত্তা হল বিশ্বের সমগ্র বহুরূপিতা, দ্রব্যাদি আর ঘটনা, তাদের গুণাগুণ আর সম্পর্কের সমষ্টি অর্থাৎ আমাদের অনুভবগ্রাহ্য অবজেকটিভ বাস্তবতা।

বস্তুসত্তার গঠনের বিসদৃশতা আর তার অফুরন্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে বিজ্ঞান যত তথ্য জুগিয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে লেনিন বস্তুসত্তার দার্শনিক বোধের নিম্নোক্ত সাধারণীকরণ করেছেন: 'যে অবজেকটিভ বাস্তবতা মানুষের অনুভবযোগ্য, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা অনুলিখিত, চিত্রিত, প্রতিফলিত হয়ে থাকে, কিন্তু যা এগুলি থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান, তা বোঝাবার দার্শনিক বর্গ হল বস্তুসত্তা।'*

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ১৮, পৃঃ ১৩১।

বস্তুসত্তার লেনিনীয় সংজ্ঞায় বিধৃত হয়েছে যে জিনিসগুলি মানুষ ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছে শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের পক্ষে ভবিষ্যতে যা আবিষ্কার করা সম্ভব সেগুলিও। যেমন মহাকাশে প্রবেশ করে অথবা নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়াগুলির ভেতরে ঢুকে লোকে অবশ্যই আবিষ্কার করবে নতুন নতুন ধরনের বস্তু। কিন্তু নতুন নতুন যত গুণাগুণেই বস্তুর পার্থক্য দেখা যাক, এ সত্য অকাট্য যে তা বিদ্যমান একটা অবজেকটিভ বাস্তবতা হিশেবে যা আমাদের চেতনার মুখাপেক্ষী নয়।

আমাদের ঘিরে আছে যে বিশ্ব, তা একটি একক জগৎ। সমস্ত দ্রব্য, সামগ্রী, প্রক্রিয়া হল কেবল বস্তুসত্তার আত্মপ্রকাশ, রূপ। বিজ্ঞানের বিকাশ এবং মানবের সমস্ত ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় বিশ্বের বস্তুগত ঐক্য। জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন থেকে দেখা যায় পার্থিব ও মহাজাগতিক বস্তুগুলির পদার্থ-রাসায়নিক উপাদান একইরকম, গতির নিয়মও একই। জীববিদ্যা আর প্রজননবিদ্যা দেখায় যে জীবন্ত দেহের গঠন আর কাজ একইরকম। শারীরবৃত্তে সমর্থিত হয় মানসিক ক্রিয়ার বস্তুগত ভিত্তি।

অবজেকটিভ বাস্তবতা হিশেবে বস্তুসত্তাকে যে বোধ তাতে তার সমস্ত ধর্ম, গতির রূপ, অস্তিত্বের নিয়ম ইত্যাদি নিয়ে বস্তুসত্তার বৈশিষ্ট্য সূচিত।

বস্তুসত্তার একটা অলঙ্ঘ্য বৈশিষ্ট্য হল যে তা বিদ্যমান কেবল গতির মধ্যে। 'সাধারণ স্থানান্তরণ থেকে চিন্তন পর্যন্ত মহাবিশ্বে যতকিছু পরিবর্তন ও প্রক্রিয়া ঘটছে,

তা বিধৃত গতির মধ্যে।'* কল্পনা করা যাক যে অসম্ভাব্য একটা ব্যাপার ঘটল, মহাবিশ্বের সমস্ত প্রক্রিয়া মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। তার অর্থ খোদ বিশ্বেরই পরিপূর্ণ অন্তর্ধান।

যে গতিকে বুঝতে হবে পরিবর্তন বলে, নবায়নের চিরন্তন প্রক্রিয়া বলে, তা হল বস্তুর মূলগত ধর্ম, অস্তিত্বের উপায়। বস্তুগত সমস্ত জিনিসেই চলছে প্রাথমিক কণিকা, পরমাণু, অণুর গতি। প্রতিটি জিনিসই তার পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় নিরত, আর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হল কোনো-না-কোনো ধরনের গতি। পৃথিবীর দিক থেকে স্থির যেকোনো দেহ পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চারিপাশে ঘুরছে, আর সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তা ঘূর্ণ্যমান ছায়াপথের অন্যান্য গ্রহের দিক থেকে, ছায়াপথেরও স্থানপরিবর্তন হচ্ছে অন্যান্য নক্ষত্রমন্ডলীর অবস্থানের কথা ধরলে, ইত্যাদি। চূড়ান্ত স্থিরতা, ভারসাম্য, নিশ্চলতা হয় না। সমস্ত স্থিরতা, ভারসাম্য আপেক্ষিক। যেমন কোনো একটা জিনিস পৃথিবীতে স্থির হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তদবস্থাতেই তা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে।

গতির নিম্নোক্ত রূপ নির্ধারিত হয়েছে বিজ্ঞানে: যান্ত্রিক (দেশগত স্থানান্তরণ); পদার্থবিদ্যাগত (বৈদ্যুতিক-চৌম্বকত্ব, মহাকর্ষ, তাপ, ধ্বনি, বস্তুর গঠনে

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২০, পৃঃ ৩৯১।

সমষ্টিগত পরিবর্তন, ইত্যাদি); রাসায়নিক (অণু ও পরমাণুর পরিণাম); জীববিদ্যাগত (বিপাক ক্রিয়া) সামাজিক (সামাজিক পরিবর্তন তথা চিন্তন প্রক্রিয়া)। সম্প্রতিকালে গতির অনেক নতুন নতুন রূপও আবিষ্কৃত হয়েছে — প্রাথমিক কণিকার গতি ও পরিণতি, পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরের প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

অতএব গতি হল বস্তুসত্তার সর্বজনীন ধর্ম, অস্তিত্বের উপায়। বিশ্বে যেমন বস্তুসত্তা ছাড়া গতি হয় না, তেমনি গতি ছাড়া বস্তুসত্তা নেই।

বস্তুসত্তার অস্তিত্বের রূপ — দেশ ও কাল

বস্তুসত্তার গতি চলে দেশে এবং কালে। দেশ এবং কাল ছাড়া বস্তুসত্তা হতে পারে না। এই দার্শনিক বোধদুটিতে কী বোঝায়?

দেশ ও কালের অস্তিত্ব অবজেকটিভ, চেতনার মুখাপেক্ষী নয়। দার্শনিক অর্থে 'দেশ' হল বস্তুসত্তার অস্তিত্বের এমন রূপ যাতে প্রকাশ পায় তার ব্যাপ্তি, বস্তুজগতের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তার অবস্থান ও নির্দিষ্ট জায়গা।

'কাল' হল বস্তুসত্তার অস্তিত্বের এমন রূপ যাতে প্রকাশ পায় সমস্ত বস্তুসত্তার অস্তিত্বের স্থিতিদৈর্ঘ্য আর অবস্থা পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা।

অন্য কথায়, দেশে অবস্থান মানে একটা অন্যটার ব্যবধানে থাকা আর কালে থাকা মানে একটা অন্যটার ঘটমানতার পরবর্তীতে থাকা।

চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান বস্তুসত্তা, দেশ, ও কাল পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। বস্তুসত্তা যেমন দেশ ও কালের বাইরে থাকতে পারে না, দেশ ও কালেরও তেমনি বস্তুসত্তা ছাড়া অস্তিত্ব নেই। দেশ ও কাল শুধু বস্তুসত্তার সঙ্গে নয়, নিজেদের মধ্যেও সংযুক্ত। লেনিন লিখেছেন, 'গতিশীল বস্তুসত্তা ছাড়া বিশ্বে আর কিছু নেই এবং বস্তুসত্তা গতিময় হতে পারে না দেশ ও কালের মধ্যে ছাড়া।'*

মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে শাশ্বত কোনো বস্তুসত্তা, প্রক্রিয়া বা ব্যাপার নেই। এমনকি কোটি কোটি বছর ধরে বিদ্যমান মহাজাগতিক দেহগুলিরও শুরু আর শেষ থাকে, উদ্ভূত হয় আবার ধ্বংস পায়। তবে দার্শনিক অর্থে বস্তুসত্তা কালের দিক থেকে চিরন্তন। কেননা ধ্বংস পেয়ে বা চূর্ণ হয়ে জিনিসগুলি নিশ্চিহ্ন হয় না, পরিণত হয় অন্য সামগ্রী আর ঘটনায়। যেমন, একটা জিনিসের অণু ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি হয় অন্য আরেকটা জিনিসের অণু। মানুষের একটা প্রজন্ম, জীবদের এমনকি এক-একটা প্রজাতিরও বদলে আসে অন্য প্রজন্ম, অন্য প্রজাতি; একটা নক্ষত্র নিভে যাওয়া মানে তার উপাদান কিছুই আর রইল না এমন নয়। বস্তুসত্তা ও তেজের নিত্যতার নিয়ম আবিষ্কার করে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে অতি বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেলেও

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ১৮, পৃঃ ১৮১।

বস্তুসত্তা কখনো 'কিছু-না' হয়ে যায় না, 'কিছু-না' থেকে উদ্ভূত হয় না। বস্তুসত্তা চিরন্তন, তা সৃজনীয় বা ধ্বংসনীয় নয়। সর্বদা ও সর্বত্র তা ছিল, সর্বদা ও সর্বত্র তা থাকবে।

বস্তুসত্তা কেবল কালেই নিত্য তাই নয়, দেশেও তা অসীম। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি আমাদের পরিজ্ঞাত বিশ্বের দেশসীমা অবিরাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। আধুনিক দূরবীক্ষণে এমন নক্ষত্র ধরা পড়ছে যা কয়েক শ' কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। প্রাথমিক কণিকার ত্বরণ-যন্ত্রে এত সামান্য ব্যবধান নিয়েও গবেষণা চলছে যা ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণেও ধরা যায় না। বৈষয়িক জগতের সীমা নেই।

চেতনা — উচ্চসংগঠিত বস্তুসত্তার ধর্ম

মানুষের চেতনা আছে, অর্থাৎ চিন্তা করা, অনুভব করা, বোধ করা, নিজের মতামত ও ধারণা গড়ে তোলা ইত্যাদির ক্ষমতা ধরে সে। প্রশ্ন ওঠে: এই ব্যাপারটার প্রকৃতি কী, কোথায় তার উৎস, কেমন করে স্থির হচ্ছে বস্তুসত্তার সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক।

নিজের চেতনার রহস্য নিয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করে অতি আদি কাল থেকে। কেমন করে নিষ্প্রাণ পদার্থ তার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, আর জীবন্ত লাভ করে চেতনা, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে লোকে।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে চেতনা হল বস্তুসত্তার সুদীর্ঘ বিবর্তনের ফল। বস্তুসত্তা, প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল সর্বদাই। চেতনার অধিকারী, চিন্তায় সক্ষম মানুষ আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কোটি কোটি বছরের।

চেতনা দেখা দিয়েছে বস্তুসত্তার বিকাশের পরিণাম হিশেবে এবং অবিচ্ছেদ্য-রূপে তার সঙ্গে জড়িত। কেউ কখনো এমন উপলব্ধি বা বোধের কথা শোনেন নি যা আপনা থেকে উদ্ভূত, বস্তুসত্তা থেকে স্বাধীন। চিন্তার উদ্ভব কেবল সেখানেই যেখানে আছে মানুষের মস্তিষ্ক, যা চিন্তার অঙ্গ। অন্য কথায়, চেতনা সবকিছুর নয়, কেবল উচ্চসংগঠিত বস্তুসত্তারই ধর্ম। তা জড়িত মানব মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে, বৈশিষ্ট্যসূচক মানবিক, সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে।

চেতনা বলতে কেবল যে মস্তিষ্কের অস্তিত্বই ধরে নিতে হয় তাই নয়, এমন বৈষয়িক ব্যাপারের অস্তিত্বও মেনে নিতে হয় যা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করছে, প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। চেতনা দেখা দেয় কেবল মস্তিষ্কের বাইরে থেকে আসা বস্তুজগতের প্রতিক্রিয়ায় যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পৌঁছয় মস্তিষ্কে। ইন্দ্রিয় হল একধরনের 'যন্ত্র' যা পরিবেশে বা দেহের অভ্যন্তরেই যে সব পরিবর্তন হচ্ছে, দেহকে তার খবর দেয়, দেহের জন্য তা প্রতিফলিত করে। ইন্দ্রিয় (দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ) থেকে সংকেত পৌঁছয় মস্তিষ্কে তাতে বস্তুসত্তার গুণ, তাদের মধ্যে যোগাযোগ আর সম্পর্কের খবর থাকে। কোনো একটা প্রতিক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়ের

উত্তেজনা কেবল তখনই অনুভূতি, চেতনার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় যখন তা মস্তিষ্কে পেঁছয়।

চেতনা হল অবজেকটিভ জগতের সাবজেকটিভ প্রতিমা। আমরা সাবজেকটিভ প্রতিমার কথা বলছি এই অর্থে যে সেটা হল বস্তুজগতের রূপান্তরিত পুনর্গঠিত চেহারা। মানুষের চেতনায় জিনিস একটা প্রতিমা বা প্রতিরূপ, যেখানে বাস্তব জিনিস হল আদিরূপ। লেনিন উল্লেখ করেছেন, 'ভাববাদী দর্শনের পক্ষপাতীদের থেকে বস্তুবাদীর মৌল পার্থক্য হল এই যে অনুভব, উপলব্ধি, ধারণা এবং সাধারণভাবেই মানুষের চেতনাকে ধরা হয় অবজেকটিভ বাস্তবতার প্রতিরূপ বলে। বিশ্ব হল এই অবজেকটিভ বাস্তবতার গতি, যা চেতনার দ্বারা প্রতিফলনীয়। ধারণা, উপলব্ধি ইত্যাদির গতি আমাদের বাইরেকার বস্তুর গতির অনুরূপ।'*

লেনিন যখন বলেন যে মানুষের অনুভব আর চিন্তা অবজেকটিভ জগতের ব্যাপারাদির প্রতিরূপ, কপি, তখন তিনি চেতনায় তাদের কিছু-একটা যান্ত্রিক নিষ্ক্রিয় 'ফোটোগ্রাফির' কথা ভাবেন না। মানুষের মস্তিষ্ক ক্যামেরার ফিল্ম নয়, আয়নাও নয়। বহির্বিশ্বকে অবজেকটিভভাবে প্রতিফলিত করার সামর্থ্য গড়ে ওঠে মানুষের সামাজিক লালন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রক্রিয়ায়, সামাজিক কাজকর্মের প্রক্রিয়ায়। মানুষের মধ্যে সৃজনশীল সামর্থ্য বিকশিত না হলে প্রতিফলন সম্ভব নয়। সৃজনধর্মিতা চাই জিনিসগুলির মধ্যে তুলনা

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ১৮, পৃঃ ২৮২-২৮৩।

ও পার্থক্য করার জন্য, অংশের মধ্যে সাধারণকে, একের মধ্যে বিভিন্নকে দেখার জন্য, এক কথায়, প্রতিফলন হল একই সময়ে চেতনার একটা সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপ।

চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের মূলগত কারণ ও ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা নিহিত বিশ্বকে পুনর্গঠিত এবং মানুষের, সমাজের স্বার্থাধীন করার লক্ষ্যে চালিত ক্রিয়াকলাপে। চেতনার সক্রিয় ভূমিকা প্রসঙ্গে লেনিন লেখেন, 'মানুষের চেতনা কেবল অবজেকটিভ জগতকে প্রতিফলিত করে না, তাকে সৃষ্টিও করে... বিশ্ব মানুষকে তুষ্ট করছে না, মানুষ তাই নিজের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে তাকে পরিবর্তিত করবে বলে স্থির করে।'*

সংক্ষেপে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বস্তুসত্তাকে মনে করে আদি, আর চেতনা, চিন্তন, অনুভবকে গৌণ, তদুৎপন্ন। চেতনার উদ্ভব বস্তুসত্তা থেকে, প্রকৃতি থেকে, তার বিকাশের উচ্চতম ফল হিশেবে। চেতনা হল কেবল বহির্বিশ্বের প্রতিমা, প্রতিফলন।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

দ্বন্দ্বতত্ত্ব — বিকাশ ও সার্বিক সম্পর্কের মতবাদ

Dialectikos (দ্বন্দ্বতত্ত্ব) কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে, তাতে বোঝায় আলাপ চালনা, বিতর্ক। প্রাচীন

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৯, পৃঃ ১৯৪-১৯৫।

কালে কথাটায় বোঝানো হত প্রতিপক্ষের বক্তব্যে বিরোধ আবিষ্কার করে তার মীমাংসার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হবার বিদ্যা।

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বে প্রকৃতিকে, আমাদের চারিপাশের জগৎকে স্থির ও গতিহীন, অচল ও অপরিবর্তমান বলে ধরা হয় না, মনে করা হয় যে তা গতি ও পরিবর্তন, অবিরাম নবায়ন ও বিকাশের অবস্থায় রয়েছে, যা ঘটছে তার অভ্যন্তরীণ বিরোধের দরুন। লেনিন তাঁর 'দর্শনের নোটখাতা'য় 'দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রশ্ন' নামক রচনায় মার্কসবাদের ইতিহাসে প্রথম সূত্রবদ্ধ ও প্রতিপাদিত করেন এই কথা যে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মর্মার্থ, তার কোষকেন্দ্র হল বিরোধ বিষয়ে, বিপরীতের ঐক্য বিষয়ে মতবাদ। তিনি বলেন, 'সংক্ষেপে দ্বন্দ্বতত্ত্বের সংজ্ঞা দেওয়া যায়, বৈপরীত্যের ঐক্য বিষয়ে মতবাদ।'*

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিকাশের উৎস দেখেছে খোদ বিষয় আর ঘটনাটার নিজেরই ভেতরকার বিরোধের মধ্যে। বিকাশকে তা দেখে নিম্ন থেকে উচ্চে, সরল থেকে জটিলের দিকে গতি, উল্লম্ফনধর্মী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া হিশেবে। এ গতি চলেছে বদ্ধ বৃত্তপথে নয়, অনেকটা যেন অবদ্ধ সর্পিল আবর্তনে, তার প্রতিটি পাক আগেরটার চেয়ে বেশি প্রগাঢ়, সমৃদ্ধ, বহুমুখী।

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব অধিবিদ্যার বিরোধী, যা হয় সাধারণভাবেই পরিবর্তন, বিকাশ অস্বীকার করে, নয় তাকে পর্যবসিত করে নেহাৎ পরিমাণগত হ্রাস, বৃদ্ধিতে।

---

* ঐ, পৃঃ ২০৩।

ঘটনার অভ্যন্তরীণ উৎস (বিরোধ) অধিবিদ্যা দেখতে পায় না।

বস্তুজগৎ কেবল বিকশিত হয় তাই নয়, অংশে অংশে সংযুক্ত তা একটি একক সমগ্র। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে, সেই সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ের অভ্যন্তরে নানা দিক ও উপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বিনা বিকাশ অসম্ভব হত। প্রতিটি বিষয় অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার পরিণামে দেখা দেয় সকলের সঙ্গে সকলের সর্বমুখী সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একক প্রক্রিয়া। ঠিক এইজন্যই যেকোনো ঘটনাকে সঠিকভাবে বুঝতে, অনুধাবন করতে হলে তাকে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা প্রয়োজন, জানতে হবে তার উদ্ভব ও বিকাশ। সেইকারণে দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সর্বজনীন সম্পর্কের বিদ্যা বলেও অভিহিত করা হয়।

এক সংযোগাবদ্ধ সমগ্র হিশেবে বিশ্বের অনুধাবনে, বিষয়গুলির সার্বিক সম্পর্কের বিচারে সাহায্য করে বস্তুবাদী তত্ত্বের নিয়মাদি ও বর্গবিন্যাস।

নিয়ম বলতে কী বোঝায়? কী তার দার্শনিক অর্থ? নিয়ম হল ঘটনা ও বিষয়গুলির মধ্যে অবজেকটিভ, সাধারণ, আবশ্যিক ও অতিগুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যার বৈশিষ্ট্য হল স্থায়িত্ব ও পুনরাবৃত্তি।

প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মগুলির জ্ঞান অবলম্বন করে লোকে কাজকর্ম করে সচেতনভাবে, কোনো একটা ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগেই ধরতে পারে, নিজেদের স্বার্থে প্রকৃতির বস্তু আর তার গুণকে ঢেলে

সাজে, নিজেদের জীবনযাত্রার সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্তন ঘটায়। মার্কসের কথায়, জিনিসগুলির মধ্যে সম্পর্ক একবার বোঝা গেলে বিদ্যমান ব্যবস্থার অবিরাম আবশ্যিকতায় তাত্ত্বিক বিশ্বাস ধসে পড়ে, ধসে পড়ে তা কার্যক্ষেত্রে ধ্বংস পাবার আগেই।*

প্রকৃতি, সমাজ অথবা চিন্তনের এক-একটা ক্ষেত্রের ঘটনা যেখানে বিচার করা হয় আংশিক নিয়ম দিয়ে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন সেখানে অধ্যয়ন করে সার্বিক নিয়ম, যাতে প্রতিফলিত হয় বিশ্বের সর্বব্যাপী সম্পর্ক। এই নিয়মগুলি বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাকে বলা হয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিয়ম।

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের মৌল নিয়ম

দ্বন্দ্বতত্ত্বের মৌল নিয়মগুলি হল: বৈপরীত্যের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ, নেতির নেতিকরণ বা নাকচের নাকচ বিষয়ক নিয়ম।

বৈপরীত্যের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব। প্রকৃতি, সমাজ ও প্রজ্ঞানের সমস্ত ঘটনারই বৈশিষ্ট্য হল অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য, বিরোধী দিক ও প্রবণতা। যেমন, নিষ্প্রাণ

---

* দ্রঃ মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪৬১-৪৬২।

প্রকৃতিতে এই ঐক্য ও বৈপরীত্য হল ধনাত্মক (পর) নিউক্লিয়াস আর ঋণাত্মক (অপর) ইলেকট্রন; জীবন্ত প্রকৃতিতে—আত্তীকরণ, ব্যাত্তীকরণ; সমাজে—শ্রেণী বৈর; চিন্তনে—বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ। এই দ্বান্দ্বিক বিরোধে একটা বিপরীত দিক অন্যটা ছাড়া থাকতে পারে না। অর্থাৎ বৈপরীত্য বিদ্যমান একই ঘটনার মধ্যে আবির্ভূত হয় ঐক্যে। মুহূর্তের জন্য কল্পনা করা যাক যে একটা বৈপরীত্য অন্যটা থেকে সরে গেল, ধরা যাক, আত্তীকরণ থেকে ব্যাত্তীকরণ। তার অর্থ দেহসত্তার ধ্বংস, অর্থাৎ খোদ ঘটনাটারই অবসান। অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে থাকলেও তাদের 'শান্তি' বা 'আপোস' নেই কেননা তারা বিপরীত। সেই কারণে প্রতিটি ঘটনার মধ্যে নিহিত যেমন বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব, তেমনি তাদের ঐক্য।

প্রধান ভূমিকা দ্বন্দ্বের, সংগ্রামের। বৈপরীত্যের মধ্যে সংগ্রামের ফলে ঘটে বিকাশ। বস্তুর, ঘটনার অস্তিত্বের সমস্ত পর্যায়েই চলে দ্বন্দ্ব। তার স্থান থাকে প্রতিটি ঐক্যের উদ্ভবের কালে, বিদ্যমান থাকে ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে। সেটাই হল তার রূপলাভ ও বিকাশের কারণ। তা বিদ্যমান থাকে এবং বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে সে ঐক্যের ভাঙন, ধ্বংস আর নতুন ঐক্য উদ্ভবের পর্বে। বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব থেকেই দেখা দেয় পুরনো ঐক্যের ভাঙন এবং তার জায়গায় নতুন, অস্তিত্বের নতুন পরিস্থিতির পক্ষে বেশি উপযোগী ঐক্য।

বৈপরীত্বের দ্বন্দ্ব থেকে ঐক্যের পার্থক্য এই যে তা সাময়িক। এই দ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত হয়ে ঐক্য টিকে থাকে কিছুকালের জন্য, যতক্ষণ না পেকে উঠে তার একটা

সমাধান হচ্ছে, তারপর অদৃশ্য হচ্ছে নতুন ঐক্যের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে। এই ঐক্যও কিছুকাল টিকে থাকে তারপর তার নিজস্ব বিরোধগুলির মধ্যে সংগ্রাম বেড়ে ওঠার পরিণামে তাও ধ্বংস পায়, স্থান ছেড়ে দেয় তৃতীয়কে এবং এই চলতে থাকে অবিরাম।

বিরোধ, বৈপরীত্যের সংগ্রাম হল সমস্ত ঘটনা ও প্রক্রিয়ার গতি ও বিকাশের অভ্যন্তরীণ উৎস। বস্তুর বিকাশ চলে অভ্যন্তরীণ শক্তির কল্যাণে, নিজের মধ্যেই থাকে তার গতির উৎস।

দ্বান্দ্বিক বিরোধের মর্মার্থকে এই বলে নির্দিষ্ট করা যায় যে তা বৈপরীত্যগুলির মধ্যে এমন পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ যখন তারা একটি অন্যটির শর্ত আবার একইসময়ে তারা পরস্পরকে নাকচ করছে। তাদের মধ্যে সংগ্রামই চালিকা শক্তির কাজ করে। বৈপরীত্যের ঐক্য ও দ্বন্দ্বের নিয়মটিতে ব্যাখ্যাত হয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য — গতি, বিকাশ রূপায়িত হয় নিজে থেকে গতি, নিজে থেকে বিকাশ হিশেবে।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত আর গুণগত থেকে পরিমাণগত পরিবর্তনে রূপান্তর। যেকোনো বস্তুরই থাকে নির্দিষ্ট একটা গুণ যাতে সে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক আর আয়তন, ওজন ইত্যাদির দিক থেকে নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ।

পরিমাণ আর গুণ নিজেদের মধ্যে নিবিড়ভাবে, অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। গুণের পরিবর্তনে বস্তুটারই পরিবর্তন

হয়, পরিণত হয় তা অন্য বস্তুতে। নির্দিষ্ট একটা মাত্রা পর্যন্ত পরিমাণের পরিবর্তনে বস্তুটা বদলায় না। যেমন, গোটা দশেক, এমনকি শতেক ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লেও ধাতু গলে না, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা মাত্রা পর্যন্ত তার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু গলন-বিন্দু পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়ালে কঠিন পদার্থ পরিণত হয় তরলে, ফুটন্ত মাত্রা পর্যন্ত বাড়ালে তরল হয় গ্যাস। অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন পেশছয় গুণগত পরিবর্তনে।

পরিমাণগত পরিবর্তন চলে না থেমে, ক্রমশ, বিবর্তনের পথে। গুণগত পরিবর্তন ঘটে লাফ দিয়ে, ধারাবাহিকতা চূর্ণ করে। প্রকৃতি ও সমাজে থাকে যেমন মন্থর বিবর্তন, তেমনি ক্ষিপ্র উল্লম্ফন।

উল্লম্ফন হল পরিমাণ থেকে গুণে রূপান্তরের প্রক্রিয়া, পদার্থের, ঘটনার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তরণ। উল্লম্ফন হতে পারে দ্রুত, যখন গুণ বদলিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ, পুরোপুরি (যেমন, রাসায়নিক বিক্রিয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল) আবার মন্থর, একটা গুণ থেকে অন্যটায় ক্রমিক রূপান্তর মারফত (নতুন জাতের উদ্ভিদ, পশু ইত্যাদির উদ্ভব)। এ ক্ষেত্রে পুরনো গুণ নতুনে রূপান্তরিত হয় তৎক্ষণাৎ নয়, পুরোপুরি নয়, ক্রমশ, অংশে অংশে: আস্তে আস্তে ঝরে পড়তে থাকে পুরনো গুণের উপাদান, আস্তে আস্তে তার জায়গা নিতে থাকে নতুন।

এই ধরনের উল্লম্ফনকে উপাদানের তেমন পরিমাণগত ক্রমিক সঞ্চয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় যা ঘটতে থাকে পুরনো গুণের কাঠামোর মধ্যেই।

সুতরাং পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণে এবং গুণগত পরিবর্তনের পরিমাণে উৎক্রমণের নিয়ম হল বিষয়টির পরিমাণগত ও গুণগত দিকের মধ্যে এমন আন্তর্যোগাযোগ ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া যার ফলে ছোটো ছোটো, প্রথম দিকে অলক্ষ্য পরিমাণগত পরিবর্তন ক্রমশ সঞ্চিত হয়ে একটা আমূল গুণগত পরিবর্তন ঘটায় যা উল্লম্ফনের রূপ নেয় এবং বিষয়টার প্রকৃতি ও বিকাশের পরিস্থিতি অনুসারে কার্যকৃত হয়।

বস্তুজগতের নবীভবন, উল্লম্ফন প্রক্রিয়া — পুরনোর ধ্বংস আর নতুন উদয়ের বৈশিষ্ট্য হল পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণে উৎক্রমণের অবজেকটিভ নিয়ম।

নেতির নেতিকরণ, নাকচের নাকচ। গুণগত পরিবর্তন সম্ভব কেবল পুরনো অবস্থা নাকচ করে। নাকচ হল সর্ববিধ বিকাশের একটা অপরিহার্য ও নিয়মশাসিত দিক। নিজের অস্তিত্বের পূর্বতন রূপ নাকচ না করে বিকাশ ঘটতে পারে না। এ ছাড়া নতুন কিছুর উদ্ভব সম্ভব নয়। নাকচ কী জিনিস?

বিকাশের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী মতে নাকচ বলতে পুরনোর পুরোপুরি ধ্বংস বোঝায় না। প্রথমত, সরলতর কোনো কোনো জিনিস প্রায়ই তাদের অস্তিত্ব চালিয়ে যায় জটিলতরের পাশাপাশি। যেমন সজীব প্রকৃতিতে উচ্চতর গঠনের প্রাণীদের সঙ্গে সঙ্গে টিকে থাকে সরলতর গঠনের জীবেরাও। দ্বিতীয়ত, অগ্রগতিমূলক বিকাশ প্রক্রিয়ায় পুরনো থেকে উদ্ভূত নতুন সে পুরনোয় যা সদর্থক ও মূল্যবান ছিল তা যেন শোষণ করে নেয়। যেমন, জীব জগতে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় পূর্বপুরুষেরা

যেসব হিতকর গুণ সঞ্চয় করেছিল, প্রতিটি নতুন প্রজাতি তার পুনর্জন্ম দিয়ে যায়। সমাজের ইতিহাসে প্রতিটি নতুন সমাজব্যবস্থা দেখা দিয়েছে শূন্যস্থল থেকে নয়, পূর্ববর্তী যুগে সৃষ্ট বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ আত্মস্থ করার ভিত্তিতে।

নাকচ বলতে বিকাশে যোগসূত্র, ধারাবাহিকতা ধরে নেওয়া হয়। নাকচের ফলে যে ঘটনার উদ্ভব হল, তা যেন পূর্ববর্তী পর্যায়ের অর্জনকে আত্মস্থ করে, আবার সেইসঙ্গে তা অন্তঃসারের দিক থেকে বেশি সমৃদ্ধ, নতুন একটা-কিছু। নাকচের নাকচ নিয়মটিতে নিম্ন থেকে উচ্চে, সরল থেকে জটিলে আরোহণ হিশেবে বোঝা হয় বিকাশের অগ্রগতিমূলক চরিত্রকে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের বর্গভেদ

যেকোনো বিজ্ঞানের মতো বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বও শুধু নিয়মের নয়, দার্শনিক বর্গেরও একটা তন্ত্র। দ্বন্দ্বতত্ত্বে বর্গ বলতে বোঝায় এমন বোধ যাতে প্রতিফলিত হয়েছে চারিপাশের বাস্তবতার সাধারণ চেহারা আর সম্পর্ক, দিক আর বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষেপে হলেও দার্শনিক বস্তুবাদের কয়েকটা বর্গ দেখা যাক।

একক, বিশেষ ও সাধারণ। আমাদের চারপাশের জগতের সমস্ত জিনিস আর ঘটনারই আছে একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, যেটা কেবল তারই নিজের। একেবারে একই রকম দুটো জিনিস কখনো হয় না। যা কেবল নির্দিষ্ট ঘটনাটার বৈশিষ্ট্য, অন্য কিছুতে

নেই, সেটা হল একক। সেইসঙ্গে আবার পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস বা ঘটনা নেই যার কতকগুলো দিকের সঙ্গে অন্যান্য জিনিস বা ঘটনার মিল নেই। যে ব্যাপারটা কেবল একটা নয় বহু ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, সেটা সাধারণ। একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনায় ধরা পড়ে তাদের সাদৃশ্য আর পার্থক্য। তুলনীয় বস্তুরা যে দিক থেকে পৃথক, সেটা হল বিশেষ। যেমন, প্রকৃতির একটা উপাদান লোহা। সাধারণ হিশেবে তা প্রাকৃতিক উপাদান, আর বিশেষ হিশেবে তা ধাতু, আর একক হিশেবে তা লোহা। সামাজিক জীবনে বিপ্লব ঘটে — এটা সাধারণ। বিশেষ হিশেবে সে বিপ্লব হতে পারে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব। আর মূর্ত-নির্দিষ্ট কোনো দেশে সেই একই বিপ্লবের চরিত্র একক।

একক, সাধারণ, বিশেষ পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এককের মধ্যেই থাকে সাধারণ, সাধারণ দেখা দেয় কেবল বিশেষগুলির মধ্যে এবং তাদের মাধ্যমে।

কার্য-কারণ। একটা ঘটনা যখন অন্য ঘটনার জন্ম দেয়, তখন সেটা হয় তার কারণ। কারণের ক্রিয়াকলাপ থেকে দাঁড়ায় কার্য, তার পরিণাম, ফল। কারণ হল ঘটনাদির মধ্যেকার সম্পর্ক, এতে একটা থাকলে প্রত্যেকবার আসে অন্যটা। যেমন, জল গরম হওয়া হল তার বাষ্পে পরিণত হবার কারণ। কেননা উত্তপ্ত হলেই প্রত্যেকবার শুরু হয় বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া।

কারণের চরিত্র সার্বিক। বিনা কারণে কোনো ব্যাপার বা ঘটনা সম্ভব নয়। অবশ্যই লোকে এমন ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণ সেই মুহূর্তে জানা

নেই। তবে প্রজ্ঞানের প্রক্রিয়ায় কালক্রমে নির্ধারিত হয় তার কারণ। বিকাশের প্রক্রিয়া হল কার্য-কারণের একটা জটিল গ্রন্থন।

অনিবার্যতা আর আপাতিকতা। একটা ঘটনার অভ্যন্তরে শর্তবদ্ধ উপাদানাদির মধ্যেকার ধর্ম ও সম্পর্ক হল অনিবার্যতা। যে ধর্ম আর সম্পর্ক বাইরেকার পরিস্থিতি ঘটিত, সেটা আপাতিকতা। যেমন পুঁজিপতি কর্তৃক মজুরি-শ্রমিক খাটানো অনিবার্য, তা ছাড়া পুঁজিপতি থাকে না। কিন্তু কোন বিশেষ শ্রমিক, রাম বা শ্যামকে পুঁজিপতি নিয়োগ করবে, সেটা আপাতিকতা। অনিবার্যতা হল নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যা অবশ্য-অবশ্যই ঘটবে। আপাতিকতা হল সেই পরিস্থিতিতে যা ঘটতেও পারে আবার না ঘটতেও পারে। এভাবেও হতে পারে, অন্যভাবেও হতে পারে। আপাতিকতা হল অনিবার্যতার আত্মপ্রকাশের একটা রূপ, তার পরিপূরণ।

সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা। সম্ভাব্যতা হল উপযোগী পরিস্থিতিতে যা ঘটতে পারে। বাস্তবতা হল যা ইতিমধ্যেই ঘটেছে। অন্য কথায়, সম্ভাব্যতা বলতে আমরা বুঝি সেইসব ধর্ম, বস্তু, প্রক্রিয়া যা বাস্তবে নেই, কিন্তু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যাবার সামর্থ্য থাকায় বিদ্যমান বাস্তবতায় যা দেখা দিতে পারে। সম্ভাব্যতা রূপায়িত হয়ে পরিণত হয় বাস্তবতায়, তাই বাস্তবতাকে বলা যায় রূপায়িত সম্ভাব্যতা আর সম্ভাব্যতা হল গর্ভস্থ বাস্তবতা।

সম্ভাব্যতা হতে পারে বাস্তব এবং বিমূর্ত। বাস্তব

সম্ভাব্যতায় প্রকাশ পায় বিকাশের নিয়মানুগ প্রবণতা, সে সম্ভাবনা রূপায়িত হবার আবশ্যিক শর্ত থাকে বাস্তবে (যেমন, নয়া-ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির মুক্তি)। বিকাশের তখনকার পর্যায়ে বাস্তবতায় রূপায়িত হবার পরিস্থিতি থাকে না বিমূর্ত সম্ভাব্যতায়, কিন্তু সে পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে ভবিষ্যতে (যেমন, সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে মানুষের অধিবাস)।

বিষয়বস্তু ও রূপ, আধার ও আধেয়। বাস্তবতার যেকোনো ব্যাপারই তার বিষয়বস্তু আর রূপ নিয়ে একত্রে গঠিত। বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বে বিষয়বস্তু হল ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত সমস্ত উপাদান, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ও পরিবর্তনের সমষ্টি। কোনো একটা ঘটনার প্রকৃতিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তন ঘটে বিশৃঙ্খলভাবে নয়, নির্দিষ্ট একটা কাঠামোর ভেতর, তাদের থাকে সম্পর্কপাতের একটা আপেক্ষিক স্থায়ী ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট একটা গঠন। বিষয়বস্তুর উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ব্যবস্থা, তার গঠনটা হল রূপ, আধার। রূপ আর বিষয়বস্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছেদ্য নয়, তারা হল ঐক্যে আবদ্ধ বৈপরীত্য। বিষয়বস্তু দিয়েই নির্ধারিত হয় তার রূপ। রূপের চেয়ে বিষয়বস্তু বদলায় বেশি আগে, তাদের মধ্যে দেখা দেয় বিরোধ। নতুন বিষয়বস্তু পুরনো রূপ বর্জন করে নতুন রূপ নেয়। বিষয়বস্তুর ওপর রূপের প্রভাব সক্রিয়: বিকাশ ত্বরান্বিত হয় নতুন রূপে, ব্যাহত হয় পুরনোয়।

মর্মার্থ আর ঘটনা। এতে বোঝায় ব্যাপারের, ঘটনার বিভিন্ন দিক। মর্মার্থ হল ব্যাপারটার সমস্ত আবশ্যকীয় দিক ও সম্পর্কপাতের সামগ্রিকতা; ঘটনা হল এইসব দিক ও সম্পর্কপাতের বাহ্য প্রকাশ অর্থাৎ মর্মার্থের অভিব্যক্তি। মর্মার্থ ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত, নিজের বিষয়বস্তু প্রকাশ করে কেবল তার মধ্য দিয়ে। ঘটনাও তার মর্মার্থ ছাড়া থাকতে পারে না। মর্মার্থ ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা লেনিন বুঝিয়েছেন একটা খরস্রোতা নদীর উপমা দিয়ে, যার ওপরে ঢেউ, ফেনিলতা। '...ওপরে ফেনিলতা আর নিচে গভীর স্রোত। কিন্তু ফেনিলতাও মর্মার্থের প্রকাশ।'*

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রজ্ঞান তত্ত্ব

বিশ্বকে কি জানা যায়?

এ প্রশ্নে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের সুস্পষ্ট, বিজ্ঞানসিদ্ধ উত্তর: হ্যাঁ, বিশ্বকে জানা সম্ভব। বিশ্বের প্রজ্ঞেয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায়।

প্রজ্ঞান হল মানুষের চেতনায় বাস্তবতার প্রতিফলন। কেবল মানুষের চারিপাশের জগৎই হল প্রজ্ঞানের উৎস। মানুষের ওপর এই জগতের প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৯, পৃঃ ১১৬।

দেখা দেয় তদনুসারী অনুভব, ধারণা, বোধ, যা পরে পরীক্ষিত হয় প্রয়োগে, ব্যবহারে।

প্রয়োগ হল প্রকৃতি ও সমাজ পুনর্গঠনে মানুষের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ। তার মূলকথা হল শ্রম, বৈষয়িক উৎপাদন। রাজনৈতিক, শ্রেণীগত সংগ্রাম, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ইত্যাদিও প্রয়োগের অন্তর্গত। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনাবলির সমস্ত জ্ঞানই শুরু ও শেষ হয় প্রয়োগে।

যেমন, মধ্য যুগে ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে একটা জিনিস যদি আরেকটার চেয়ে একশ গুণ ভারি হয়, তাহলে ওপর থেকে ফেললে ভারিটা মাটিতে পড়বে একশ গুণ তাড়াতাড়ি। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২) কথাটা বৈজ্ঞানিকভাবে খণ্ডনের জন্য শহরের মিনার থেকে দুটি বিভিন্ন ওজনের গোলক ফেলেন, দুটিই মাটিতে পড়ে একসঙ্গে। এইভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের অন্ধবিশ্বাস খণ্ডন করে চাক্ষুষ দেখালেন যে পতনশীল সমস্ত বস্তুর গতিবেগ একই।

প্রজ্ঞানের যাত্রাবিন্দু ও বনিয়াদ হল প্রয়োগ। প্রজ্ঞানের উদ্ভবই প্রয়োগ থেকে। অস্তিত্বের প্রথম দিন থেকেই মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে জেনেছে প্রকৃতির শক্তি, অর্জন করেছে জ্ঞান।

প্রজ্ঞানের উদ্দেশ্যও হল প্রয়োগ। লোকে তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে জানে, তার বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করে তার জ্ঞানের ফলাফলকে নিজের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে লাগাবার জন্যই তো।

জ্ঞান নিয়েই মানুষ জন্মায় না, তা অর্জিত হয় তার জীবনযাত্রার গতিপথে, সেটা হল তার প্রজ্ঞানের ফল। তবে প্রজ্ঞান মানুষের মস্তিষ্কে কেবল বাহ্য জগতের দর্পণসুলভ প্রতিবিম্বই শুধু নয়, এ হল অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অসম্পূর্ণ আর অযথার্থ জানা থেকে বেশি সম্পূর্ণ এবং আরো সঠিক জ্ঞানে চিন্তাগতির জটিল প্রক্রিয়া। বিশ্ব যেহেতু অসীম, জ্ঞানেরও তাই সীমা আর শেষ নেই।

প্রজ্ঞানের কী কী পর্যায়?

প্রথম পর্যায় — অনুভব। মানুষ সর্বাগ্রে তার শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বকে জানে। এগুলো যেন এক-একটা পথ যা দিয়ে সে বস্তুজগতের খবর পায়।

দ্বিতীয় পর্যায় — যুক্তিযুক্ত বা বিমূর্ত চিন্তন। ঘটনার মর্মে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য দিয়ে ভাবা, তাদের একটা তন্ত্রে সাজানো, গৌণ আর আপতিক খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে প্রধান জিনিসটা আবিষ্কার করা।

কিন্তু ইন্দ্রিয় যে সঠিক খবর দিয়েছে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাদের সংবেদন আর চিন্তনের মধ্যে বিকৃতি নেই কি? প্রজ্ঞান প্রক্রিয়ায় লব্ধ জ্ঞান সত্য হয় কেবল ব্যবহারে তা সমর্থিত হবার পর। মানুষ যদি তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী প্রত্যাশিত

ফল পায়, তাহলে সেটা বাস্তবতার সঙ্গে মিলছে, তার মানে সেটা সত্য।

সেক্ষেত্রে পরিষ্কার করে নিতে হবে সত্য ব্যাপারটা কী?

সত্য বিষয়ে মতবাদ

সত্য হল একটা বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তেমন জ্ঞান যা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে, জিনিসটার বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করে। বাস্তবের সঙ্গে মেলায় সত্য জ্ঞান 'মানুষটা বা মনুষ্যজাতির ওপর নির্ভর করে না'*। অবজেকটিভ ক্ষেত্রে বিদ্যমান বহির্জগৎ দ্বারা তা নির্ধারিত। এই হল অবজেকটিভ সত্য।

অবজেকটিভ সত্য অপরিবর্তিত থাকতে পারে না, কেননা যে বাস্তবতা তা প্রতিফলিত করছে তা স্থির থাকে না, অবিরাম পরিবর্তিত আর বিকশিত হচ্ছে। প্রতিফলিত বিষয়টাই যখন বদলাচ্ছে, একটা গুণ থেকে অন্য গুণে উপনীত হচ্ছে, একধরনের বৈশিষ্ট্য আর সম্পর্কপাত থেকে অন্যধরনের বৈশিষ্ট্য আর সম্পর্কপাত দেখা দিচ্ছে, তখন তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সত্য হতে হলে জ্ঞানকে অবশ্যই হতে হবে পরিবর্তিত, পরিপূরিত, পরিবর্তমান বাস্তবতার অনুযায়ী। তাই অবজেকটিভ

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ১৮, পৃঃ ১২৩।

সত্য হল আপেক্ষিক, সামাজিক প্রজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিফলনীয় বাস্তবতা আর তার অস্তিত্বের শর্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবজেকটিভ সত্যও অনিবার্যই বদলায়। যে জ্ঞান বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে নি, অর্থাৎ প্রজ্ঞানের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় যে জ্ঞানকে যথাযথ হতে হবে, সেটা হল আপেক্ষিক সত্য।

তবে আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক হলেও তার মানে এই নয় যে পরম সত্য বলে কিছু নেই। আপেক্ষিকের মধ্যেই থাকে পরমের উপাদান। অবজেকটিভ সত্য একই সময়ে আপেক্ষিক এবং পরম। যে পরিমাণে সঠিকভাবে তা প্রতিফলিত করে বাস্তবতার কোনো একটা দিক আর সম্পর্কপাত, সেই পরিমাণেই তা পরম। আর এই প্রতিফলন যেহেতু সর্বদাই অসম্পূর্ণ, বিষয়টার সমগ্র অন্তর্বস্তু (সেটা অন্তহীন) ধারণ করছে না এবং করতে পারে না; তাই তা আপেক্ষিক।

অতএব, আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক হলেও তার অবজেকটিভ চরিত্র আর পরমতা বাতিল হয় না। 'মানবিক মননের প্রকৃতিই এমন যে আমাদের তা দিতে পারে এবং দিয়ে থাকে পরম সত্য যা গড়ে ওঠে আপেক্ষিক সত্যগুলির সমষ্টি থেকে। বিজ্ঞান বিকাশের প্রতিটি পর্যায় পরম সত্যের এই সমষ্টিতে নতুন বীজ যোগায়, কিন্তু প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সীমাটা আপেক্ষিক, জ্ঞানের পরবর্তী বিকাশে কখনো তা পরিবর্ধিত, কখনো সংকুচিত।'*

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ১৮, পৃঃ ১৩৭।

২। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

সামাজিক বিকাশের প্রধান কথা — বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের পদ্ধতি

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের একটা মূলাঙ্গ। এটা হল সমাজ বিষয়ে দর্শন। বহু কাল ধরে লোকেদের মনে এইসব প্রশ্ন জেগেছে: সমাজ জিনিসটা কী, কেমন করে তার উদ্ভব, কিসে নির্ধারিত হয় তার বিকাশ, সে বিকাশের নিয়মগুলি কী। ইতিহাস, রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র ইত্যাদি সমাজবিষয়ক সুনির্দিষ্ট বিদ্যাগুলি থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পার্থক্য হল এই যে তা সমাজ বিকাশের **সর্বাধিক সাধারণ** নিয়মগুলি নিয়ে চর্চা করে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অথবা ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের প্রবর্তক হলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা একটা বিপ্লব ঘটান। তাঁদের উত্তরসাধক হলেন লেনিন।

এ বিপ্লবের মূলকথাটা হল ইতিহাসের অবৈজ্ঞানিক ভাববাদী বোধের জায়গায় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ। প্রাক্‌মার্কসবাদী চিন্তানায়কেরা মনে করতেন ইতিহাস হল লোকেদের, তাদের চেতনা ও সংকল্পের সৃষ্টি। তা থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে সমাজের বিকাশে সমস্ত পরিবর্তন নির্ভর করে

কেবল ভাবনা, লোকেদের তাত্ত্বিক ধ্যানধারণার ওপর। এমন মতও ছিল যে সমাজের বিকাশ, জনগণের জীবন কোনো একটা অতিপ্রাকৃত দৈব শক্তির দ্বারা চালিত। এইসব শক্তি নাকি নির্ধারিত করছে মানুষের ভাগ্য, চালিত করছে তাদের আচরণ। এ সবই ছিল ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

সমাজের বিকাশকে একটা অখণ্ড নিয়মশাসিত প্রক্রিয়া বলে দেখার মূলসূত্র পাওয়া গেল কেবল মার্কসবাদেই। মানবসমাজের বিকাশ ঘটে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম অনুসারে, লোকেদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তা নির্ভর করে না। লোকেরা সেসব নিয়ম সম্পর্কে সচেতন কি না, তাতেও কিছু এসে যায় না। সমাজে সক্রিয় এই নিয়মবদ্ধতার কথা না জানা পর্যন্ত লোকে কেবল অন্ধকারেই ঘুরে মরেছে। কিন্তু লোকে সেগুলি জানা মাত্রই তা কাজে লাগায় নিজের স্বার্থে। জনগণ দাবার বোড়ে নয়, বিচারক্ষম প্রাণী, ইচ্ছা, সংকল্প থাকে তাদের, সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য রাখে নিজেদের সামনে। নিজেদের ক্রিয়াকলাপে তারা প্রভাবিত করে সমাজের অগ্রগতি।

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখান যে রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা চর্চার আগে লোককে খেতে, পরতে, কোনো একটা বাসায় থাকতে হবে। অন্য কথায় লোকেদের জীবনযাত্রার বৈষয়িক পরিস্থিতি, তাদের সামাজিক অস্তিত্ব দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাদের আত্মিক আগ্রহ, ধ্যানধারণা, চেতনা, তত্ত্ব — এক কথায়, সমাজের সমগ্র আত্মিক জীবন।

আদি হল সমাজের বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের প্রক্রিয়া — শ্রম। এ প্রক্রিয়া হল চিরন্তন, স্বাভাবিক অপরিহার্যতা, সমাজজীবনের অনিবার্য শর্ত।

সমাজের উদ্ভব ও বিকাশে শ্রমের ভূমিকা

মানুষের উদ্ভব হল একই সঙ্গে মানব সমাজের উদ্ভব ও রূপলাভ প্রক্রিয়ার শুরু। বর্তমান চেহারায় মানুষ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল মোটামুটি ৪০ হাজার বছর আগে, আর সরলতম জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত জৈবজগতের বিবর্তনে লেগেছে শত-শত কোটি বছর।

ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন দেখান যে মানুষের উদ্ভব জীবজগৎ থেকে, অতীতের অতিবিকশিত নরসদৃশ বানর থেকে। কিভাবে তা ঘটল? ডারউইন তার উত্তর দিতে পারেন নি। কেবল এঙ্গেলসই দেখান যে মানুষের উদ্ভবে নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছিল শ্রম।

বহু সহস্র বছর ধরে মানুষের পূর্বজরা সামনের দুটি অঙ্গপ্রান্তকে শ্রমপ্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত করায়, জিনিস ধরতে শেখায়। হাতের কাজ বদলে যাওয়ায়, খাড়া হয়ে হাঁটায় মানবদেহের গোটা বিকাশটাই প্রভাবিত হতে থাকে। এর ফলে লোকেদের ঐক্য হয় আরো নিবিড়, বেড়ে ওঠে পারস্পরিক সাহায্য আর একত্রে ক্রিয়াকলাপ। শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যম, উচ্চারিত ভাষা।

শ্রম, উচ্চারিত ভাষা হল নরসদৃশ বানরের মস্তিষ্ককে মানুষের মস্তিষ্কে পরিণত করার প্রধান প্রেরণা। এঙ্গেলস লিখেছেন, 'হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে মাথা, দেখা দিল চেতনা — প্রথমে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপকারে লাগার মতো এক-একটা পরিস্থিতির জ্ঞান এবং পরে তার ভিত্তিতে বেশি অনুকূল পরিস্থিতিতে থাকা লোকেদের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মাদি সম্পর্কে বোধ, যা ছিল এই সব হিতকর ফলাফলের কারণ। আর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে প্রকৃতির ওপর পাল্টা প্রতিক্রিয়ার উপায়াদি...।'*

সমাজের জীবন ও বিকাশের ভিত্তি — বৈষয়িক উৎপাদন

বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদনে থাকে তার কতকগুলি উপাদান। মানুষের কাজে লাগবে এমন জিনিস তৈরি করার জন্য সর্বাগ্রে চাই তার উপকরণ। সেটা হল ভূমি আর ভূমিগর্ভ, উদ্ভিদ আর জীব জগৎ, অর্থাৎ মানুষের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপ চলবে যা নিয়ে সেই **শ্রমের বস্তু।** উৎপাদনের জন্য আরো দরকার **শ্রমের উপায়,** এমন জিনিস যা থাকে মানুষ আর বস্তুর মাঝখানে, যার সাহায্যে মানুষ শ্রমের বস্তুকে রূপান্তরিত করে। এগুলি হল সর্বাগ্রে শ্রমের হাতিয়ার (কুড়ুল, করাত, হাতুড়ি,

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২০, পৃঃ ৩৫৮।

লেদ মেশিন, জটিল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি)। এই হাতিয়ার ক্রমাগত বদলায়, উন্নত হয়। শ্রমের হাতিয়ার আর বস্তু একত্রে হল **শ্রমের উপায়।**

তবে শ্রমের উপায় আপনা থেকে কাজ করে না। বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা নেয় লোকেরা, মেহনতিরা, তাদের জ্ঞান আর নৈপুণ্য। এইসব উপায় সৃষ্টি ও চালু করে লোকেরাই। বৈষয়িক সম্পদের স্রষ্টা লোকেরা আর উৎপাদনের উপায় হল সমাজের **উৎপাদনী শক্তি।** উৎপাদনী শক্তিতে প্রকাশ পায় সমাজ আর প্রকৃতির মধ্যে বৈষয়িক সম্পর্ক। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের মানে সূচিত হয় প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের মান। উৎপাদনী শক্তির মানে অন্যদিকে সূচিত হয় উৎপাদনের হাতিয়ারের বিকাশ, উৎপাদনের শক্তিযোজনা, উৎপাদকদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আর সামর্থ্যের মাত্রাও।

সেই আদি কাল থেকেই টিকে থাকার জন্য, বন্য পশু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অস্তিত্বের উপকরণ সংগ্রহের জন্য লোককে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছে। একদল লোকের অন্যদের ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে উৎপাদনের হাতিয়ার বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। আর শ্রমের উপায়, উৎপাদনী অভিজ্ঞতা, শ্রমের উৎপন্ন সবই লোকেদের একত্র ক্রিয়াকলাপের ফল।

বৈষয়িক-উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়ায় লোকেদের অবশ্যই আসতে হয় নিজেদের মধ্যে একটা **উৎপাদনী সম্পর্কের** মধ্যে। এই সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে থাকে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা। অন্য কথায়,

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনী উপায়ের মালিক কে, তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় লোকেদের মধ্যে উৎপাদনী সম্পর্ক।

যেমন সামাজিক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রম সহযোগিতার সম্পর্ক, কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক, উৎপন্ন বণ্টিত হয় মেহনতিদের স্বার্থে। ব্যক্তিগত মালিকানায় দেখা দেয় শোষণ ও পীড়নের সম্পর্ক। শোষকেরা শোষিতদের শ্রমে উৎপন্ন বৈষয়িক সম্পদের বেশির ভাগটাই আত্মসাৎ করে আর শোষিতরা ভোগে অভাব অনটনে।

উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্ক একসঙ্গে মিলে গড়ে তোলে উৎপাদনী ধরন বা প্রণালী। উৎপাদনী ধরন আর তার মূলাঙ্গ — উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের চরিত্র অবজেকটিভ, তা বিদ্যমান থাকে লোকেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, চেতনা সংকল্প নির্বিশেষে। লেনিনের একটা উপমা ব্যবহার করে বলা যায়, উৎপাদনী ধরন না প্রণালী হল 'সমাজের কঙ্কাল', তাতে 'রক্ত-মাংস' জোগায় সমাজের অন্য সমস্ত ব্যাপার, সম্পর্কপাত, প্রতিষ্ঠানাদি। সব মিলিয়ে এটা হল একটা জীবন্ত সমগ্র, সমাজের একটা নির্দিষ্ট রূপ, নির্দিষ্ট একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল সমাজের নির্দিষ্ট একটা টাইপ, পুরো একটা সামাজিক ব্যবস্থা যা

নির্দিষ্ট উৎপাদনী প্রণালীর ভিত্তিতে তার বিশিষ্ট নিয়ম অনুসারে কাজ চালায় ও বিকশিত হয়।

উৎপাদনী ধরন বা প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা অবিরাম পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান। তবে উৎপাদনের পরিবর্তন আর বিকাশ শুরু হয় উৎপাদনী শক্তির পরিবর্তন থেকে। তাদের পিছু পিছু পরিবর্তিত হয় উৎপাদনী সম্পর্ক। আর তার ভিত্তিতে ঘটে গোটা সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক ধ্যানধারণা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে বলা হয় উপরিকাঠামো তার সবকিছুতে পরিবর্তন। তবে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা অর্থনৈতিক বনিয়াদ (উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের প্রক্রিয়ায় প্রভুত্বকারী উৎপাদনী সম্পর্কের সমষ্টি) থেকে উপরিকাঠামোর স্বাতন্ত্র্যের ওপরেই কেবল জোর দেন নি, বনিয়াদের ওপর উপরিকাঠামোর পাল্টা প্রতিক্রিয়ার কথাও তুলে ধরেছেন। 'রাজনৈতিক, ব্যবহারশাস্ত্রীয়, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, শিল্পীয় ইত্যাদি বিকাশ অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সবাই তারা আবার পরস্পরকে এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদকেও প্রভাবিত করে। ব্যাপারটা মোটেই এই নয় যে কেবল অর্থনৈতিক অবস্থাই হল **কারণ, কেবল** তাই **সক্রিয়,** বাকি সবকিছুই কেবল নিষ্ক্রিয় পরিণাম। না, এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অনিবার্যতার ভিত্তিতে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সর্বদাই **শেষ পর্যন্ত** তার পথ করে নেয়।'*

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজজীবনের সমস্ত দিকের

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ১৭৫।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে এগোয় এবং এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আলাদা করে তুলে ধরে প্রধান, নির্ধারক, চালিকা শক্তিটাকে, যথা, বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনী ধরন বা প্রণালী।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেন এবং কিভাবে বদলায়?

উৎপাদনী শক্তি হল উৎপদনী ধরনের সবচেয়ে গতিময় দিক। তা থাকে সর্বদা গতির মধ্যে, বিকশিত হয় উৎপাদনী সম্পর্কের চেয়ে বেশি দ্রুত। উৎপাদনী সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তি থেকে পিছিয়ে পড়ে, দেখা দেয় তাদের মধ্যে বিরোধ। উৎপাদনী সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনী শক্তির শৃংখল। তখন সংঘাত বাধে, তার সমাধান হয় পুরনো উৎপাদনী সম্পর্কের স্থানে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়।

উৎপাদনী শক্তির চরিত্র ও বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনী সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিষয়ে মার্কসবাদী নিয়মের এই হল মূলকথা। এটা হল বৈষয়িক উৎপাদনে আর সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজে অগ্রগতির মূলীভূত চালিকা শক্তির নিয়ম। এটা হল সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলির একটা এবং তা কাজ করে যায় মানবসমাজের গোটা ইতিহাস ধরে।

সংক্ষেপে, উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত হল সেই কারণ যাতে নির্ধারিত হয় পুরনো সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে নতুনে উত্তরণের অনিবার্যতা। তাই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হল ঐতিহাসিক

প্রগতির পথে সমাজের অগ্রগমন। ইতিহাসে পাঁচটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা জানা আছে: আদিম-কৌম, দাসমালিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট ব্যবস্থা যার প্রথম পর্যায় হল সমাজতন্ত্র।

একটা সমাজব্যবস্থা থেকে অন্যটায় উত্তরণ সূচিত হয় প্রগাঢ় সামাজিক ওলটপালটে, সাধারণত তা সম্পন্ন হয় বিপ্লবের মাধ্যমে। আর যে অমোঘতায় দাসমালিক সমাজ স্থান ছেড়ে দেয়* সামন্ততন্ত্রকে, সামন্ততন্ত্র পুঁজিতন্ত্রকে, সেই অমোঘতাতেই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিশেবে পুঁজিতন্ত্রও কমিউনিজমকে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য। এটা হল মানবিক সমাজ বিকাশের সামাজিক-ঐতিহাসিক ও নিয়মশাসিত একটা প্রক্রিয়া।

সামাজিক বিকাশের অগ্রগতিমূলক চরিত্রের জ্ঞান ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকেই আসে মেহনতিদের বিজয় বিষয়ে আশাবাদ আর আত্মবিশ্বাস। নিজেদের সাধনার সাফল্য যে অনিবার্য এতে তারা নিঃসন্দেহ, কেননা ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মগুলি তাদেরই সপক্ষে সক্রিয়।

শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রাম আর রাষ্ট্র

সমাজবিকাশের উৎস — শ্রেণী-সংগ্রাম

শ্রেণী কী জিনিস, কেমন করে তার উদ্ভব হল, এ নিয়ে লোকে ভাবছে অনেকদিন থেকেই। শোষকেরা

এই কথা প্রচার করে যে শ্রেণীগত অসাম্য ছিল এবং থাকবে সর্বদাই, ঈশ্বরই চিরকালের জন্য ধনী আর দরিদ্রের ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন।

ধনী আর দরিদ্রে, শোষক আর শোষিতে সমাজের বিভাগটা হল শ্রেণীর বিভাগ। সমাজের একটা অংশ যেখানে জমির মালিক, অন্য অংশটা সেখানে হাড়ভাঙা খাটে, অর্থাৎ রয়েছে ভূস্বামী আর কৃষক এই দুটি বৈরশ্রেণী। একদল লোক যেখানে কলকারখানার মালিক, অন্য দলটা সেখানে সেইসব কলকারখানাতেই কাজ করে বেঁচে থাকে, অর্থাৎ রয়েছে পুঁজিপতি আর শ্রমিক এই দুই শ্রেণী। শুধু তাই নয়, মেহনতিরা যা উৎপন্ন করল তার বড়ো একটা অংশ আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিরা। শ্রেণী বলা হয় লোকেদের তেমন ভাগাভাগিকে যাতে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্ক হেতু একদল লোক অন্য দলের পরিশ্রম হস্তগত করে। অর্থাৎ, শ্রেণী হল বড়ো একদল লোক, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্ক, শ্রমের সামাজিক সংগঠন, সামাজিক সম্পদ প্রাপ্তির প্রণালী আর পরিমাণের দিক থেকে যারা পৃথক।

শ্রেণী কি সর্বদাই ছিল এবং থাকবে? একটা সময় শ্রেণী ছিলই না। আদিম ব্যবস্থায় লোকে থাকত কৌমে, গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে। সবারই ছিল সমান অধিকার। শ্রম ছিল সাধারণ, মালিকানাও সাধারণ। যা আহৃত হত, তাতে থাকত সবারই সমান অধিকার, বণ্টন হত সমান সমান। তবে অর্থনীতির বিকাশের মাত্রা ছিল খুবই নিচু, খেয়ে দেয়ে থাকা তাতে চলত নেহাৎ কোনোক্রমে।

এই পরিস্থিতিতে অন্যের ঘাড় ভেঙে থাকা, অন্যকে শোষণ করা ছিল অসম্ভব।

শ্রেণীভেদ কমিউনিজমেও লোপ পাবে। লেনিনের একবার একটা প্রতিবেদন দেবার কথা ছিল। প্রেক্ষাগৃহে দেখলেন, টাঙানো আছে স্লোগান 'শ্রমিক ও কৃষকদের রাজত্বের শেষ নেই!' এ ধ্বনির ভ্রান্তিটা তিনি শ্রোতাদের বোঝান। বলেন, শ্রেণী হিসেবে নিজেদের চিরন্তন করে রাখা শ্রমিকদের কাজ নয়, শ্রেণীভেদ দূর করে তাদের গড়তে হবে শ্রেণীহীন সমাজ — কমিউনিজম।*

এবার প্রশ্ন, কিভাবে আর কখন দেখা দিল শ্রেণী? শ্রেণীহীন আদিম-কৌম সমাজব্যবস্থা টিকে ছিল বহু হাজার বছর ধরে, তার ভেতর উৎপাদনী শক্তির বিকাশ অতি ধীরে ধীরে হলেও এগিয়ে চলছিল অবিচলে। সেই অনুসারে বদলাতে থাকে আদিম সমাজের গোটা জীবনধারাও। দেখা দিতে থাকল স্তরভেদ। একদল ধনী হয়ে উঠতে থাকল, হস্তগত করল জমি, পশুপাল, উৎপাদনের উপায় নিজেদের মালিকানায়, অন্যদল, সম্পত্তিহীনেরা বাধ্য হল ধনীদের জন্য খাটতে, পরিণত হল দাসে। দেখা দিল জমি, ভূগর্ভ, বন, জলসম্পদ, শ্রমের হাতিয়ারের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা। ফরাসি দার্শনিক, লেখক, জ্ঞানপ্রচারক জাঁ-জাক রুসো (১৭১২—১৭৭৮) ক্ষিপ্ত হয়ে সেই লোককে অভিশাপ

---

* দ্রঃ লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪৩, পৃঃ ১৩০।

দিয়েছেন যে প্রথম একটা ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করে বলেছে: 'এটা আমার।' রুসোর উক্তিটা অবশ্যই সরলতাপ্রণোদিত। তিনি ভেবেছিলেন যে মানুষের দুর্বুদ্ধি থেকেই দেখা দিয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর তৎসংশ্লিষ্ট দুঃখ-দুর্দশা। কিন্তু এ কথাগুলোয় সত্যের বীজও নিহিত। ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে শ্রেণী। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে প্রভু আর দাস, নিপীড়ক আর নিপীড়িত শ্রেণীতে, অর্থাৎ দুটি শত্রুদলে।

প্রতিটি বৈরগর্ভ সমাজের বৈশিষ্ট্য হল নিজেদের মধ্যে সংগ্রামরত দুটি প্রধান বিপরীত শ্রেণী। দাসমালিক ব্যবস্থায় ছিল দাস আর দাসপ্রভু; সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল দুটি প্রধান শ্রেণী: সামন্ত আর অধীনস্থ কৃষক; পুঁজিতন্ত্রের যুগে আবির্ভূত হল পুঁজিপতি আর শ্রমিক। শত্রুশ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাবার পর থেকে সমাজতন্ত্রের বিজয় অবধি মানবজাতির গোটা ইতিহাস হল নিপীড়িত আর নিপীড়কদের মধ্যে নির্মম সংগ্রামের ইতিহাস। নিপীড়িত শ্রেণী লড়ে তাদের মুক্তির জন্য। নিপীড়করা তাদের সম্পদ আর ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হতে অনিচ্ছুক। নিপীড়িতদের আরো দাসত্বে বাঁধার জন্য তারা চেষ্টিত, নিজেদের প্রভুত্ব আরো দৃঢ় করার জন্য তারা লড়ে। মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন, 'স্বাধীন আর দাস, প্যাট্রিসিয়ান আর প্লিবিয়ান, ভূস্বামী আর ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা আর মিস্ত্রি, সংক্ষেপে নিপীড়ক আর নিপীড়িতরা সর্বদাই ছিল পরস্পর চিরন্তন বৈরিতায়, কখনো প্রচ্ছন্ন

কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়েছে অবিরাম, যা সর্বদাই শেষ হয়েছে গোটা সামাজিক সৌধটার বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে অথবা সংগ্রামী শ্রেনীগুলির সাধারণ ধ্বংসে।'*

শোষণ ব্যবস্থায় শ্রেনীদের মধ্যে সংগ্রাম হল সমাজ বিকাশের নিয়ম, সামাজিক অগ্রগতির পরাক্রান্ত চালিকা শক্তি। শোষিত শ্রেণীদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম পুরনো, অচল হয়ে পড়া ব্যবস্থা সাফ করে নতুন বর্ধমান ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে। দাসপ্রথার যুগে খিঃ পূঃ ১ম শতকে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসদের অভ্যুত্থান, ১৬শ শতকে জার্মানিতে মহান কৃষক সমর, ১৪-১৫শ শতকে ফ্রান্সে জাকেরি কৃষক বিদ্রোহ, রাশিয়ায় ১৮শ শতকে পুগাচভের নেতৃত্বে কৃষক যুদ্ধ (সামন্ততন্ত্রের যুগে), উনিশ শতকে ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লব যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব যা সমাজতন্ত্রের যুগ সূচিত করেছে — এগুলি হল এই ধরনের এক-একটা ঘটনা।

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র কী জিনিস, কখন তার উদ্ভব? রাষ্ট্রের উদ্ভব আর অস্তিত্ব শ্রেণীর অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আদিম-কৌম সমাজে শ্রেণী ছিল না, রাষ্ট্রও ছিল না। কিন্তু

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪২৪।

যখন দেখা দিল ব্যক্তিগত মালিকানা, সমাজ বিভক্ত হল পরস্পর শত্রু শ্রেণীতে, তখন গড়ে উঠল রাষ্ট্র।

বৈরগর্ভ সমস্ত সমাজেই রাষ্ট্র হল এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব রক্ষার যন্ত্র, এর সাহায্যে শোষকেরা মেহনতিদের অধীনস্থ করে রাখে। এটাই হল শোষক রাষ্ট্রের শ্রেণীগত মর্মার্থ। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য শোষকেরা ব্যবহার করে সৈন্যবাহিনী, আদালত, জেলখানা, শাস্তিদানের সংস্থাদি। বলপ্রয়োগের সংস্থা ছাড়াও তারা কাজে লাগায় মেহনতিদের দমনের জন্য সমস্ত ভাবাদর্শীয় মাধ্যম: স্কুল, সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা, যোগাযোগের অন্য সমস্ত উপায়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে শোষক রাষ্ট্রের স্থান নেয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সেটা দেখা দেয় উৎখাত শোষকদের ওপর শ্রমিক শ্রেণীর, অল্পাংশের ওপর অত্যধিকাংশের প্রভুত্বের রাজনৈতিক সংগঠন হিশেবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল জবরদস্তি থেকে মুক্ত একটা ব্যবস্থা গঠন, যাতে থাকবে মেহনতিদের সমাজতান্ত্রিক সমতা।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি আর রূপ কী কী? কোন শ্রেণীর তা সেবা করছে, তাই দিয়ে নির্দিষ্ট হয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি। যদি তা দাসমালিকদের সেবায় থাকে, তাহলে সেটা দাসমালিক রাষ্ট্র। যদি তাতে থাকে সামন্তদের প্রাধান্য, তাহলে সেটা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পুঁজিপতিদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এই তিন ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল শোষকদের আধিপত্য, তাদের শ্রেণীমর্মই তা প্রকাশ করে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণ, তাকে সুসম্পূর্ণ করে বিশেষ ধরনের এক রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। নতুন সমাজ পুঁজিতন্ত্র থেকে তৎক্ষণাৎ, সরাসরি উদিত হয় না। মার্কস বলেছেন, পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে থাকে 'প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়তে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের একটা পর্ব থাকে। সেই পর্ব অনুসারী একটা রাজনৈতিক উৎক্রমণের পর্বও আর সে পর্বের রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব** ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'* সমাজতন্ত্র নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র পরিণত হয় সর্বজনীন রাষ্ট্রে, শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনায় সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক সংগঠনে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে যেখানে প্রকাশ পায় তার শ্রেণী মর্ম, তার রূপে সেক্ষেত্রে প্রকাশ পায় তার শ্রেণীমর্ম ছাড়াও শাসনের ধরন (রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক), রাজনৈতিক আমল (শাসনের উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, সামরিক-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব), রাষ্ট্রের গঠন (একক, ফেডারেশন)।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ হয় নানাবিধ, কিন্তু তার মর্মার্থ একই — এই সমস্ত রাষ্ট্রই হল পুঁজির প্রভুত্বের সংস্থা। যতরকম সুমধুর ভাষায় তাকে সাজানো হোক না কেন, কোনো রূপের বুর্জোয়া রাষ্ট্রই তার শোষক মর্মার্থ, এক শ্রেণীর ওপর অন্য

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ১৯, পৃঃ ২৭।

শ্রেণীর আধিপত্যের হাতিয়ার হিশেবে তার ভূমিকা বদলায় না। লেনিন বলেছেন, 'বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ অসাধারণ বিচিত্র, কিন্তু তাদের মর্মার্থটা একই: এই সমস্ত রাষ্ট্রই এরকমটা বা ওরকমটা হতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে সবই অবশ্য-অবশ্যই **বুর্জোয়ার একনায়কত্ব।**'* বুর্জোয়া রাষ্ট্র হল শ্রমের ওপর পুঁজির আধিপত্যের হাতিয়ার।

সামাজিক চেতনা ও ভাবাদর্শ

সামাজিক চেতনার ভূমিকা

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনে সামাজিক চেতনা বলতে বোঝায় সমাজে বিদ্যমান ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, আবেগ, অভ্যাস, ঐতিহ্যের সমষ্টি যাতে প্রতিফলিত হয় লোকজীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতি।

অন্য কথায়, সামাজিক চেতনায় প্রতিফলিত হয় সামাজিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সেই বৈষয়িক সম্পর্কপাত যার কাঠামোর অভ্যন্তরে লোকেদের জীবন বহমান। 'সামাজিক অস্তিত্বতে' যেখানে বোঝায় লোকেদের বৈষয়িক জীবন, বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৩৫।

পরিস্থিতি, 'সামাজিক চেতনা' কথাটা সেক্ষেত্রে তাদের আত্মিক, মানসিক জীবন নিয়ে।

সামাজিক অস্তিত্ব দিয়েই নির্ধারিত হয় সামাজিক চেতনার বিষয়বস্তু, তার শ্রেণীগত মর্মার্থ। সেই সঙ্গে সামাজিক চেতনা নিষ্ক্রিয় নয়, যে সামাজিক অস্তিত্ব থেকে তা উদ্ভূত তার ওপর পাল্টা প্রভাবও ফেলে।

এই প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে সামাজিক চেতনার চরিত্র, অর্থাৎ যেসব ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তা গঠিত তার চরিত্রের ওপর। ধ্যানধারণা, নানা সামাজিক তত্ত্ব আর মতামত তাদের বিষয়বস্তুর দিক থেকে পড়ে দুই ভাগে — পুরনো, প্রতিক্রিয়াশীল আর নতুন, প্রগতিশীল। পুরনো ধ্যানধারণা আর তত্ত্বে প্রতিফলিত আর প্রকাশিত হয় কাল-ফুরিয়ে-আসা শ্রেণীদের স্বার্থ, সেই কারণে সামাজিক জীবনে, সমাজের বিকাশে তাদের প্রভাব নেতিবাচক। সমাজের বিকাশকে তা আটকে রাখতে চায়। নতুন প্রগতিশীল ধ্যানধারণা ও তত্ত্বে প্রতিফলিত হয় প্রগতিশীল শ্রেণী, সামাজিক স্তরের স্বার্থ, তার ফলে সেগুলি সহায়তা করে সমাজের অগ্রগতিতে।

ব্যক্তিগত আর সামাজিক চেতনার মধ্যে তফাৎ থাকে। ব্যক্তিগত চেতনা হল এক-একজন লোকের অন্তর্জগৎ, সেটা কোনো একজন লোকের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, হৃদয়াবেগ, অভ্যাস, প্রবণতা নিয়ে। তা গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট লোকটির জীবন-প্রক্রিয়া, তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ থেকে, প্রকাশ করে তার অস্তিত্বের বৈষয়িক পরিস্থিতি। ব্যক্তিগত চেতনা হল মূর্ত-নির্দিষ্ট

লোকটির ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, জীবনযাত্রার অবস্থার প্রকাশ।

সামাজিক চেতনা হল কেবল সেইসব ধ্যানধারণা, মতামত, অনুভূতি, প্রবণতা নিয়ে, যাতে প্রকাশ পায় লোকেদের সাধারণ স্বার্থ। শ্রেণীগত সমাজে এই সাধারণ স্বার্থটা হল শ্রেণীর, কোনো একটা সামাজিক গ্রুপ, যৌথ ইত্যাদির স্বার্থ।

এই দুই ধরনের চেতনা বিদ্যমান থাকে পারস্পরিক সম্পর্কে, দ্বান্দ্বিক ঐক্যে। সামাজিক চেতনা প্রকাশ পায় কেবল ব্যক্তিগত চেতনার মধ্য দিয়ে, কেননা প্রতিটি ব্যক্তিই থাকে এবং খাটে সমাজের মধ্যে, কোনো একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী, জাতি, সামাজিক যৌথের সে অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক মনোবৃত্তি ও ভাবাদর্শ

সামাজিক চেতনা আবার দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও দুটি মাত্রায় বিভক্ত: সামাজিক মনোবৃত্তি আর ভাবাদর্শ।

দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় কোনো একটা শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ, জাতির মধ্যে যেসব অনুভূতি, প্রবণতা, ধারণা, অভ্যাস, চিন্তা, মনোভাব দেখা দেয়, তার সমষ্টি হল সামাজিক মনোবৃত্তি। ভাবাদর্শ হল নির্দিষ্ট শ্রেণীটির পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক, ব্যবহারশাস্ত্রীয়, নৈতিক, দার্শনিক,

নান্দনিক, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির, মতামতের একটা তন্ত্র, ব্যবস্থা।

সামাজিক মনোবৃত্তি হল নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়। তা থেকে ভাবাদর্শের তফাৎ হল এই যে সেটা হল সামাজিক চেতনার আরো উঁচু একটা স্তর, নিজেদের জীবনের বৈষয়িক অস্তিত্ব সম্পর্কে লোকেদের আরো গভীর একটা চৈতন্য। তার কাজ হল শ্রেণী, জাতি, সামাজিক গ্রুপগুলির মধ্যে সম্পর্কের মর্মার্থ উদ্ঘাটিত করা, কোনো একটা শ্রেণীর অবস্থান থেকে সেইসব সম্পর্কের অস্তিত্বের বা পরিবর্তনের আবশ্যিকতা প্রতিপাদন করা। মনোবৃত্তি রূপ নেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ভাবাদর্শ সংরচন করে বিশেষ একদল লোক — ভাবাদর্শীরা।

শ্রেণীসমাজে মনোবৃত্তি ও ভাবাদর্শ শ্রেণীমূলক। প্রতিটি শ্রেণীরই থাকে নিজস্ব মনোবৃত্তি আর ভাবাদর্শ, যাতে প্রতিফলিত হয় সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তার স্থান, প্রকাশ পায় তার প্রয়োজন আর স্বার্থ। লেনিন লিখেছেন, 'যেকোনো নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক বুলি, বিবৃতি, প্রতিশ্রুতির মধ্যে লোকে যতদিন কোনো একটা শ্রেণীর স্বার্থ উদ্ঘাটিত করতে না পারছে, ততদিন তারা রাজনীতিতে থেকেছে এবং থেকে যাবে প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ শিকার।'*

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৪৭।

শ্রমিক শ্রেণীর আয়ত্তে আছে বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ। এ ভাবাদর্শ যেমন তার শ্রেণীগত অন্তর্বস্তু, তেমনি যে লক্ষ্য ও কর্তব্য তা গ্রহণ করে সেদিক থেকে তা পূর্ববর্তী সমস্ত ভাবাদর্শ হতে আমূল পৃথক। এ পার্থক্য হল এইখানে যে প্রথমত তা শোষক শ্রেণীদের নয়, শ্রমিক শ্রেণীর, সমস্ত মেহনতির স্বার্থের সেবক। দ্বিতীয়ত, তা হল শোষণের উচ্ছেদ এবং নতুন সমাজ গঠন যে অনিবার্য তার তাত্ত্বিক প্রতিপাদন। তৃতীয়ত, সঙ্গতি সহকারে ব্যাপক জনসাধারণের প্রয়াস আর আশাআকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তা হল বিশ্বের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের ন্যায়, মুক্তি আর সমতা, লোকেদের মধ্যে ও জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠার এক পরাক্রান্ত অস্ত্র।

ইতিহাসে জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকা

বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা নেয় মেহনতি জনসাধারণ, জনগণ। তারাই গড়ে শ্রমের হাতিয়ার, তাকে উন্নত করে, নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান তুলে দেয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাতে। সারা জগৎকে খাওয়ায়, পরায় মেহনতিরা, জীবনের সমস্ত সম্পদ তারা বানায়।

তবে মেহনতি জনসাধারণ কেবল লোকেদের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে তাই নয়। তারাই হল ইতিহাসের স্রষ্টাও, সামনে অগ্রগতির নির্ধারক শক্তি। দাসপ্রথা আর সামন্ততন্ত্র

অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে আপনা থেকেই নয়, উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে মেহনতিদের একরোখা বৈপ্লবিক সংগ্রামের ফলে। রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র সমাধিস্থ হয় যে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে, তাতে সবিশেষ শক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে জনসাধারণের সৃজনী ভূমিকা। কমিউনিস্টদের মন্ত্রসঙ্গীত 'আন্তর্জাতিক'এ ধ্বনিত হয়েছে বৈপ্লবিক আন্দোলনে জনসাধারণের ভূমিকা:

মোদের মুক্তি কেউ দেবে নাকো আজ,
কোনো দেব, কোনো রাজা, কোনো মহানেতা,
মোদের মুক্তি সেটা আমাদের কাজ,
আমাদের দুই হাতে হবে সেটা জেতা।

জনগণ কেবল বৈষয়িক মূল্যের স্রষ্টা এক শক্তি নয়, আত্মিক মূল্যবোধেরও তা একমাত্র উৎস। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সর্বাগ্রে জনগণের নিকট ঋণী।

কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাটা কেমন? অধিকাংশের ওপর অকিঞ্চিৎকর অল্পাংশের পীড়নের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা লোকেদের চেতনায় 'নায়ক ও জনতার' প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব সঞ্চারে চেষ্টিত। তত্ত্বটা এই কথা বলে যে, দেখ বাপু, ইতিহাসের একমাত্র স্রষ্টা হল মহাপুরুষেরা — রাজা, সেনাপতি, আইনদাতা প্রভৃতিরা। তারাই নাকি নিজেদের সংকল্প অনুসারে যেদিকে চায় সেদিকে ইতিহাসের গতি ফেরাতে সক্ষম। মেহনতি জনসাধারণকে দেখানো হয় যেন তারা একটা নিষ্ক্রিয় জনতা, ঐতিহাসিক সৃজনে অক্ষম।

মানব সমাজ নাকি তার সবকিছুর জন্য মুষ্টিমেয়

নির্বাচিতদের, বরপুত্রদের কাছে ঋণী, এই অতিকথাকে নস্যাৎ করেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। তবে তার মানে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অস্বীকার করে তা নয়। নিজেদের রাজনৈতিক নেতাদের, তাদের সংগঠিত ও পরিচালিত করতে সক্ষম এইসব অগ্রণী প্রতিনিধিদের সামনে এগিয়ে না দিয়ে সমাজের ইতিহাসে কোনো শ্রেণী কখনো আধিপত্য লাভ করতে পারে নি। আর প্রগতিশীল কর্মকর্তারা যেখানে জনগণের পরিপক্ক প্রয়োজন বুঝে সমাজের সম্মুখস্থ কর্তব্যের সর্বাধিক সঠিক সমাধান খুঁজে পায় এবং তাতে করে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ত্বরান্বিত করে, প্রতিক্রিয়াশীলেরা সেক্ষেত্রে সামাজিক বিকাশের গতিকে মন্থর, ব্যাহত করতে চেষ্টিত।

প্রমুখ কর্মকর্তারা এগিয়ে আসেন জনগণের, শ্রেণীর পরিচালক হিশেবে। শক্তির উৎস তাঁরা পান শ্রেণীর, সামাজিক গ্রুপের সমর্থন থেকে। এই কর্মকর্তারা যতই মেধাবী আর প্রতিভাধর হোন না কেন, এই রূপ সমর্থন বিনা তাঁরা অসহায়, ইতিহাসের গতিতে খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবপাতে অক্ষম। পরিচালকেরা শক্তিমান তাঁদের পরিচালিত জনপুঞ্জের ক্রিয়াকলাপে। সেইখানেই তাঁদের শক্তি।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের তাৎপর্য

দর্শনে সত্যকার একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তা প্রণয়ন করেছে

নতুন ধরনের বিশ্ববীক্ষা, প্রলেতারিয়েতের বিশ্ববীক্ষা — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনই হল একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা দেখিয়েছে যে বিশ্ব প্রকৃতিগতভাবেই বস্তুময়। তার মধ্যে সবকিছুই বদলাচ্ছে, পরিবিকশিত হচ্ছে, এগুচ্ছে নিম্ন থেকে উচ্চে, পুরনো থেকে নতুনে। অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের কৃতিত্বের সাধারণীকরণ মারফৎ তা সেগুলিকে সশস্ত্র করে প্রজ্ঞানের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি দিয়ে, বিচার্য ঘটনাটির প্রতি সঠিক অভিগমন নির্দিষ্ট করে।

বিশ্বের একটা সঠিক চিত্র দেওয়ায়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিকাশের সর্বাধিক সাধারণ নিয়মগুলি নির্দিষ্ট করায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন হল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের পরাক্রান্ত হাতিয়ার, কোটি কোটি মেহনতিজনের বিশ্ববীক্ষা, যারা লড়ছে সর্ববিধ পীড়ন আর অসাম্যের বিরুদ্ধে, গড়ছে নতুন, ন্যায়পরায়ণ সমাজ। তা হল মার্কসবাদী পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশলের তাত্ত্বিক ভিত্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অর্থনৈতিক মূলনীতি

রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র কী নিয়ে চর্চা করে

রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের বিষয়

দর্শন আর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা মূলাঙ্গ, তার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

বিজ্ঞান হিশেবে রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞান তা হয়ে ওঠে কেবল তখন থেকে যখন শ্রেণী-সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল শ্রমিক শ্রেণী, যখন গড়ে উঠল প্রলেতারীয় অর্থশাস্ত্র যার স্রষ্টা মার্কস ও এঙ্গেলস। লেনিনের রচনায় মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র উঠে যায় একটা নতুন উচ্চতর স্তরে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এগোয় এই কথা থেকে যে সমাজজীবনের মূলাধার হল বৈষয়িক উৎপাদন। মার্কস লিখেছেন, ‘প্রত্যেকটি শিশুই

জানে এক বছর কেন, অন্তত কয়েক সপ্তাহ কাজ বন্ধ করে রাখলেই প্রতিটি জাতি ধ্বংস পেত।'* তাই শ্রম হল মানবসমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের মৌল শর্ত, তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধির উৎস।

আগের অধ্যায়ে আমরা যা লিখেছি, বৈষয়িক সম্পদ একা-একা বানানো হয় না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় লোকেরা অনিবার্যই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে আসে। তাদের শ্রম সামাজিক চরিত্রের।

রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন* করে জীবনধারণের সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় আর পরিভোগ প্রক্রিয়ায় দানা বেঁধে-ওঠা লোকেদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক।

উৎপাদনী সম্পর্কের ভিত্তি হল উৎপাদনী উপায়ের ওপর মালিকানা। মালিকানা সম্পর্ক তার টাইপ বা প্রকৃতি অনুসারে হয় বিভিন্ন রকমের। সমাজ যদি সমগ্রভাবে উৎপাদনের উপায়, বস্তু, শ্রমের ফলকে নিজস্ব বলে ধরে, তাহলে সেটা হল সামাজিক মালিকানা। যদি তার মালিক হয় সমাজের একাংশ, অথবা কোনো কোনো ব্যক্তি, তাহলে সেটা ব্যক্তিগত মালিকানা। রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র উৎপাদনী সম্পর্ককে তার বিকাশের প্রক্রিয়ায় অনুধাবন করে এই প্রতিপাদনে আসে যে সামাজিক মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিজয় অনিবার্য, তার ঐতিহাসিক নিয়মবদ্ধতা রয়েছে।

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪৬০।

উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় আর পরিভোগ নির্দিষ্ট কতকগুলি অর্থনৈতিক নিয়মের অধীন। এইসব নিয়মের আবিষ্কার, জাতীয় অর্থনীতিতে লোকেদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে তার প্রয়োগই হল রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের কাজ। অর্থনৈতিক নিয়ম বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাদির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যিক, পাকাপোক্ত সম্পর্কাদি।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মতো অর্থনৈতিক নিয়মাদির চরিত্রও অবজেকটিভ, যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক তাতে প্রকাশ পায় সেটা লোকেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা চেতনার ওপর নির্ভর করে না। অর্থনৈতিক নিয়ম দেখা দেয় মানবিক সমাজ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, লোকেদের উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়ায়। প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে এইটিই তার প্রধান পার্থক্য, মানবিক সমাজের রূপলাভ আর বিকাশের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের কোনো সম্পর্ক নেই।

সাধারণতার মাত্রা অনুসারে অর্থনৈতিক নিয়ম নিম্নোক্ত গ্রুপে বিভক্ত। সর্বাগ্রে এগুলি হল সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়ম যা সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। যেমন, উৎপাদনী শক্তির চরিত্র ও মানের সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের উপযোজ্যতার নিয়ম, যাতে বোঝায় যে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো উৎপাদনী সম্পর্ককে তার উপযোগী

হতে হবে, নতুন, বেশি প্রগতিশীল উৎপাদনী সম্পর্ককে আসতে হবে তার জায়গায়।

দ্বিতীয় গ্রুপে পড়ে তেমন অর্থনৈতিক নিয়ম যা সমস্ত সমাজব্যবস্থায় নয়, কেবল তার কয়েকটি ক্ষেত্রে বলবৎ। যেমন, মূল্যের নিয়ম কাজ করে কেবল যেখানে পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক বিদ্যমান।

তবে অধিকাংশ অর্থনৈতিক নিয়মই — বিশিষ্ট নিয়ম যা উৎপাদনের নির্দিষ্ট একটা ধরনের প্রকৃতিগত, সেটা ধ্বংস পেলে সে নিয়মও আর বলবৎ থাকে না (যেমন, বাড়তি মূল্যের নিয়ম, যা পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে সক্রিয়)।

সংক্ষেপে রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র হল উৎপাদনী সম্পর্কের বিকাশ বিষয়ক বিদ্যা, তা এইসব সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মগুলি নিয়ে চর্চা করে, অর্থাৎ মানবিক সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগ চলে যে নিয়মে তার বিদ্যা।

মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ

বাড়তি মূল্যের তত্ত্ব

মার্কসবাদের প্রধান রাষ্ট্রিক-অর্থশাস্ত্রীয় রচনা ‘পুঁজি’ গ্রন্থে আবিষ্কৃত হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশের

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাদি, উদ্ঘাটিত করা হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধ।

মার্কসবাদী রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের মহত্তম কৃতিত্ব হল বাড়তি মূল্যের মতবাদ, যা গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে 'পুঁজি' গ্রন্থে। বাড়তি মূল্যের তত্ত্বকে লেনিন বলেছেন মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তিপ্রস্তর।

এ তত্ত্বে উদ্ঘাটিত হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের রহস্য, পুঁজিপতিদের ধনবৃদ্ধির উৎস ঢাকা ছিল যে আবরণে, সেটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। মার্কস নিজেই তাঁর একটি পত্রে লিখেছিলেন যে তাঁর বইয়ের সবচেয়ে সেরা জিনিস হল তার বিশেষ রূপ — লাভ, সুদ, ভূমি-খাজনা ইত্যাদি নির্বিশেষে বাড়তি মূল্য জিনিসটা নিয়েই গবেষণা।* এঙ্গেলসের মতে, বাড়তি মূল্যরূপ প্রশ্নটির সমাধানই হল মার্কসের রচনায় মহত্তম ঐতিহাসিক কীর্তি।**

বাড়তি মূল্য এবং সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিশ্লেষণ মার্কস শুরু করেন পণ্য থেকে। পুঁজিতন্ত্রে সবই হয়ে দাঁড়ায় পণ্য, মানুষের শ্রমশক্তিও, সেটাও অবাধে কেনা বেচা হয়।

শ্রমশক্তি হল মানুষের সেইসব দৈহিক ও আত্মিক সামর্থ্য, বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের সময় যা সে কাজে লাগায়। যেকোনো সমাজেই শ্রমশক্তি হল উৎপাদনের

---

* দ্রঃ মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩১, পৃঃ ২৭৭।

** দ্রঃ মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২০, পৃঃ ২১০।

অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু সেটা পণ্যে পরিণত হয় কেবল পংজিতন্ত্রেই। পংজিতন্ত্রে তার দংটি শর্ত বিদ্যমান — শ্রমশক্তির ধারকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর সেই সঙ্গে উৎপাদনের উপায়, সেইহেতু প্রাণধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত থাকা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাসপ্রথার আমলে দাস তার শ্রমশক্তি বেচতে পারত না, কেননা সে নিজেই ছিল অন্যের সম্পত্তি। সামন্ততন্ত্রেও কৃষকেরা নিজেদের শ্রমশক্তির মালিক ছিল না, তারা ছিল সামন্তের কাছে ব্যক্তিগত অধীনতায় আবদ্ধ। পংজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রমিকেরা সেরূপ অধীনতা থেকে মংক্ত হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ করে। মার্কস মন্তব্য করেছেন যে ‘অর্থপতি কেবল সেইক্ষেত্রেই নিজের অর্থকে পংজিতে পরিণত করতে পারে যখন সে পণ্যের বাজারে পায় স্বাধীন শ্রমিক, স্বাধীন যে দংই অর্থেই — এক অর্থে সে শ্রমিক — স্বাধীন ব্যক্তি, পণ্য হিশেবে তার শ্রমশক্তির মালিক, আর অন্য দিক থেকে, বেচার মতো তার অন্য কোনো বস্তু নেই, একেবারে দিগম্বর, নিজের শ্রমশক্তি কাজে লাগাবার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসই তার নেই।’*

পংজিতন্ত্রে শোষণ চলে চোখের আড়ালে, দাসপ্রথা আর সামন্ততন্ত্রের তুলনায় তা বাহ্যত অনেক অলক্ষ্য। এখানে তা দেখা দেয় অর্থনৈতিক আবশ্যিকতা হিশেবে।

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ১৭৯।

খোদ জীবনই শ্রমিকের সামনে বিকল্প রাখে: হয় অনশন মৃত্যু নয় কারখানা-মালিকের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয়। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের পরিস্থিতিতে প্রধান তাড়না বেত্রদণ্ড নয় — বুভুক্ষা।

পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের যন্ত্রক্রিয়া মার্কস উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পণ্য হিশেবে শ্রমশক্তির আছে একটা অনন্যসাধারণ গুণ — তার নিজের যা মূল্য, তার চেয়ে বেশি মূল্য তা উৎপন্ন করতে সক্ষম। পরিপূরক বা বাড়তি মূল্য উৎপাদনের জন্যই পুঁজিপতিরা শ্রমিক ভাড়া করে, মজুরিতে নিয়োগ করে। বাড়তি মূল্যের উৎস হল শ্রমিকের শ্রম, শ্রমশক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি সে শ্রমের একাংশ আত্মসাৎ করে বিনামূল্যে।

তাই **শ্রমশক্তির যা মূল্য তার বাড়তি যে মূল্যটা উৎপন্ন হয় মজুরি-খাটা শ্রমিকের শ্রমে, পুঁজিপতি যা আত্মসাৎ করে বিনা ক্ষতিপূরণে, সেটা হল বাড়তি মূল্য।**

সর্বোচ্চ পরিমাণ বাড়তি মূল্য উৎপাদন আর মজুরি-খাটা শ্রমিককে শোষণ মারফৎ পুঁজিপতি কর্তৃক সে মূল্যের আত্মসাৎ হল **পুঁজিতন্ত্রের বনিয়াদি অর্থনৈতিক নিয়ম।**

বাড়তি মূল্য উৎপন্ন আর আত্মসাৎ করার যন্ত্রক্রিয়া হল এই যে শ্রমসময় আবশ্যক আর অতিরিক্ত এই দুই অংশে বিভক্ত। শ্রমসময়ের এক অংশে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির সমপরিমাণ মূল্য উৎপাদন করে। শ্রমসময়ের এই সময়টা শ্রমিক আর তার পরিবারের ভরণপোষণের মতো সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। এই অংশটা

হল আবশ্যক শ্রমসময় এবং তার মধ্যে ব্যয়িত শ্রম হল আবশ্যক শ্রম। শ্রমসময়ের অন্য অংশে মজুরি-খাটা শ্রমিক বাড়তি মূল্য উৎপাদন করে। শ্রমসময়ের এই অংশটা হল বাড়তি শ্রমসময়, আর পরিশ্রমটা বাড়তি শ্রম।

লেনিনের কথায়, 'জমি, কলকারখানা, শ্রমের হাতিয়ারের যে মালিক, তার কাছে মজুরি-খাটা শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। শ্রমদিনের একটা অংশ শ্রমিক কাজে লাগায় নিজের এবং নিজ পরিবারের ভরণপোষণ মেটাবার জন্য (বেতন), আর অন্য অংশটায় শ্রমিক খাটে বিনামূল্যে, সৃষ্টি করে পুঁজিপতির জন্য **বাড়তি মূল্য,** পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা, তাদের ঐশ্বর্যের উৎস।'*

পুঁজির মর্মার্থ

পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের যন্ত্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো প্রগাঢ় ধারণা পেতে হলে প্রয়োজন পুঁজি বলতে কী বোঝায়, সেটা বোঝা। পুঁজি কী জিনিস? এটা কেবল উৎপাদনের যেকোনো একটা উপায় (শ্রমের হাতিয়ার ও বস্তু) বোঝায় না। উৎপাদনের উপায় পুঁজি হয়ে দাঁড়ায় কেবল তখন, যখন তা থাকে ব্যক্তিগত মালিকের হাতে এবং ব্যবহৃত হয় শ্রমিক শোষণের জন্য। তাই পুঁজিতে

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৪৫।

প্রকাশ পায় নির্দিষ্ট একটা উৎপাদনী সম্পর্ক, উৎপাদনী উপায়ের মালিক পুঁজিপতি, আর উৎপাদনী উপায় থেকে বঞ্চিত যে শ্রমিক নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে, বাড়তি মূল্য উৎপাদন করতে বাধ্য তাদের মধ্যে সম্পর্ক। **পুঁজি হল সেই মূল্য যা মজুরি-খাটা শ্রমিককে শোষণ করে বাড়তি মূল্য এনে দেয়।**

পুঁজির দুটো ভাগ — স্থায়ী আর পরিবর্তনীয়। পুঁজির যে অংশটা উৎপাদনের উপায়ে ঢালা হয়েছে, উৎপাদিত পণ্যে যার প্রাথমিক মূল্যটা ক্রমশ বা এক দফাতেই বিনা পরিবর্তনে পুরোপুরি এসে বর্তায়, সেটাকে বলা হয় **স্থায়ী পুঁজি**। যে পুঁজিটা ব্যয় হয় শ্রমশক্তি ক্রয়ে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য পুঁজিপতি যে মূল্য দেয়, মজুরি-খাটা শ্রমিক তার পরিশ্রম দিয়ে তার চেয়ে বেশি মূল্য উৎপাদন করে। পুঁজির এই অংশটার নাম দেওয়া হয়েছে **পরিবর্তনীয় পুঁজি**।

স্থায়ী আর পরিবর্তনীয়তে পুঁজির বিভাগ থেকে প্রকাশ পায় যে বাড়তি মূল্যের উৎস গোটা পুঁজিটা নয়, কেবল তার পরিবর্তনীয় অংশ। আর তাতে আবার বোঝায় যে পুঁজিপতির ধনবৃদ্ধি সম্ভব কেবল নিযুক্ত শ্রমিক শোষণ করে।

বাড়তি মূল্যের হার ও পরিমাণ

শ্রমিক শোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় কিভাবে?

সেজন্য ব্যবহার করা যায় দুটি সূচক: বাড়তি মূল্যের হার ও পরিমাণ।

বাড়তি মূল্যের হার হল তার উৎস রূপ পরিবর্তনীয় পুঁজির সঙ্গে বাড়তি মূল্যের সম্পর্ক। ধরা যাক শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য আর তদ্দ্বারা উৎপাদিত দৈনিক বাড়তি মূল্য দুই-ই ১০ ডলার। এক্ষেত্রে বাড়তি মূল্যের হার হল ১০০ শতাংশ।

বাড়তি মূল্যের হার প্রকাশ করা যায় শ্রমদিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে (বাড়তি সময় আর আবশ্যক সময়) অথবা ব্যয়িত শ্রমের তাৎপর্যের দিক থেকে বিভিন্ন অংশ দিয়ে (বাড়তি শ্রম আর আবশ্যক শ্রম)। ধরা যাক ৮ ঘণ্টা শ্রমদিন বিভক্ত ৪ ঘণ্টা আবশ্যক শ্রমসময় আর ৪ ঘণ্টা বাড়তি সময়ে। এক্ষেত্রেও বাড়তি মূল্যের হার একশ শতাংশ।

বাড়তি মূল্যের হার থেকে দেখা যায় শ্রমিক তার আবশ্যক শ্রমের প্রতি একক পিছু পুঁজিপতিকে বিনামূল্যে অবৈতনিক শ্রম দিচ্ছে কতটা। তাই বাড়তি মূল্যের হারকেই বলা হয় শোষণের হার। মার্কস বলেছেন, '...বাড়তি মূল্যের হার হল পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের যে মাত্রা তার যথাযথ অভিব্যক্তি।'*

পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি মূল্যের হার বাড়তে থাকে। যেমন, বিশ শতকের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসেসিং শিল্পে এ হার ছিল ১৩০%,

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ২২৯।

আর বর্তমানে ২০০ থেকে ৩০০%, প্রায়ই তারও বেশি।

বাড়তি মূল্যের হারে শ্রমিক শোষণের মাত্রা বোঝালেও শোষণের পরম বা অনপেক্ষ পরিমাণ তা থেকে বোঝা যায় না। সেটা স্থির হয় বাড়তি মূল্যের পরিমাণ দিয়ে, যেটা নির্ভর করে শোষিত শ্রমিকের সংখ্যা আর শোষণের মাত্রার ওপর। বাড়তি মূল্যের হার আর পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যত বেশি হবে, বাড়তি মূল্যের পরিমাণ হবে তত বেশি, পুঁজিপতির পরজীবিতামূলক আয়ও তত বেশি।

পরম ও আপেক্ষিক বাড়তি মূল্য

কী উপায়ে বাড়তি মূল্যের পরিমাণ আর শ্রমিকদের শোষণ বাড়ানো হয়? শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা বাড়াবার জন্য পুঁজিপতিরা দুটি মূলগত পদ্ধতি অবলম্বন করে।

প্রথম পদ্ধতিটা হল শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য সরাসরি বাড়ানো। আবশ্যক শ্রমসময় একই থাকলে শ্রমদিন যদি বাড়ানো হয়, তাহলে বাড়তি শ্রমসময় বাড়বে, ফলে বাড়বে শোষণের মাত্রা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিপতি যদি শ্রমদিনকে ৮ ঘণ্টা থেকে ১০ ঘণ্টা করে, তাহলে আবশ্যক শ্রমসময় ৪ ঘণ্টায় থেকে গেলে বাড়তি শ্রমসময় দাঁড়াবে ৬ ঘণ্টা। বাড়তি মূল্যের হার বেড়ে যাবে দেড়গুণ, সেই অনুসারে তার মোট পরিমাণও বাড়বে।

আবশ্যক শ্রমসময়ের ওপরে শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যে বাড়তি মূল্য পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় **পরম বাড়তি মূল্য।** সম্ভব হলে পুঁজিপতিরা শ্রমিককে দিনে ২৪ ঘণ্টাই খাটতে বাধ্য করত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কেননা দিনের একটা অংশ লোকের দরকার ঘুমনো, খাওয়া, বিশ্রামের জন্য। তা দিয়ে নির্ধারিত হয় শ্রমদিনের দৈহিক সীমা। তাছাড়া সামাজিক সীমাও আছে। নিজেদের আত্মিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যও শ্রমিকের সময় দরকার। শ্রমদিন হ্রাসের জন্য সংগ্রাম হল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ।

শ্রমের প্রখরীকরণ (intensification) মারফতও পুঁজিপতিরা শোষণের মাত্রা বাড়ায়। শ্রমের প্রখরতা বৃদ্ধির অর্থ একই সময়ের মধ্যে শ্রমিকেরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বেশি প্রাণশক্তি ব্যয় করছে, উৎপাদন করছে বেশি বাড়তি মূল্য। শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়ালে যা হত, শ্রমের প্রখরতা বাড়ালেও শ্রমিক ততটাই, এমনকি বেশি শ্রমও ব্যয় করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে পুঁজিপতিরা বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছে শ্রমজীবীদের সর্বোচ্চ পরিমাণ শোষণের জন্য।

বাড়তি মূল্য, মেহনতিদের শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির দ্বিতীয় পদ্ধতি হল শ্রমদিন একই রেখে আবশ্যক শ্রমসময় কমানো, ফলে বাড়তি শ্রমসময়টা বাড়ে। ধরা যাক, শ্রমদিন ৮ ঘণ্টা, কিন্তু আবশ্যক শ্রমসময় কমে ৪ ঘণ্টা থেকে দাঁড়াল ৩ ঘণ্টায়। ফলে বাড়তি শ্রমসময় পৌঁছল ৫ ঘণ্টায়। সুতরাং বাড়তি মূল্যের হার ১০০

থেকে দাঁড়াল ১৬৬ শতাংশে। আবশ্যক শ্রমসময় হ্রাস হেতু বর্ধিত বাড়তি শ্রমসময় থেকে পাওয়া বাড়তি মূল্যকে বলা হয় **আপেক্ষিক বাড়তি মূল্য**।

আবশ্যক শ্রমসময় পুঁজিপতি কমাতে পারে কী উপায়ে?

আগে যা বলা হয়েছে, আবশ্যক শ্রমসময় নির্ধারিত হয় শ্রমশক্তির মূল্য দিয়ে। এ মূল্য নির্ভর করে অস্তিত্বের যা উপায় (খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, ঘরভাড়া, ইত্যাদি) তার মূল্যের ওপর। অস্তিত্বের উপায়ের মূল্য যদি হ্রাস পায়, তাহলে শ্রমিক নিজের ভরণপোষণের জন্য খাটছে কম সময় পুঁজিপতির জন্য বেশি। শ্রমিকের অস্তিত্বের উপায়গুলির মূল্য হ্রাস পায় ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের শাখাগুলিতে শ্রমের উৎপাদনীশলতা বৃদ্ধির প্রভাবে। তা থেকে শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাস পায়, সুতরাং কমে যায় আবশ্যক শ্রমসময়, বাড়ে আপেক্ষিক বাড়তি মূল্য।

শ্রমশক্তির মূল্য কমাবার জন্য ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় নারী ও শিশু শ্রম যাদের মজুরি পুরুষদের চেয়ে অনেক কম। জাতি, বর্ণ, ইত্যাদির অজুহাতেও পারিশ্রমিকে বৈষম্য করা হয়।

উচ্চবিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদেশী শ্রমিকদের শোষণ খুবই প্রচলিত। জাতিসঙ্ঘের তথ্যানুসারে ৮০'র দশকের গোড়ায় পশ্চিম ইউরোপে বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটির বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বিদেশী শ্রমিক। বিদেশী মেহনতিরা অতিশোষণের শিকার হয়

এইজন্য যে সাধারণত তারা কম সংগঠিত, তাই উদ্যোগ-মালিকদের পক্ষ থেকে জবরদস্তির প্রতিরোধ করতে পারে না।

সমাজে বাড়তি মূল্য যত বেশি হয়, পুঁজিপতিদের মুনাফাও হয় তত বেশি। মার্কস বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছেন যে শিল্পপতি, বণিক, ভূমিমালিক, ব্যাংকার — শোষকদের সমস্ত গ্রুপই নিজ নিজ ভাগের মুনাফা পায় মেহনতিদের সৃষ্ট মোট বাড়তি মূল্য থেকে। তাদের থাকে সাধারণ শ্রেণী স্বার্থ। শ্রমিক শ্রেণী এবং বুর্জোয়া সমাজের অন্য সমস্ত শোষিত স্তরের বিরুদ্ধে তারা এক ফ্রন্টে লড়ে। তাই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংগ্রাম আপোষহীন।

পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম

পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মর্মার্থের যে বিশ্লেষণ মার্কস করেছেন তা শেষ হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়মের বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদন দিয়ে।

পুঁজি বাড়তি মূল্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, তার জন্মদাতা। কিন্তু সেই সঙ্গে পুঁজিরও উদ্ভব হয় বাড়তি মূল্য থেকে। বাড়তি মূল্য পুঁজিতে পরিণত হওয়ার ফলে পুঁজির সঞ্চয় চলতে থাকে। সেক্ষেত্রে বাড়তি মূল্যের একটা অংশ হয় পুঁজিপতির আয়, অন্য অংশটা সঞ্চয় তহবিল। সঞ্চয়টা আবার ভাগ হয় দুই অংশে—

একটা অংশ পরিণত হয় অতিরিক্ত স্থায়ী পুঁজিতে, অন্যটা অতিরিক্ত পরিবর্তনীয় পুঁজিতে।

বাড়তি মূল্য আত্মসাৎ করার অতৃপ্ত পিপাসা, তার জন্য প্রতিযোগিতার ফল দাঁড়ায় এই যে পুঁজিপতি অবিরাম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে চলে, উন্নত করে টেকনিক অর্থাৎ স্থায়ী পুঁজি বাড়াতে থাকে।

পুঁজির সঞ্চয়, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমশক্তির তুলনায় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম বাড়তে থাকে অনেক বেশি। পরিবর্তনীয় পুঁজির ভাগটা আপেক্ষিক হ্রাস পায়। যেমন, আগে স্থায়ী আর পরিবর্তনীয় পুঁজির মধ্যে অনুপাত ১:১ থাকলে তার মানে সঞ্চয়ের অর্ধেকটা গেছে উৎপাদনের উপায়ে, বাকি অর্ধেকটা শ্রমশক্তি ভাড়া করায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুপাতটা প্রায়ই দাঁড়ায় ৯:১, অর্থাৎ সঞ্চয়ের নয় ভাগ রয়েছে স্থায়ী পুঁজিতে, এক ভাগ পরিবর্তনীয় পুঁজিতে। এর অর্থ শ্রমশক্তির চাহিদা কমছে, বহু শ্রমিক নিজেদের শ্রম নিয়োগ করতে পারছে না। মেহনতিদের একাংশ উৎপাদনের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, গড়ে তুলছে শ্রমের মজুদ বাহিনী, দেখা দিচ্ছে বেকারি।

শিল্পশ্রমের মজুদ বাহিনী হল পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ এটা, তাছাড়া পুঁজিতন্ত্র টিকে থাকতে বা বিকশিত হতে পারত না।

বেকারির ফলে মেহনতিদের শোষণের মাত্রা বাড়ানো সহজ হয়। পুঁজিপতিরা সেটা কাজে লাগায় মজুরি

হ্রাস, শ্রমের প্রখরীকরণ বৃদ্ধির জন্য। আমেরিকান সাহিত্যিক স্টাইনবেকের 'ক্রোধের দ্রাক্ষা' উপন্যাসে ব্যাপারটার এইরকম বর্ণনা আছে: 'যখন একটা কাজ জুটত, তার জন্য লড়ত জনা দশেক লোক। তারা এই কথা ভাবত: যদি ও ৩০ সেণ্টে কাজ করতে চায়, আমি রাজি হব ২৫ সেণ্টে। ও যদি ২৫ সেণ্টে রাজি হয়, আমি হব ২০ সেণ্টে। না আমায় নিন, আমি খিদেয় মরছি, ১৫ সেণ্টেই কাজ করব। শুধু খাওয়া জুটলেই আমি থাকব।'

শিল্পের বেকার বাহিনীর উদ্ভব ও বৃদ্ধি হল জনসংখ্যাঘটিত এমন একটা নিয়ম যা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। নিয়মটাকে এইভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়: মেহনতি জনসাধারণ পুঁজির সঞ্চয় ঘটিয়ে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে এমন উপায় গড়ে তোলে যাতে তারা আপেক্ষিকভাবে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যায় পরিণত হয়।

সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে কোটি কোটি লোক বেকার বাহিনীতে। বর্তমানে শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটির বেশি। বেকার আমেরিকানদের যদি পর পর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সারিটা হবে ১,৫০০ কিলোমিটার লম্বা, অ্যাটলাণ্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত।

বেকারি বৃদ্ধি হল পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়মের মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রকাশ। এ প্রক্রিয়ার দুটি মেরু — একটিতে চলে পুঁজিপতিদের ধনবৃদ্ধি, অন্যটিতে বেকারি বৃদ্ধি আর মেহনতিদের অবস্থার অবনতি। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়মকে

মার্কস এইভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেন: 'সামাজিক সম্পদ, চালু পুঁজি, তার পরিবিকাশের পরিমাণ আর উদ্যম যত বেশি হবে, সুতরাং যত বেশি হবে প্রলেতারিয়েতের অনপেক্ষ পরিমাণ এবং তার শ্রমের উৎপাদনী শক্তি তত বড়ো হবে শিল্পের মজুদ বাহিনী...। কিন্তু কর্মরত শ্রমিক বাহিনীর তুলনায় এই মজুদ বাহিনী যত বড়ো হবে, ততই ব্যাপক হবে স্থায়ী জনবাহুল্য যাদের দারিদ্র্য কর্মরত শ্রমিক বাহিনীর শ্রমযন্ত্রণার সরাসরি সমানুপাতিক। শেষত, শ্রমিক শ্রেণীর দরিদ্র স্তর আর শিল্পের মজুদ বাহিনী হবে যত বড়ো, একেবারে নিঃস্বের সরকারি তালিকা ততই বাড়বে। **এটা হল পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের অনপেক্ষ, সাধারণ নিয়ম।**'*

পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম প্রকাশ পায় মেহনতিদের অবস্থায় আপেক্ষিক ও অনপেক্ষ অবনতিতে। আপেক্ষিক অবনতি প্রকাশ পায় জাতীয় আয়ে (জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র পরিসরে নবসৃষ্ট মূল্য) শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশ হ্রাসে। সেটা ঘটে শোষণের মাত্রা, বাড়তি মূল্যের হার বৃদ্ধির ফলে। সামাজিক উৎপাদে অর্থাৎ এক বছরে সমাজ কর্তৃক উৎপন্ন বৈষয়িক দ্রব্যেও শ্রমিকদের ভাগ অর্থাৎ তাদের পারিশ্রমিকও কমতে থাকে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের ভাগ বর্তমান প্রায় ৪০ শতাংশ, অথচ পঞ্চাশ বছর আগে ছিল ৫৪ শতাংশ। ফ্রান্সে

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৬৫৯।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ছিল নবসৃষ্ট সমস্ত দ্রব্যের অর্ধেকের সমান। এখন এই ভাগটা নেমে গেছে ৩৪ শতাংশ।

মেহনতিদের অবস্থায় অনপেক্ষ অবনতি — এটা হল তাদের জীবনযাত্রা ও শ্রমের পরিস্থিতিতে অবনতি। সেটা প্রকাশ পায়, তাদের জীবনযাত্রার মান হ্রাসে, খারাপ বাসস্থান, পোশাক-আশাক, গৃহস্থালির জিনিসপত্রের প্রাথমিক চাহিদা মেটানোর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সুযোগে। জাতিসঙ্ঘের তথ্য অনুসারে, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রায় ৮০ কোটি লোক হয় বুভুক্ষু, নয় নিয়মিত অর্ধাশনে দিন কাটায়। প্রতি বছর প্রায় চার কোটি লোকের মৃত্যু হয় অনশনে। শ্রমের মাত্রাতিরিক্ত প্রখরীকরণে হাতপা ভাঙা, নানা পেশাগত রোগ বেড়ে চলেছে। বহু শ্রমিক পরিবার মাথা গোঁজে বাসের অযোগ্য জায়গায়, শহরের বস্তিতে।

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য হল মেহনতিদের চাহিদার বর্ধমান মাত্রা আর বাস্তব পরিভোগের মানের মধ্যে অসামঞ্জস্য। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের গতিপথে বেতন আর পরিভোগের মান খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও বেশির ভাগ মেহনতির জীবনযাত্রার মান সরকারিভাবে ধার্য ন্যূনতম মানের নিচে।

পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়মের ক্রিয়ায় শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বৈরিতা বাড়ছে, যার অনিবার্য পরিণাম হল পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক ধ্বংস। বর্তমানে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় রয়েছে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবণতা: ক) পুঁজির সঞ্চয় প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর

অবস্থায় অবনতির মূল প্রবণতা; খ) পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই বর্ধমান সামাজিক শক্তি থেকে উদ্ভূত তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবণতা। সেটা প্রকাশ পাচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী আর তার সহযোগীদের সংগঠনশীলতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে। শ্রমিক শ্রেণী ক্রমেই বেশি করে বুঝতে শুরু করছে যে শোষণ আর অধিকারহীনতা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক উচ্ছেদের পথ।

সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়

সাম্রাজ্যবাদের লেনিনীয় তত্ত্ব

উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের গোড়ায় পুঁজিতন্ত্র প্রবেশ করে সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে। লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে (১৯১৬) পুঁজিতন্ত্র বিকাশের এই পর্যায়ের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ দেন প্রথম। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্মার্থ তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন, মেলে ধরেন তার অচিকিৎস্য ক্ষত আর পাপ, দেখান তার অমোঘ ধ্বংসের শর্ত। সাম্রাজ্যবাদের লেনিনীয় বিশ্লেষণ হল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রত্যক্ষ অনুবর্তন। তাতে করে তিনি মার্কসীয় বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে তাঁর মতবাদ হল প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রিক

অর্থশাস্ত্রের বিকাশে এক নতুন পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদের লেনিনীয় তত্ত্ব আরো বিকশিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দলিলগুলিতে, ভ্রাতৃস্থানীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপে, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে।

লেনিন দেখান যে সাম্রাজ্যবাদ নতুন কোনো একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়। এটা সেই একই পুঁজিতন্ত্র, একই তার অর্থনৈতিক নিয়মাদি, একই ভিত্তি — উৎপাদনের উপায়ের ওপর পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক। নিজের মর্মার্থে তা বদলায় নি। তার মূলীভূত নিয়ম থেকেই গেছে বাড়তি মূল্যের উৎপাদন এবং পুঁজিপতি কর্তৃক তা আত্মসাৎ, পুঁজি কর্তৃক মজুরি শ্রম শোষণ। তাই পুঁজিতন্ত্র যেসব নিয়মবদ্ধতা, দিক, লক্ষণে চিহ্নিত, তা সাম্রাজ্যবাদের যুগেও টিকে থাকে।

তবে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ কতকগুলি দিক আর লক্ষণ আছে। তার বিশিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষণ হল এই:

১। উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন বিকাশের এমন একটা উচ্চ মাত্রায় পোঁছেছে যে গড়ে উঠেছে একচেটিয়া সংস্থা, মনোপলি এবং তা অর্থনৈতিক জীবনে নির্ধারক ভূমিকা নিচ্ছে;

২। শিল্প পুঁজির সঙ্গে ব্যাংক পুঁজির মিলন এবং তার ভিত্তিতে ফিনান্স পুঁজি, ফিনান্স গোষ্ঠীতন্ত্রের সৃষ্টি;

৩। পণ্য রপ্তানি থেকে পৃথক পুঁজির রপ্তানি, যা সবিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে;

৪। গঠিত হচ্ছে পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া জোট, ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছে পৃথিবীর;

৫। বড়ো বড়ো পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিদের মধ্যে পৃথিবীর ভূখণ্ড বণ্টন সমাপ্ত।

উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উৎপাদনের টেকনিকাল ভিত্তিতে এমনসব গুরুতর পরিবর্তন শুরু হয় যাতে পুঁজিতন্ত্র প্রবেশ করে তার বিকাশের নতুন পর্যায়ে। বৈজ্ঞানিক টেকনিকাল অগ্রগতির প্রভাবে উৎপাদনের শিল্প শাখাটার বিকাশ হয়ে ওঠে দ্রুত। যেমন, ধাতু শিল্পে ইস্পাত গালাই-য়ের নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হতে থাকল। প্রচলিত হতে থাকল অন্তর্দাহ ইঞ্জিন, বাষ্পীয় টার্বাইন, বৈদ্যুতিক মোটর, প্রভৃতি নতুন ধরনের সব শক্তিযন্ত্র। বিকশিত হতে থাকল নতুন নতুন শিল্প শাখা (তৈল, রসায়ন, বিদ্যুৎ-রসায়ন)। দেখা দিল যোগাযোগ ও পরিবহণের নতুন উপায়। শিল্পে ঘটল বৃহৎ একটা টেকনিকাল ও গাঠনিক অগ্রগতি। তাতে সূচিত হল বৃহৎ শিল্পের বর্ধমান গুরুত্ব। পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা সংগ্রামের পরিস্থিতি বদলে গেল। বৃহৎ এবং বৃহত্তম উদ্যোগগুলি উঠল ওপরে। ছোটো আর মাঝারি উদ্যোগগুলি ধ্বংস পেতে থাকল। প্রায়ই ঘটতে থাকল অত্যুৎপাদনের অর্থনৈতিক

সংকট, বেড়ে উঠল বেকারের সংখ্যা। সর্বনাশা প্রতিযোগিতার পরিণামে বৃদ্ধি পেল উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন অর্থাৎ বৃহৎ ও বৃহত্তম পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া উদ্যোগগুলির হাতে ক্রমেই বেশি করে উৎপাদনের উপায়, শ্রমশক্তি, উৎপাদ পুঞ্জীভূত হতে থাকল।

মনোপলি বা একচেটিয়া কী জিনিস? এ হল সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বড়ো বড়ো পুঁজিপতির (অথবা পুঁজিপতি সঙ্ঘের) হাতে কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন।

একচেটিয়া কাজে নামে নানা চেহারায়। তাদের মধ্যে প্রধান হল কার্টেল, সিণ্ডিকেট, ট্রাস্ট, কনসার্ন। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার মোট কোম্পানিগুলির যারা মাত্র ০·০০২%, তেমন ৩৫০টি বৃহত্তম একচেটিয়া সংস্থার হাতে ছিল ২/৩ ভাগ শ্রমশক্তি, প্রায় ৭০% পুঁজি আর মুনাফা।

কিন্তু একচেটিয়ার আধিপত্যে সাধারণভাবে প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় না, কেবল তার স্বাধীনতা সংকুচিত হয়, দেখা দেয় বিশেষ তীব্র সংঘর্ষ। একচেটিয়াগুলি প্রতিযোগিতা সংগ্রাম চালায় একচেটিয়া অতিমুনাফা লাভের জন্য। একচেটিয়া উদ্যোগগুলির লাভ একচেটিয়াবহির্ভূত উদ্যোগগুলির চেয়ে সাধারণত ২-৩ গুণ বেশি। এই লাভ ওঠাবার প্রধান কারণ হল একচেটিয়াদের উৎপাদিত পণ্যের দাম একচেটিয়ারকম উঁচু।

ফিনান্স পর্টুজি ও পর্টুজি রপ্তানি

শিল্পে উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়ার উদ্ভব থেকে অনিবার্যতই গড়ে উঠেছে ব্যাঙ্কগুলির একচেটিয়া, ফিনান্স পুঁজি। ফিনান্স পুঁজি হল ব্যাংক একচেটিয়ার সঙ্গে জুড়ে যাওয়া একচেটিয়া শিল্প পুঁজি। লেনিন লিখেছেন, 'উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন; তা থেকে গজানো একচেটিয়া; শিল্পের সঙ্গে ব্যাঙ্কের মিলন বা জুড়ন— এই হল ফিনান্স পুঁজির উদ্ভবের ইতিহাস এবং কথাটার মর্মার্থ।'* ফিনান্স পুঁজি কেন্দ্রীভূত থাকে ফিনান্স গোষ্ঠীচক্রের হাতে — এরা হল বুর্জোয়াদের ওপরতলার অল্পসংখ্যক কিছু লোক, অর্থনীতির সমস্ত শাখায় যারা আধিপত্য করে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।'

শিল্প পুঁজির সঙ্গে ব্যাংক পুঁজির মিলন থেকে গড়ে ওঠে এমন অতিকায় সব উদ্যোগ, স্বদেশে যা আর আঁটে না, অর্থাৎ আরো তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে পুঁজির বৃদ্ধি আর দেশাভ্যন্তরে তার লাভজনক লগ্নির সুযোগের মধ্যে বিরোধ। শুরু হয় অন্য দেশে, সাধারণত অর্থনীতির দিক থেকে স্বল্পবিকশিত দেশে পুঁজির রপ্তানি। সেখানে গঠিত হয় বড়ো বড়ো একচেটিয়া সঙ্ঘগুলির 'দুহিতা' কোম্পানি, লুট করা হয় সেসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শোষিত হয় সেখানকার শস্তা শ্রমশক্তি।

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৪৪।

লেনিন লিখেছেন, 'পুঁজিতন্ত্র যতদিন পুঁজিতন্ত্র থাকছে, ততদিন উদ্বৃত্ত পুঁজি সে দেশটার জনগণের জীবন উন্নয়নে লাগানো হয় না, কেননা তাতে পুঁজিপতিদের মুনাফা কমে, সেটা যায় দেশের বাইরে, পশ্চাৎপদ দেশে চালান মারফত মুনাফা বৃদ্ধিতে।'*

এইভাবে, পুঁজির রপ্তানি হল দুনো পরজীবিতা — উদ্বৃত্ত পুঁজি দেশের অভ্যন্তরে মেহনতিজনের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় না, দেশের বাইরে, বিশেষ করে অর্থনীতিতে স্বল্পবিকশিত দেশে প্রেরিত হয়ে তা এসব দেশকে শোষণের উপায় হয়ে দাঁড়ায়, আটকে রাখে তাদের স্বাধীন বিকাশ।

বিশ্বের অর্থনীতি ও ভূখণ্ডের বাঁটোয়ারা

পুঁজি রপ্তানির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংঘ। আন্তর্জাতিক একচেটিয়াও হল বৃহত্তম সব একচেটিয়া যারা কাজ করে কয়েকটি দেশ, এমনকি গোটা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া জুড়ে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার বহুল প্রচলিত রূপ হল ট্র্যান্সনাশন্যাল বা বহুজাতিক কর্পোরেশন। প্রতিযোগিতা সংগ্রামে বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা, আন্তর্জাতিক আয়তনে উৎপাদনের বিশেষীকরণ ও সহযোগের ব্যবস্থা করা, নানা ধরনের আন্তর্জাতিক

---

* ঐ, পৃঃ ৩৬০।

ফন্দিফিকির মারফত অতিরিক্ত আয় পাওয়া, টেকনিকাল অভিনবত্ব একচেটিয়া করে নেওয়া ইত্যাদি সম্ভব হয় তাদের পক্ষে।

বিশ্বের অর্থনৈতিক বাঁটোয়ারায় বাজার, প্রভাবাঞ্চল আর পুঁজি চালানের জন্য একচেটিয়াগুলির মধ্যে সংগ্রাম লোপ পায় না। তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে দুনিয়ার ভূখন্ড ভাগাভাগি করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংগ্রাম।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক ভাগাভাগির অনিবার্য পরিণাম হল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য যা প্রভু দেশ কর্তৃক ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির জনগণের নির্মম শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হল ঔপনিবেশিক দাসত্বের একটা অতিকায় ব্যবস্থা যার কবলে পড়েছিল আমাদের গ্রহের অধিকাংশ জনগণ। তাতে মিলেছিল অর্থনৈতিক ধরনের গোলামির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাধ্যীকরণের ভিত্তিতে শোষণ।

সাম্প্রতিক জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে চূর্ণ করেছে তার ক্লাসিকাল রূপে। ৭০-এর দশকে কার্যত সম্পূর্ণ হয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ। উপনিবেশে এখন বাস করে বিশ্ব জনসংখ্যার ০·৩ শতাংশ, তার অঞ্চল ০·৭ শতাংশ, প্রায় ১০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। কিন্তু আগেকার ঔপনিবেশিকতার স্থান নিয়েছে নয়া-উপনিবেশবাদ। অনেক সদ্যোমুক্ত দেশ আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলির অর্থনৈতিক প্রভুত্বাধীন।

পুঁজিতন্ত্রের একচেটিয়া পর্যায়ের যে চরিত্রনির্ণয় করেছেন লেনিন, সেটা তার মূলগত অর্থনৈতিক লক্ষণের বিশ্লেষণেই সীমিত নয়। তাতে সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক স্থানও নির্দিষ্ট হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য এই যে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ এবং শেষ পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক স্থান বিষয়ে লেনিনের মতবাদ হল পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক পতনের অনিবার্যতা নিয়ে মার্কসীয় মতবাদের অনুবর্তন ও বিকাশ।

সাম্রাজ্যবাদে উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির সমস্ত বিরোধের চূড়ান্ত তীক্ষ্ণতাবৃদ্ধি দেখিয়েছেন লেনিন, বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিতন্ত্রের একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়। তার তিনটি বৈশিষ্ট্য: ১) একচেটিয়ারূপী পুঁজিতন্ত্র; ২) পরজীবী বা পচনশীল পুঁজিতন্ত্র; ৩) মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্র। পরজীবিতা, পুঁজিতন্ত্রের পচনশীলতা সাম্রাজ্যবাদের মর্মার্থেই, একচেটিয়ার আধিপত্য, ফিনান্স গোষ্ঠীতন্ত্রের পীড়নের মধ্যেই নিহিত। পুঁজিতন্ত্রের পচনশীলতায় বোঝাচ্ছে যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তি বিকাশের একটা কারিকা থেকে পরিণত হয়েছে সামাজিক প্রগতির একটা প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকে।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতন্ত্রের বিরোধগুলিকে চূড়ান্ত সীমায় ঠেলে দেয়। পুঁজিতন্ত্রের গোটা যুগটার যা প্রকৃতিগত, পুরনো সেই সমস্ত বিরোধই তীব্র হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দেখা দেয় এবং বাড়তে থাকে নতুন

বিরোধ। সর্বাগ্রে গভীর হয় পুঁজিতন্ত্রের মূলীভূত বিরোধ -- উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর সেটা আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক রূপ।

মূলীভূত বিরোধ গভীর হয়ে ওঠায় শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংগ্রাম তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। ভোগ্য বস্তুর একচেটিয়া চড়া দর বেঁধে, শ্রমশক্তির মূল্য আর বেতনের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে ফিনান্স পুঁজি শ্রমিকদের শোষণ বাড়িয়ে তোলে। বর্ধিত শোষণের জবাব হল প্রলেতারিয়েতের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম, ধর্মঘট সংগ্রামের রীতিমতো বৃদ্ধি। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম অবারিত হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই।

চূড়ান্ত সীমায় তীক্ষ্ম হচ্ছে কেবল বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বিরোধটাই নয়। বিভিন্ন সামাজিক স্তর, জাতি ও দেশের লোকেদের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে আসছে সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হচ্ছে ক্রমেই ব্যাপক স্তরের মেহনতি জনসাধারণ, সামাজিক আন্দোলন, গোটাগুটি এক-একটা জাতি। একক একচেটিয়াবিরোধী প্রবাহে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার শর্ত গড়ে উঠছে এতে।

প্রবল হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ আর ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে বিরোধ, বেড়ে উঠছে নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

একচেটিয়াগুলির স্বার্থের মধ্যে সংঘাতের ফলে তীব্র

হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মধ্যে বিরোধ। নিজেদের মধ্যে নির্মম সংগ্রামে দুর্বল হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, টলে উঠছে তার ভিত্তি।

এই হল প্রধান প্রধান বিরোধ যাতে সাম্রাজ্যবাদ পরিণত হচ্ছে মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্রে। তবে তার মানে এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদ নিজে থেকেই মরে যেতে পারে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়াই। একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র তার সমস্ত বিরোধ চূড়ান্ত মাত্রায় তীক্ষ্ম করে তুলে প্রলেতারিয়েতকে ঠেলে দিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, এ বিপ্লবকে করে তুলছে বাস্তবত অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের অসমানতার নিয়ম

এক-একটা উদ্যোগ, শিল্পশাখা, দেশের অসম বিকাশ সর্বদাই ছিল পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। বিকাশের অসমানতা হল প্রতিযোগিতা আর পুঁজি-তান্ত্রিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের ফল। তবে প্রাক্-একচেটিয়া পর্বে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ চলছিল ন্যূনাধিক সমতালে, প্রচণ্ড উল্লম্ফন বা ঝাঁকুনি ছাড়াই। ভূগোলকে তখন মুক্ত ভূখণ্ড ছিল অনেক, যা তখনও পুঁজি-তান্ত্রিক শক্তিদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায় নি। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ চলতে পারছিল প্রসারে, বিভিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক দেশের স্বার্থে স্বার্থে খুব তীক্ষ্ম

সংঘাত বাধত না। কিছু দেশের পক্ষে অন্য কিছু দেশকে ছাড়িয়ে যেতে বেশ দীর্ঘ সময় লাগত।

সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা অন্যরকম। বিজ্ঞান ও টেকনিকের দ্রুত বিকাশ আর একচেটিয়াদের হাতে পুঁজির বৃদ্ধিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে এ ওকে ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অন্যান্য দেশের চেয়ে পরে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথ নিলেও কোনো কোনো দেশ অগ্রণী টেকনিক আর উৎপাদনের বেশি প্রগতিশীল পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে যায়। বিকাশের অসমানতা ধারণ করল উল্লম্ফনের চরিত্র।

এখন গড়ে উঠেছে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার তিনটি প্রধান কেন্দ্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ, জাপান। মালের বাজার, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র, কাঁচামালের উৎসের জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সংগ্রাম বেড়ে চলেছে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের অসমানতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত তাদের রাজনৈতিক বিকাশের অসমানতাও, অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক বিরোধ আর প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম বিকাশের অসমানতা। পেকে উঠছে প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার সবচেয়ে দুর্বল গ্রন্থিগুলোয় ভাঙনের পরিস্থিতি।

সাম্রাজ্যবাদের আমলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

বিকাশের অসমানতার নিয়ম অবলম্বন্ করে লেনিন এই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব প্রথমে কয়েকটি, এমনকি একটি পংজিতান্ত্রিক দেশেও। সেই দেশটা হয়ে দাঁড়ায় রাশিয়া, ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব প্রমাণ করল লেনিনের প্রতিভাদীপ্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য।

পংজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট*

পংজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট ব্যাপ্ত তার সমগ্র ব্যবস্থায়, তার সবকটি দিকে: অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শ, সংস্কৃতিতে। পংজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগ একটা সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্ব, তার গতিপথে শুরু হয়েছে পংজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক উচ্ছেদের অমোঘ প্রক্রিয়া, 'তার সমস্ত আয়তনে পংজিতন্ত্রের ধ্বংস এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রসবের'* প্রক্রিয়া।

পংজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট তার বিকাশের দুটি পর্যায় পেরিয়ে এসেছে, বর্তমানে চলছে তার তৃতীয় পর্যায়।

পংজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের প্রথম পর্যায় শুরু হয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) আর ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খন্ড ৩৬, পৃঃ ৪৮।

বিজয় থেকে। তখনই লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় রাশিয়ার মেহনতিরা বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশে পঁুজিতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়, নিজেদের ক্ষমতা স্থাপন করে সমাজতন্ত্র নির্মাণে নামে। মানবজাতির ইতিহাসে শুরু হল নতুন যুগ, যার মূলকথা হল পঁুজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ।

পঁুজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) আর ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর থেকে। এই দেশগুলি পরে গড়ে তোলে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সংকটের গভীরতা বৃদ্ধি আর তার পতনের সূত্রপাতও এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য।

৫০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয়েছে সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্যায় যা এখনো চলছে। এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল এই যে বিশ্ব যুদ্ধের সঙ্গে তা জড়িত নয়, চলছে পঁুজিতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে।

পঁুজিতন্ত্রে সাধারণ সংকটের প্রধান দিকগুলি হল:

— সমাজতান্ত্রিক আর পঁুজিতান্ত্রিক — এই দুই বিপরীত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বের বিভাগ এবং তাদের মধ্যে সংগ্রাম;

— সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট যা পরিণত হয়েছে তার পতন ও চূড়ান্ত ভাঙনে;

— পঁুজিতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী

বিরোধের প্রকোপ, অর্থনৈতিক অস্থায়িত্ব ও পচনশীলতার বৃদ্ধি;

— বুর্জোয়া রাজনীতি ও ভাবাদর্শের সংকট বৃদ্ধি, মানবজাতির অধিকাংশের ওপর সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের অবসান, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের ক্ষেত্র সংকোচন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের মূল দিকগুলি প্রকাশ পাচ্ছে প্রথমত এই ব্যাপারে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিণত হয়েছে মানব সমাজ বিকাশের নির্ধারক কারিকায়। বাস্তব সমাজতন্ত্রের প্রভাব হয়ে উঠছে প্রবল ও গভীর। এখন বিশ্বের ওপর তা প্রধানত প্রভাব ফেলছে তার অর্থনৈতিক কৃতিত্ব দিয়ে। পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার নির্ধারক ফ্রণ্টটা রয়েছে অর্থনীতির, অর্থনৈতিক পলিসির ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের গভীরতা বৃদ্ধিতে রীতিমতো প্রভাব ফেলেছে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিলোপ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদের শোষণ বন্ধ হয়েছে। সদ্যোমুক্ত অনেক দেশের ওপরেই এখনো চলছে নয়া-উপনিবেশ-বাদীদের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক শোষণ আর রাজনৈতিক চাপ। সদ্যোমুক্ত দেশেদের সামনে এখনকার কর্তব্যটা জটিল ও বহুরূপী। কথাটা হল অর্জিত স্বাধীনতার সংহতি, স্বয়ম্ভর জাতীয় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা এবং অতীত থেকে পাওয়া পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করা নিয়ে। এগুলি অর্জিত হতে পারে

সমাজতান্ত্রিক দেশ আর আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মৈত্রীর পথে।

তৃতীয়ত, প্রবল হয়েছে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ, তার পরিণামে সাম্রাজ্যবাদের কেবল আগেকার বিরোধগুলির তীক্ষ্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, দেখা দিয়েছে নতুন বিরোধও।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের মর্মার্থ হল অতি-একচেটিয়া মুনাফা নিষ্কাশন, শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমন, আগ্রাসক বহির্নীতি অনুসরণের উদ্দেশ্যে একচেটিয়ার শক্তি আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় শক্তির মিলন।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটা হল বিদ্যমান ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পুঁজিতন্ত্রের বিরোধগুলির সমাধান করা, অর্থাৎ ধ্বংস থেকে পচনশীল পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচাবার প্রয়াস:

— রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনী উপায়ের একাংশের, বিশেষ করে কতকগুলি শিল্প শাখা, পরিবহণের মালিক;

— দেখা দেয় রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত উদ্যোগ;

— বিভিন্ন শিল্পশাখায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পুঁজি লগ্নি করে রাষ্ট্র চেষ্টা করে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে। জাতীয় আয় ও আর্থিক সম্পদের পুনর্বণ্টন করে একচেটিয়ার স্বার্থে;

— তথাকথিত 'সংকটবিরোধী ব্যবস্থা' অবলম্বন করে রাষ্ট্র চেষ্টা করে শ্রেণী-সংগ্রামের উত্তাপ হ্রাসের জন্য শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করতে।

একচেটিয়া ও রাষ্ট্রের শক্তি মিলনের যন্ত্রব্যবস্থায় নির্ধারক ভূমিকা নেয় বড়ো বড়ো ফিনান্স গোষ্ঠী, একচেটিয়াগুলির বিশেষ শ্রেণী-সংগঠন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন সংগঠন হল শিল্পপতিদের জাতীয় সমিতি, যাতে ঐক্যবদ্ধ ১৮ হাজার কর্পোরেশন। বড়ো বড়ো কিছু একচেটিয়া কোটিপতিদের নিয়ে গঠিত তার ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তেই নির্ধারিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান প্রধান দিক।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্যসূচক দিক প্রকাশ পায় অর্থনীতির সামরীকরণে, সামরিক-শিল্প সমাহার গঠনে। সামরিক-শিল্প সমাহার হল সামরিক শিল্পের একচেটিয়া আর রাষ্ট্রযন্ত্রের সমরবাদী মহলের মধ্যে নিবিড় জোট। তাতে থাকে সামরিক উদ্যোগগুলির মালিকেরা, বড়ো বড়ো সামরিক ও রাষ্ট্রিক কর্মকর্তারা। অস্ত্রপ্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়ায় বড়ো বড়ো একচেটিয়াদের কাছে স্বর্ণবৃষ্টি। নাগরিক উৎপাদনের চুক্তির তুলনায় সামরিক ফরমাশ কয়েকগুণ বেশি লাভজনক। সামরিক-শিল্প সমাহার উৎসাহী সামরীকরণ পলিসিতে, অস্ত্রপ্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের তা বিরোধী।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হল চূড়ান্ত বিরোধগর্ভ একটা ব্যাপার। বর্তমানের অতিকায় সামাজিক উৎপাদনী শক্তি দাবি করে উৎপাদনের সামাজিক পরিচালনা, শ্রমের ফলাফল আত্মসাৎকরণ ও বণ্টনের সামাজিক রূপ। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র উৎপাদনের

সামাজীকরণ প্রক্রিয়া, পুঁজি ও উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়াকে প্রবলতর করে। একচেটিয়াকরণ উঠেছে একটা অভূতপূর্ব মাত্রায়: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশে এক-একটা শিল্প-শাখার ৬০-১০০% একচেটিয়ার দখলে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে গোটাকয়েক ফিনান্স গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র গড়ে তোলে অর্থনীতির কেন্দ্রীভূত পরিচালনার কয়েকটা উপাদান। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখায় বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা উৎপাদন, সঞ্চয়, সঞ্চালন, বণ্টনের প্রক্রিয়া নিয়মিত করে সমস্ত সমাজের স্বার্থে নয়, কেবল তার উচ্চকোটি বুর্জোয়ার স্বার্থে।

জাতীয় আয়ের ক্রমেই বেশির ভাগটার রাষ্ট্রীয়করণ আর কেন্দ্রীভূত বিলিব্যবস্থা, পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনের বিরাট যন্ত্র সৃষ্টি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের সমস্ত রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ব্যবস্থাদি — এ সবই হল উৎপাদনের আরো বিপুল সামাজীকরণের বিভিন্ন দিক।

এইভাবে পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের অভূতপূর্ব সামাজীকরণ, জাতীয় অর্থনীতি পরিকল্পনের এক-একটা উপাদান সৃষ্টির ফলে পুঁজিতন্ত্রের গর্ভেই গড়ে উঠছে সমাজতন্ত্রের, উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের বদলে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপনের বৈষয়িক পূর্বশর্ত।

সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র

সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্র কী অধ্যয়ন করে

সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক প্রণালীর উৎপাদনী সম্পর্ক, অর্থনৈতিক নিয়ম ও বর্গাদি নিয়ে চর্চা করে। পুঁজিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য যেখানে উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, সেখানে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতিগত হল সচেতন উৎপাদন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা। সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক যাতে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ নেই।

পুঁজিতন্ত্রের, তার বিরোধ ও ধ্বংসের যে শর্ত তার সর্বাঙ্গীন বিশ্লেষণ দিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস আমাদের জন্য সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের মূলগত কয়েকটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত রেখে গেছেন। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে লেনিন রচনা করলেন সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি, এ বিদ্যার পাকাপোক্ত তাত্ত্বিক বনিয়াদ তিনি গড়ে দেন। এই কথাটা তিনি তুলে ধরেন যে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন দ্বৈত কর্তব্যের সাধন, যথা, সাধারণভাবে পুঁজিতন্ত্রকে পরাস্ত করার জন্য সর্বাগ্রে দরকার শোষকদের পরাস্ত করে শোষিতদের ক্ষমতা রক্ষা (বৈপ্লবিক শক্তিতে শোষকদের উচ্ছেদের কর্তব্য) এবং তার পরে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক গঠন (সৃষ্টির কর্তব্য)।

মার্কসবাদে নতুন কথা হল লেনিন প্রণীত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক কর্মসূচি, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথে অর্থনৈতিক পলিসির মূলধারা নির্ণয় ও তার প্রতিপাদন। লেনিনের রচনায় গভীর ও সর্বাঙ্গীন আলোকপাত করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রশ্নগুলিতে, যথা: উৎপাদনের উপায়ের ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানার রূপ: শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; সমগ্র সমাজের আয়তনে এবং এক-একটা উদ্যোগে সমাজতান্ত্রিক কারবার চালানোর ভিত্তি ও উপায়; মেহনতিদের মধ্যে বৈষয়িক সম্পদ বণ্টন ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের মূলীভূত দিকগুলি প্রকাশ পায় অর্থনৈতিক নিয়মগুলিতে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনী উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার আধিপত্যে অর্থনৈতিক নিয়মগুলির অবজেকটিভ চরিত্র (অর্থাৎ লোকেদের চেতনা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকে স্বাধীনতা) নষ্ট হয় না কিন্তু বদলায় তার ক্রিয়ার চরিত্র।

সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতিগত কয়েকটি অর্থনৈতিক নিয়ম সমাজতন্ত্রেও কাজ করতে থাকে। যেমন, উৎপাদনী শক্তির চরিত্র ও বিকাশের মাত্রার সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের অনুরূপিতার নিয়ম। কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় নতুন অর্থনৈতিক নিয়ম, যেমন, সমাজতন্ত্রের মৌল অর্থনৈতিক নিয়ম, জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত ও যথানুপাতিক বিকাশের নিয়ম ইত্যাদি।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মগুলির গুণগত নতুন বৈশিষ্ট্য এই যে তাদের চরিত্র আর স্বতঃস্ফূর্ত থাকে না। সামাজিক মালিকানার পরিস্থিতিতে এই নিয়মগুলিকে তাদের গভীর প্রজ্ঞানের ভিত্তিতে সচেতন ও পরিকল্পিত রূপে কাজে লাগানো হয়।

সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক নিয়মের সচেতন প্রয়োগে সম্ভব হয় বিজ্ঞানসিদ্ধ অর্থনৈতিক পলিসি অনুসরণ, অর্থনৈতিক নির্মাণকর্ম, সামাজিক শ্রমের সংগঠন ও জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব।

উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানা

একটা ব্যবস্থা হিশেবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপলাভ সম্পূর্ণ হয় জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক, সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক স্থাপনে। উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে দেখা দিতে পারে না, সেটা ঘটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর। লেনিন লিখেছেন, এর জন্য দরকার 'সামাজিক বিপ্লব, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ এবং সামাজিক মালিকানায় তাদের উত্তরণ।'*

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৬, পৃঃ ২০৪।

সামাজিক সমাজতান্ত্রিক মালিকানা কী জিনিস? তাতে বোঝায় যে উৎপাদনের উপায় হল সমাজের সমস্ত সদস্যের সম্পত্তি। সামাজিক মালিকানা সম্পর্কে সাধারণ এবং প্রধান কথা হল, কোনো একজন লোক ব্যক্তিগত মালিক হিশেবে অন্য কারো বিপরীত নয়। সমাজের সদস্যদের মধ্যে গড়ে ওঠে উৎপাদনের উপায়ের ওপর এজমালি, সহকর্তৃত্বের সম্পর্ক। যৌথ মালিক আর মেহনতি অচ্ছেদ্যরূপে মিলিত, অবিভাজ্য। এর ফলে সমাজতন্ত্রে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ থাকে না, লোকেদের মধ্যে দেখা দেয় কমরেডসুলভ সহযোগিতা, পারস্পারিক সাহায্য, যৌথতা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের উপায়ের ওপর রয়েছে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার নিরঙ্কুশ আধিপত্য। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১০ম ধারায় বলা হয়েছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ হল রাষ্ট্রীয় (সর্বজনীন) ও যৌথখামারি-সামবায়িক মালিকানা রূপে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা।'

এই দুটি মূলগত রূপ দেখা দিয়েছে অবজেকটিভ ক্ষেত্রে আবশ্যিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অবধারিত রূপ হিশেবে। ব্যাপারটা হল এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন উপায়ের ওপর দুই ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানার সম্মুখীন হয়: অপরের শ্রম শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা আর নিজের শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র

ব্যক্তিগত সম্পত্তি। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সর্বজনীন (রাষ্ট্রীয়) মালিকানা গড়ে ওঠার উৎস হয় শোষকদের উদ্যোগাদি, ব্যাঙ্ক, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির জাতীয়করণ। যৌথখামারি-সামবায়িক মালিকানা দেখা দেয় ছোটো ছোটো কৃষি জোতের স্বেচ্ছায় বড়ো বড়ো যৌথ কৃষি জোতে সম্মিলনের ফলে আর ছোটো ছোটো কারুজীবীদের সমবায় গঠনের মধ্য দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার সর্বজনীন আর যৌথখামারি-সামবায়িক এই দুটি রূপ থাকার ফলে সমাজ বিভক্ত হয় দুটি মিত্র শ্রেণীতে: শ্রমিক শ্রেণী, সমাজের নেতৃশ্রেণী আর কৃষক শ্রেণী।

সমাজতন্ত্র গঠনের লেনিনীয় পরিকল্পনা

সমাজতন্ত্র গঠনের যে পরিকল্পনা লেনিন রচনা করেন তাতে ছিল দেশের শিল্পায়নের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল বনিয়াদ সৃষ্টি আর সেই সঙ্গে কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের কথা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ার প্রধান পদ্ধতি হল সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন। সেটা হল সর্বাগ্রে বৃহৎ শিল্পের বিকাশ, অগ্রণী যন্ত্র-কৌশলের ভিত্তিতে সমগ্র অর্থনীতির পুনর্গঠন। অর্থাৎ তাতে সূচিত হয়

কৃষিপ্রধান দেশের শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর, তাতে বোঝায় সামাজিক উৎপাদনের গঠনে এমন পরিবর্তন যাতে তার প্রধান অংশটা হয় বৃহৎ শিল্প যার মধ্যমণি হল যন্ত্রনির্মাণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পায়নের ফলে গড়ে ওঠে দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের সংহতি, জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখার টেকনিকাল পুনর্গঠনের জন্য, সমাজতান্ত্রিক পথে কৃষির উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ভিত্তি। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নে পাকাপোক্ত হয় মূলগত শাখাগুলিতে সামাজিক মালিকানা। তাতে নিশ্চিত হয় শহরে পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে কোণঠাসা করা, শিল্পে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়, শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি, তাতে সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃভূমিকার সংহতিতে সাহায্য হয়, জোরদার হয় দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য। ইতিহাসের দিক থেকে অতি অল্প সময়ে, বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়াই সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তুলল বৃহৎ আধুনিক শিল্প, পরিণত হল পরাক্রান্ত শিল্পোন্নত শক্তিতে, অর্জন করল পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনও ছিল সমাজতন্ত্র নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। 'সমবায় প্রসঙ্গে' (১৯২৩) এবং অন্যান্য রচনায় লেনিন কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সুসমঞ্জস কর্মসূচি বিকশিত করেন। তিনি দেখান যে ছোটো ছোটো খোদস্বত্ব জোতগুলির বৃহৎ

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপাদনী সমবায়ীকরণ। লেনিনের এই পরিকল্পনা সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির ষোলো আনা সমবায়ী-করণে সূচিত হয় গ্রামের পুরনো সমাজব্যবস্থায় আমূল ভাঙন, যুগ যুগের ব্যক্তিমালিকি কৃষি জোতের পুনর্গঠন, গ্রামে পুঁজিতন্ত্রের মূলোৎপাটন। যৌথী-করণের ফলে বিলুপ্ত হয় গ্রামের পেটি-বুর্জোয়া উৎপাদনী সম্পর্ক, তার স্থান নেয় নতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের তিনটি মৌল কর্তব্য সাধিত হয় সমবায়ীকরণে। প্রথমত, তাতে বিলুপ্ত হয় দেশের সবচেয়ে সংখ্যাবহুল শোষক শ্রেণী, কুলাক বা ধনী চাষির শ্রেণী। দ্বিতীয়ত, কৃষক শ্রেণীকে তা নিয়ে আসে খোদস্বত্ব জোত থেকে সমাজ-তান্ত্রিক জোতে। তৃতীয়ত, অর্থনীতির সবচেয়ে বিস্তীর্ণ এবং একান্ত আবশ্যক আর সেই সঙ্গে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ শাখাটিতে সমাজতান্ত্রিক ঘাঁটি লাভ করে সোভিয়েত ক্ষমতা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসাধারণের সংস্কৃতিতে বড়ো রকমের একটা উত্থান অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সেটা হল পূর্ববর্তী ব্যবস্থা থেকে পাওয়া জনগণের ব্যাপক নিরক্ষরতা আর শিক্ষাল্পতার বিলোপ; দক্ষ শ্রমিকদের ব্যাপক প্রস্তুতি, ব্যাপকায়তনে সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী কর্মী গঠন; বিজ্ঞানের বিকাশ ও উৎপাদনের সঙ্গে তার সম্পর্ক

বৃদ্ধি; মেহনতিদের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ও নৈতিক লালন।

জার রাশিয়ায় অধিবাসীদের ৩/৪ অংশই ছিল নিরক্ষর। প্রত্যন্ত জাতীয় অঞ্চলগুলিতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সার্বজনীন। লেনিন বলেছিলেন, 'তেমন বুনো দেশ যা শিক্ষা, আলোকপ্রাপ্তি আর জ্ঞানের দিক থেকে এতটা লুণ্ঠিত, তেমন দেশ ইউরোপে রাশিয়া ছাড়া আর নেই।'* সাংস্কৃতিক বিপ্লব সোভিয়েত দেশকে ঢেলে সাজে, ব্যাপক মেহনতি জনকে তা আত্মিক দাসত্ব আর তমসা থেকে বার করে আনে, মানবজাতি যে সাংস্কৃতিক সম্পদ সঞ্চয় করেছে, সেটা তুলে দিয়েছে তাদের আয়ত্তির মধ্যে। বিজ্ঞান, টেকনোলজি ও সংস্কৃতির শীর্ষে উঠে আসে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিনীয় তত্ত্ব পুরোপুরি কার্যে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত নির্মিত হয়ে যায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল বাস্তব, জয়লাভ করল তার নীতি।

সমাজতন্ত্রে কোনো লোক, কোনো সামাজিক গ্রুপ অন্যদের শোষণ করতে পারে না, কেউ পরজীবী থাকতে পারে না, খাটতে হবে সবাইকে। শ্রম সর্বজনীন, সমাজের প্রতিটি সভ্যের জন্য শ্রমের বাস্তব অধিকার গ্যারাণ্টিকৃত। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রকৃতি শ্রমক্ষম

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ১২৭।

প্রতিটি নাগরিকের পক্ষে শ্রমকে করে তোলে অপরিহার্য ও কর্তব্য। শুধু তাই নয়, শ্রম হল মর্যাদা, সমাজে মানুষের প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হয় তাতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে বলা হয়েছে, 'সমাজের পক্ষে হিতকর শ্রম এবং তার ফলাফলে নির্ধারিত হয় সমাজে মানুষের প্রতিষ্ঠা।'

সমাজতন্ত্রের মূলগত অর্থনৈতিক নিয়ম

বাস্তব সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে কাজ করে সমাজতন্ত্রের মূলগত অর্থনৈতিক নিয়ম যার মর্মার্থ হল সামাজিক উৎপাদনের অবিরাম বৃদ্ধি ও সমুন্নয়নের ভিত্তিতে সমাজের সমস্ত সভ্যের পূর্ণ সচ্ছলতা ও সর্বাঙ্গীন অবাধ বিকাশ নিশ্চিত করা।

লেনিন বলেছেন, 'কিভাবে সমস্ত মেহনতির জীবনকে করা যায় সর্বাধিক লঘুভার, যা তাদের সচ্ছলতার সুযোগ দেবে, এর বৈজ্ঞানিক বিবেচনা থেকে সামাজিক উৎপাদন ও দ্রব্যের বণ্টনকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত ও সত্য করে অধীনস্থ করার সুযোগ দেয় কেবল সমাজতন্ত্রই। কেবল সমাজতন্ত্রই সেটা কার্যকৃত করতে পারে। এবং আমরা জানি যে তাকে সেটা কার্যকৃত করতেই হবে আর এই সত্যটার উপলব্ধিই হল মার্কসবাদের সমস্ত দুরূহতা আর তার সমস্ত শক্তি।'*

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৩৮১।

সমাজতন্ত্রে ধরে নেওয়া হয় ক্রমবর্ধমান মাত্রায় লোকেদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ। এতে চাহিদা বলতে বোঝা হচ্ছে প্রথমত, যেগুলি শ্রমের উৎপাদনশীলতার মাত্রার সঙ্গে মেলে, দ্বিতীয়ত, যা মেটালে মানুষ বিকৃত হবে না, পক্ষান্তরে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন সুসমঞ্জস বিকাশে সাহায্য হবে। এগুলি হল শ্রমে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ, বৈষয়িক নিশ্চয়তা, যৌথতা আর কমরেডসুলভ পারস্পরিক সাহায্যের প্রেরণা, আমি দেশের একজন কর্তা এই বোধ।

সমাজতন্ত্রে বিশেষ পরিষ্কার রূপে ফুটে ওঠে এই প্রবণতা: বৈষয়িক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) যত মেটে তত বাড়ে তার বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে তীব্রভাবে বেড়ে ওঠে মানুষের আত্মিক ও সামাজিক চাহিদা। আত্মিক চাহিদা সর্বাঙ্গীন শিক্ষার্জন, বিশ্ব সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রসাদলাভ, সৃজনী ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে জড়িত।

সোভিয়েত জনগণের সচ্ছলতার মান বৃদ্ধিতে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিচ্ছে পরিভোগের সামাজিক ভাণ্ডার। পারিশ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে এই তহবিল ব্যবহৃত হয় নাগরিকদের চাহিদা মেটানোয়। এই সামাজিক তহবিল থেকে অবৈতনিক শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, মেহনতিদের ছুটির বেতন দেওয়া হয়। এইসব তহবিল থেকে নাগরিকদের ভর্তুকিমূলক সেবাকর্মও চলে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু ও প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠানাদির ৮০% ব্যয়ভার, বাসস্থানঘটিত খরচার মূলভাগ, স্যানাটোরিয়াম আর বিরাম ভবনে থাকা-

খাওয়ার একাংশ খরচা মেটানো হয় সামাজিক তহবিল থেকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে একই প্রকার পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পেনশন দেওয়া হয় সামাজিক পরিভোগ তহবিল থেকে অর্থাৎ রাষ্ট্র ও যৌথখামারগুলির টাকায়। পেনশন পাবার বয়স সোভিয়েত ইউনিয়নে অধিকাংশ দেশের চেয়ে কম: পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬০, নারীদের ক্ষেত্রে ৫৫ বছর। বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা, মাতৃ ও শিশু মঙ্গল চালু আছে।

সমাজতন্ত্রের মূলগত অর্থনৈতিক নিয়ম হল সামাজিক উৎপাদনের গতির নিয়ম। সমাজতন্ত্রের চালিকা শক্তি হল জনগণের পরিভোগ বৃদ্ধি, লক্ষ্যার্জনের উপায় — উৎপাদনের বিকাশ ও উন্নয়ন, গতির রূপ — সামাজিক পরিসরে পরিকল্পনা।

অর্থনীতির পরিকল্পিত অনুপাতসিদ্ধ বিকাশের নিয়ম। পরিকল্পন

উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা, বহুসংখ্যক উদ্যোগ আর শাখার একই, অখন্ড যন্ত্রব্যবস্থায় সম্মিলনের ফলে সমাজতন্ত্রে গড়ে ওঠে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের বিকাশকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করার সম্ভাবনা ও অবজেকটিভ আবশ্যিকতা। জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত, অনুপাতসিদ্ধ বিকাশ হল সমাজতন্ত্রের

অর্থনৈতিক নিয়ম। তা দাবি করে গোটা সমাজের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগের ওপর পরিকল্পিত ও অনুপাতসিদ্ধ নিয়মন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনের চরিত্র সার্বিক। এটা হল অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও মেহনতি জনগণের মূর্ত-নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ এবং তা প্রকাশ পায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা রচনায়। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা রচিত হয় শাখাগত ও আঞ্চলিক নীতির ভিত্তিতে, যাতে মেলানো হয় উদ্যোগগুলির অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও উদ্যোগের কেন্দ্রীভূত পরিচালনা। পরিকল্পনা হল সমাজের ভবিষ্যৎ অবস্থার মডেল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের মূল তথ্যগুলির একটি দলিল। পরিকল্পনায় থাকে বিকাশের অনুপাত, ধারা আর বৃদ্ধির হার, তা হল মূর্ত-নির্দিষ্ট যেসব লক্ষ্য পূরণ হতে পারে ও হওয়া উচিত তার সমষ্টি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পরিকল্পনা হল সমগ্রভাবে সামাজিক উৎপাদন আর তার এক-একটা অঙ্গের বিকাশের সূচক ও ব্যবস্থাদির একটা যোগ। বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনের কাজ হল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্তব্য অনুযায়ী একত্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংগঠন ও সমন্বয় নিশ্চিত করা; পরিকল্পনার কালপর্বটির জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক

বিকাশের মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করা, গৃহীত সিদ্ধান্ত পালনের ওপর অবিরাম নিয়ন্ত্রণ রাখা।

সমাজ কর্তৃক পরিকল্পিত, অনুপাতসিদ্ধ বিকাশের নিয়মটির সচেতন সদ্ব্যবহার হল অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার অভিব্যক্তি। পার্টির নির্দেশানুসারে চালিত হয়ে রাষ্ট্র ন্যূনাধিক দীর্ঘকালের জন্য বিকাশের কর্মসূচি স্থির করে, জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত দিয়ে পরিকল্পনা রচনা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক পলিসি। তার রণনীতি ও রণকৌশল

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক পলিসি হল সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ, জাতিদের মধ্যে সম্পর্কের নিয়ামক। লেনিন একাধিকবার এই কথায় জোর দিয়েছেন যে পার্টির কাছে অর্থনৈতিক পলিসি 'একেবারে অসাধারণ একটা তাৎপর্য' ধরে, অর্থনৈতিক নির্মাণ হল 'আমাদের প্রধান রাজনীতি', 'আমাদের পক্ষে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক রাজনীতি।'*

সমাজতান্ত্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়ার পর্যায়ে

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪৩, পৃঃ ৩৪১; খণ্ড ৪১, পৃঃ ৪০৭, খণ্ড ৪৩, পৃঃ ৩৩০।

বৈষয়িক উৎপাদনের আরো বৃদ্ধিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক পলিসির ভূমিকা অপরিমেয়রূপে বেড়ে উঠবে। বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে অর্থনৈতিক বিকাশের রণনীতি ও রণকৌশল।

রণনীতিতে স্থির হয় দীর্ঘকালীন লক্ষ্য এবং বড়ো একটা ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল ধারা। অর্থনৈতিক রণনীতি বলতে বোঝায় একটা সুদীর্ঘ পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে অর্থনৈতিক পলিসির দীর্ঘকালীন ধারা যাতে বৃহদায়তন অন্তিম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে। যেমন, বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি যে দীর্ঘমেয়াদি রণনীতি ধার্য করেছে তার লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্রের বিকাশ সম্পূর্ণীকরণ, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ত্বরণ, সমাজতন্ত্র যেন ক্রমেই পূর্ণাকারে তার শ্রেষ্ঠত্ব, সৃজনী সম্ভাবনা অবারিত করে, মেহনতিরা যেন আরো ভালোভাবে থাকে, আরো পূর্ণাকারে যেন নিজেদের চাহিদা মেটায়।

অর্থনৈতিক রণনীতিতে চালিত হয়ে পার্টি স্থির করে সব থেকে যুক্তিযুক্ত রণকৌশল, তাতে বোঝায় 'সবচেয়ে কম ব্যয়ে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে পাকা ফল দিতে পারে সংগ্রামের এমন উপায়, প্রণালী ও পদ্ধতির'* সচেতন নির্বাচন। রণকৌশল হল নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বটির অভ্যন্তরীণ কোনো একটা পর্যায়ে

---

* ঐ, খণ্ড ৯, পৃঃ ২০৮।

পার্টি কর্তৃক গ্রহণীয় ব্যবস্থাদির সমষ্টি। তা আসে রণনীতি থেকে, রণনীতির অনুসরণ তার কাজ, বিকাশের মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতির কথা মনে রেখে তা রচিত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পার্টির রণকৌশলগত কর্তব্য হল অর্থনীতির ফলপ্রসূতা আরো বাড়ানো, পরিচালনার মান উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির বেগ বর্ধনের ওপর, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির প্রখরীকরণের ওপর প্রধান জোর দেওয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক পলিসির রণনীতি ও রণকৌশল পরস্পরকে সমৃদ্ধ ও পরিপূরিত করে সত্যকার একটা একক গড়ে তোলে। গভীর ও সর্বতোভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির প্রক্রিয়াদির মর্ম ভেদ করে পার্টি উপনীত হয় বিকশিত সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণীকরণের ধারণায়, বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রতিপাদ্যে, স্থিরমস্তিষ্ক মূল্যায়নে, যা রাখা হয়েছে অর্থনৈতিক পলিসির, তার রণনীতি ও রণকৌশলের ভিত্তিতে। কঠোরভাবে মানা হয়েছে এই সূত্র: বেশি আগু বেড়ে যাওয়া নয়, আবার ঢিলেমিও নয়। প্রয়োজন কেবল সঠিক লক্ষ্য স্থাপন করতে পারাই নয়, যেকোনো দুরূহতা জয় করে একাগ্রভাবে তাকে কার্যকৃত করাও। কেবল এইরূপ অভিগমনেই পলিসির ভ্রান্তি থেকে, কামনাকে বাস্তব বলে ধরার প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক পলিসি রচনায় নির্ধারক ভূমিকা নেয় সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র। তার নিয়মগুলির

ভিত্তিতেই সংরচিত হয় দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তাদি, অর্থনৈতিক পলিসির লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি কার্যকৃত হয়। রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থনৈতিক পলিসির তাত্ত্বিক ভিত্তি।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব

ব্যাপক অর্থে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম বলতে বোঝায় সমগ্রভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সাধারণ সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়মবদ্ধতা, সমাজের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের পথ, রূপ ও পদ্ধতি বিষয়ে বিজ্ঞান, পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস আর কমিউনিজমের বিজয়ের সর্বাঙ্গীণ প্রতিপাদন।

সংকীর্ণতর, সুনির্দিষ্ট অর্থে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তিনটি মূলাঙ্গের একটি, যা অন্য দুটি অঙ্গ, দর্শন আর রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উদ্ভব ও মর্মার্থ

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক প্রতিপাদন হিশেবে, বুর্জোয়ার বৈপ্লবিক উচ্ছেদ আর প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা জয়ের অখণ্ড ও সুসমঞ্জস মতবাদ হিশেবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দেখান যে সমাজতন্ত্র স্বপ্নজীবীর কল্পনা নয়, পুঁজির ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকদের সংগ্রামের আবশ্যিক পরিণাম। বিজ্ঞান হিশেবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল এ সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের অবস্থানের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি এবং প্রলেতারিয়েতের মুক্তির শর্তগুলির সাধারণীকরণ।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম সমাজতন্ত্রকে স্বপ্ন থেকে পরিণত করেন প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা, পথ ও রূপ বিষয়ে সত্যকার বিজ্ঞানে। উনিশ শতকের ৪০-এর দশকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উদ্ভবে সাহায্য করে দুটি মহান আবিষ্কার। তা হল ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ আর বাড়তি মূল্যের তত্ত্ব, যা উদ্‌ঘাটিত করে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের গুপ্ত রহস্য। আর তার অর্থ বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল মার্কস ও এঙ্গেলসের

দার্শনিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের নিয়মসঙ্গত ও আবশ্যিক অনুবর্তন ও বিকাশ।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ সংরচন প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখান যে পুঁজিতন্ত্রের আপোসহীন বিরোধের সমাধান হতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যা বুর্জোয়ার আধিপত্য নিশ্চিহ্ন করবে। যে সামাজিক শক্তির কাজ পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন তা হল শ্রমিক শ্রেণী। মার্কস ও এঙ্গেলসের বিরাট কীর্তি হল প্রলেতারিয়েতের পক্ষে নিজেদের স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির আবশ্যিকতা প্রতিপাদন। এ পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য মেহনতিদের সংগ্রামের পরিচালক।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের মতবাদ সপ্রমাণ করেন। এই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা বৈপ্লবিক উৎক্রমণ পর্বের আবশ্যিকতার প্রতিপাদ্য বিকশিত করেন তাঁরা এবং কমিউনিস্ট সমাজের একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা দেন।

লেনিনের নাম জড়িত বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব বিকাশের নতুন পর্যায়ের সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বৈপ্লবিক জনগণের অতি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেনিন মার্কসবাদকে বিকশিত করেন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকা

শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তার পরিবিকাশের পথ সম্পর্কে, পঁুজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্বে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কে, কৃষি ও জাতীয় সমস্যার সমাধানের পথ সম্পর্কে, নতুন ধরনের প্রলেতারীয় পার্টির নেতৃভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের ধারণাগুলি হল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের বিকাশে অতি সমৃদ্ধ অবদান।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের বিকাশ এগিয়ে চলেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির এবং অন্যান্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির তাত্ত্বিক কার্যকলাপে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের বিষয়বস্তু

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়মবদ্ধতার, সমগ্রভাবে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান।

তাই বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব অধ্যয়ন ও প্রতিপাদন করে:

— পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস ও কমিউনিজমের বিজয়ের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা;

— পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমাজতান্ত্রিকে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত ও পরিস্থিতি;

— শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক ব্রত, বৈপ্লবিক

সংগ্রামে তদ্দ্বারা পরিচালিত অপ্রলেতারীয় জনগণের স্থান ও ভূমিকা;

— প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়মবদ্ধতা, পথ ও রূপ;

— প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ও কর্তব্য;

— সমাজতন্ত্র বিকাশের নিয়মবদ্ধতা ও পথ;

— বর্তমান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভূমিকা;

— মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশলের মূলগত ধারা ও নীতি।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের পার্থক্য এই যে তা সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের নিয়মবদ্ধতা অধ্যয়ন করে না, পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে পরিপক্ক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত সমেত কেবল কমিউনিস্ট ব্যবস্থা নিয়েই গবেষণা করে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম একটা আন্তর্জাতিক মতবাদ। সর্বাগ্রে তার কারণ, যাদের স্বার্থ ও আদর্শ তা প্রকাশ ও রক্ষা করে সেই শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্র আন্তর্জাতিক। এ মতবাদ আলাদা একটা দেশের নয়, সমস্ত দেশ ও জাতির, সমগ্র বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ শতাধিক বছর ধরে চালিত হয়ে আসছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের বুনিয়াদি সিদ্ধান্ত আর বক্তব্য দ্বারা, সেগুলির ভিত্তিতে স্থির করে নিজেদের রণনীতি আর

রণকৌশল। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম বিকশিত হয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, তার অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের গবেষণার ভিত্তিতে থাকে সামাজিক জীবন বিষয়ে প্রজ্ঞানের বস্তুবাদী তত্ত্ব এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের মৌল কর্তব্যগুলি সমাধানের গতিপথে যেসব বাস্তব বিরোধ বিদ্যমান ও দেখা দেয়, তা সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত পথ নির্ণয় করা সম্ভব হয় তাতে।

প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের যে অভিজ্ঞতা সেগুলির যুক্তিসিদ্ধ সাধারণীকরণের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম সেই সঙ্গে কঠোরভাবে ঐতিহাসিকতার অবস্থান নেয়। লেনিন বলেছেন, 'সমাজবিদ্যার প্রশ্নে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হল... মূলগত ঐতিহাসিক যোগাযোগটা না ভোলা, নির্দিষ্ট ঘটনাটি কিভাবে ইতিহাসে দেখা দিল, নিজের বিকাশে সে ঘটনা কী কী প্রধান পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এসেছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি প্রশ্নকে দেখা এবং বিকাশের এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নির্দিষ্ট ব্যাপারটা বর্তমানে কী দাঁড়িয়েছে।'*

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম একটা সৃজনশীল মতবাদ।

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৬৭।

তার গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল জীবনের সঙ্গে, সমাজের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ও সমস্ত মেহনতীদের সংগ্রামের বাস্তবতার সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ। জীবন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বও বিকশিত ও সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক ব্রত

প্রলেতারিয়েত — বুর্জোয়ার সমাধিখনক

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রচুর বাস্তব তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সব দিক থেকে দেখান যে পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস আর কমিউনিজমের বিজয় অনিবার্য। প্রলেতারিয়েতের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে সক্ষম। এই মহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি রয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কেন্দ্রস্থলে। লেনিন মন্তব্য করেন, 'মার্কসের মতবাদের প্রধান কথা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা হিশেবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকার ব্যাখ্যা।'*

মার্কসবাদের গুরুরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে পুঁজিতন্ত্রের গর্ভেই রয়েছে তার ধ্বংসের বীজ। যেমন, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে' বলা হয়েছে যে বুর্জোয়া কেবল তার মৃত্যুবহ অস্ত্রই পিটিয়ে তোলে নি, এমন

---

* ঐ, খণ্ড ২৩, পৃঃ ১।

লোকেদেরও তারা জন্ম দিয়েছে যারা এ অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধেই ঘুরিয়ে ধরবে — আধুনিক শ্রমিক, প্রলেতারিয়েত। অন্য কথায়, প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বুর্জোয়া গড়ে তোলে নিজেদের সমাধিখনক।

পুঁজিতন্ত্রকে সমাধিস্থ করতে আহূত কেন ঠিক প্রলেতারিয়েতই? সর্বাগ্রে এই জন্য যে শ্রমিক শ্রেণী হল সবচেয়ে নিপীড়িত শ্রেণী। প্রলেতারিয়েত বলতে বোঝায় একালের মজুরি-খাটা শ্রমিক, যারা নিজস্ব উৎপাদনী উপায় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য হয়। শোষিত শ্রেণী হিশেবে প্রলেতারিয়েতের যে অবস্থান, সেটাই হল বুর্জোয়া ব্যবস্থায় তার প্রগাঢ় অসন্তোষ, ব্যাপারাদির বিদ্যমান ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন, বৈপ্লবিক পথে পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষার অবজেকটিভ কারণ। মজুরি দাসত্বের শেকল ছাড়া তার আর কিছু নেই। যেহেতু উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাই হল পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিক শোষণের ভিত্তি, তাই সে মালিকানা দূর করে তার জায়গায় সামাজিক মালিকানা স্থাপনই হল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির একমাত্র পথ।

প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও নিয়ত বর্ধমান শ্রেণী। বড়ো বড়ো উদ্যোগে কেন্দ্রীভূত হয় শ্রমিকদের বিপুল জনপুঞ্জ। একত্রে কাজ তাদের শেখায় শৃংখলা, পারস্পরিক মদৎ। সংগঠিত ভাবে, সবাই মিলে একত্রে কাজ করা শ্রমিকদের পক্ষে সহজ, অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীদের চেয়ে তারা

দ্রুত বাড়িয়ে তোলে নিজেদের চেতনা, আত্মোপলব্ধি।

এইসবের ফলে কেবল শ্রমিক শ্রেণীই শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে সমস্ত মেহনতিদের নেতৃত্ব দিতে পারে। সর্বাগ্রে তারা অবতীর্ণ হয় পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে যোদ্ধা হিশেবে। নিজেকে মুক্ত করে সে নিপীড়িত অবস্থা থেকে মুক্ত করে সমাজের অন্যান্য মেহনতি শ্রেণী ও স্তরকেও, যেমন কৃষক, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি সম্প্রদায়।

কিন্তু জাতীয় নিগড়ের বিরুদ্ধেও শ্রমিক শ্রেণী লড়ে। সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তাঁর পরিপূর্ণ সমতা ও মৈত্রীর তারা পক্ষপাতী। সেইজন্যই উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনগণ তাদের সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন লাভ করে প্রভু দেশের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। সেই সঙ্গে মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রামও দুর্বল করে সাম্রাজ্যবাদকে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম সহজ হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গুরুরা, সেটা কালক্রমে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী হল যুগের একটা পরাক্রান্ত সক্রিয় সামাজিক শক্তি যাতে কোটি কোটি লোক ঐক্যবদ্ধ। সর্বত্রই শ্রমিক শ্রেণীর পঙক্তি বর্ধমান। বিশ্বের সামাজিক উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসছে তাদের পরিশ্রমে। আগের চেয়ে বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণী আরো বেশি করে মেহনতিদের অত্যধিকাংশের সত্যকার স্বার্থের অভিব্যক্তা।

শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম

দাসপ্রথা থেকে শুরু করে যত সমাজ দেখা দিয়েছে তাদের ইতিহাস হল শ্রেণীদের মধ্যে সংগ্রাম, শোষিত ও শোষক, নিপীড়িত ও নিপীড়ক শ্রেণীদের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস। পুঁজিতন্ত্রের আমলে ইতিহাসের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয় শ্রমিক শ্রেণী যারা শোষক শ্রেণীর হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করে গোটা সমাজকেই মুক্ত করে শোষণ থেকে।

শ্রেণী আর শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বে বিপুল অবদান যোগ করেছেন কার্ল মার্কস। এ বিষয়ে নিজেই তিনি লিখেছেন: 'আমার কথা যদি ধরা হয়, তাহলে আমি নাকি আবিষ্কার করেছি যে বর্তমান সমাজে শ্রেণী আছে আর আমি নাকি আবিষ্কার করেছি তাদের মধ্যে সংগ্রাম, এর কোনোটার কৃতিত্বই আমার নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ইতিহাসবিদেরা এই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের কথা বলেছেন আর বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বলেছেন শ্রেণীর অর্থনৈতিক শারীরস্থানের কথা। নতুন আমি যা করেছি, সেটা হল নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রমাণ করা নিয়ে: ১) **শ্রেণীর অস্তিত্ব** জড়িত কেবল **উৎপাদন বিকাশের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়গুলির সঙ্গে**, ২) শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্যই পৌঁছয় **প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে**, ৩) এই একনায়কত্ব নিজেই কেবল **সর্ববিধ শ্রেণীর বিলোপ** এবং **শ্রেণীহীন সমাজে** উত্তরণের পর্ব।'*

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৪২৪-৪২৭।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম বুর্জোয়া সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। তা চলে তিনটি প্রধান ধারায়: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয়।

প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রাম হল বেতন বৃদ্ধি, শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য হ্রাস, শ্রমের পরিস্থিতি উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা আর পেনশনের জন্য, উৎপাদন পরিচালনায় অংশ গ্রহণের জন্য সংগ্রাম। স্বভাবতই, এই প্রয়াস তার মর্মার্থের দিক থেকে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে চালিত। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান খুঁটিগুলিকে তা নাড়িয়ে দেয়, তার অস্থায়িত্ব ঘটায় ও প্রবল করে, সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন — শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রধান কর্তব্য পালনের জন্য জমি তৈরি করে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মেহনতিদের শ্রেণী-সংগ্রাম নতুন পর্যায়ে উঠছে। বাড়ছে তার দাবি। এটা সংশ্লিষ্ট এগুলির সঙ্গে:

— জাতীয় অর্থনীতি সামরীকরণের সর্বনাশা পরিণাম, যাতে তীব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির, সর্বাগ্রে বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, সামাজিক নিশ্চয়তায় সংকটের সমাধানে বাধা হচ্ছে;

— মেহনতিদের অর্থনৈতিক অর্জন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর শাসক মহলের ব্যাপক আক্রমণ প্রতিরোধের আবশ্যকতা;

— অর্থনৈতিক সংগ্রামের চরিত্রে অবজেকটিভ পরিবর্তন, এ সংগ্রাম এক-একটা উদ্যোগ, কোম্পানি,

শাখার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সমগ্র রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাত্রায় উঠছে;

— প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীচেতনার বৃদ্ধি।

রাজনৈতিক সংগ্রাম হল বুর্জোয়ার ক্ষমতা আর তার জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য, শোষণ উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় মেহনতিরা যে দাবি পেশ করে, তাতে ক্রমেই দেখা দিতে থাকে ব্যাপক, রাজনৈতিক তাৎপর্য। রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য — বুর্জোয়ার শ্রেণী আধিপত্য বিলোপ এবং কোনো না কোনো রূপে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা।

রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ বহুবিধ: রাজনৈতিক মিছিল ও ধর্মঘট, রাষ্ট্রীয় সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ অথবা বয়কট, পার্লামেণ্ট ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার, এবং শেষত ক্ষমতার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম। রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিরা, তাদের কাজ প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামকে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় পর্যবসিত করা।

ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম হল বুর্জোয়ার আত্মিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী যে ভাবাদর্শ মেহনতিদের স্বার্থের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি সেটা তাদের চেতনায় সঞ্চারের জন্য সংগ্রাম। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন আপনা থেকে অগ্রণী সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ গড়ে তুলতে পারে না। শ্রমিক আন্দোলনে তা নিয়ে আসে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। পার্টি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের

তত্ত্ব। এবং তাতে করে প্রলেতারিয়েতের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামকে পরিণত করে সচেতন ও বিজয়ী সংগ্রামে।

বর্তমান দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আর বুর্জোয়া এই দুটি বিরোধী ভাবাদর্শের মধ্যে চলছে নির্মম সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আত্মিক জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি — নতুন ধরনের পার্টি

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমাজতান্ত্রিকে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য প্রলেতারিয়েতের দরকার স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি। তেমন পার্টি হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। সেটা হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী অর্থাৎ তার প্রাগ্রসর সচেতন অংশ। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে তা, সবচেয়ে পূর্ণাকারে ও যথাযথরূপে প্রলেতারিয়েতের প্রয়াস ব্যক্ত করে।

এঙ্গেলস এই কথায় জোর দিয়েছেন, 'নির্ধারক মুহূর্তে প্রলেতারিয়েত যাতে যথেষ্ট শক্তিশালী থাকতে এবং বিজয় লাভ করতে পারে, তার জন্য দরকার — মার্কস ও আমি ১৮৪৭ সালে এই বক্তব্য সমর্থন করি — সে যেন অন্য সমস্ত এবং তাদের বিরুদ্ধ পার্টি থেকে আলাদা একটা নিজেদের পার্টি গঠন করে, যা নিজেকে শ্রেণী পার্টি বলে জানে।' তিনি

আরো বলেছেন, প্রলেতারীয় পার্টির শ্রেণীর দিক থেকে সুদৃঢ় পলিসি হল এই যে যেকোনো রাজনৈতিক ক্রিয়ায় নামা যাবে কেবল 'এই শর্তে যে তাতে পার্টির প্রলেতারীয় চরিত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠছে না।'* এক কথায়, নিজের শ্রেণী চরিত্রে সচেতন এবং সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির বিরোধী প্রলেতারীয় পার্টি ছাড়া বিপ্লব বিজয় লাভও করবে না, সমাজতন্ত্রও হবে না।

বৈপ্লবিক তত্ত্বে সশস্ত্র, শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিশেবে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর অন্য সমস্ত সংগঠন প্রসঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীদের শক্তি তা ঐক্যবদ্ধ করে, তাকে চালায় একই লক্ষ্যে — পুরনো শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ আর নতুন সমাজ নির্মাণে।

শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সত্যকার বৈপ্লবিক পার্টি, নতুন ধরনের পার্টি গড়া হয় রাশিয়ায়। লেনিনীয় পার্টি হয়ে দাঁড়াল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও নতুন সমাজ গঠনের নেতা।

নতুন ধরনের পার্টির চারিত্রিক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা:

— মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদে চালিত এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে তাকে বিকশিত করে, বৈপ্লবিক

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩৭, পৃঃ ২৭৫।

তত্ত্ব ও বৈপ্লবিক প্রয়োগের মধ্যে আঙ্গিক ঐক্য নিশ্চিত করে;

— তা শ্রমিক শ্রেণীর যৌথ রাজনৈতিক নেতা, তার সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ, সমস্ত মেহনতির অগ্রবাহিনী; জনগণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ হল তার অফুরান শক্তির উৎস;

— তার কাজ চালায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে, অক্লান্তভাবে নিজ পঙক্তির ভাবাদর্শীয় ও সাংগঠনিক ঐক্য, সচেতন শৃঙ্খলা সংহত করে, পার্টি সদস্যদের সক্রিয়তা বাড়িয়ে চলে;

— যেকোনো ধরনের গোষ্ঠীবাদ আর জোট, শোধনবাদ, সুবিধাবাদ ও গোঁড়ামির প্রতি আপোসহীন;

— নিজেদের বৈপ্লবিক, রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপ, নিজেদের রাজনীতির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করে, অবিরাম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিচার, মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহার করে;

— সঙ্গতির সঙ্গে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি কার্যকৃত করে।

নতুন ধরনের পার্টির ঐতিহাসিক ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়েছে সামাজিক বাস্তবতার পক্ষে সম্ভবপর সবচেয়ে জটিল ও কঠোর পরীক্ষায়। প্রমাণিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্যতা

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল শ্রেণী সমাজের ইতিহাসে সবচেয়ে সুগভীর ওলটপালট, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উপায়। এটা হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে মেহনতিদের শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায়। ইতিহাসের দিক থেকে তা অনিবার্য, কেননা তা আসছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতা থেকে এবং তা সাধন করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীকে পুরোভাগে নিয়ে বৈপ্লবিক মেহনতি জনগণ।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ও অমোঘতা অবজেকটিভ, বাস্তব কারণগুলির দ্বারাই নির্দেশিত। সর্বাগ্রে এটা হল উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর মালিকানার পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত। সমাজের উৎপাদনী শক্তির বিপুল বৃদ্ধি ক্রমেই বেশি করে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধে আসছে। এ বিরোধ থেকে বেরবার পথ একটাই — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয় শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীগণ কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ে, বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রভুত্বের যা বনিয়াদি অস্ত্র সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা

মারফত। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মতবাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লেনিনীয় তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল, এই সাধারণ সিদ্ধান্ত টেনে, যে-অবজেকটিভ পরিস্থিতিতে সে বিপ্লব হয়ে দাঁড়ায় সম্ভবপর এবং আবশ্যক তার সর্বাঙ্গীণ বিচার করে লেনিন তার একটা বিবরণ দিয়েছেন। তিনি দেখান যে বিপ্লব তৈরি অবস্থায় জন্মায় না, কৃত্রিমভাবে তা ঘটানো বা অন্য দেশ থেকে আমদানি করা চলে না। বিপ্লবী গ্রুপদের ইচ্ছা অনুসারে 'যখন খুশি', 'যেখানে খুশি' বিপ্লব বাধানো যায় না। সমাজের গর্ভে তাকে পরিপক্ব হতে হবে। বিপ্লবের যে অবজেকটিভ শর্ত গড়ে ওঠে ব্যক্তি আর পার্টির ইচ্ছার ওপর নির্ভর না করে, তাকে তিনি বলেছেন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণ কী কী? এ প্রশ্নের উত্তরে লেনিন তিনটি প্রধান লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন: ১) প্রভু শ্রেণীদের পক্ষে নিজেদের আধিপত্য অপরিবর্তিত রূপে বজায় রাখার অসম্ভাব্যতা; 'ওপরতলার' সংকট, অর্থাৎ অধিপতি শ্রেণীর রাজনীতিতে সংকট, যাতে এমন ফাটল ঘটে যার ভেতর দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির অসন্তোষ আর বিক্ষোভ ফেটে বেরয়। বিপ্লব ঘটতে হলে, সাধারণত 'নিচু তলা চাইছে না' শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, আরো দরকার যে আগের মত থাকতে 'উপরতলাও পারছে না'।

২) সাধারণ মাত্রার চেয়ে নিপীড়িত শ্রেণীদের অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের অত্যধিক বৃদ্ধি। ৩) উপরোক্ত কারণগুলির জন্য যে জনগণ 'শান্তিপূর্ণ' কালে শান্তভাবে নিজেদের লুঠ হতে দিয়েছে কিন্তু ঝোড়ো যুগে যেমন সংকটের গোটা পরিস্থিতি দ্বারা, তেমনি খোদ ওপরতলার দ্বারা স্বাধীন ঐতিহাসিক অভিযানে আকৃষ্ট হচ্ছে, তাদের সক্রিয়তা।*

কিন্তু অবজেকটিভ পরিস্থিতি আপনা থেকেই বিপ্লবে পরিবিকশিত হয় না। তার জন্য দরকার বিপ্লবী শ্রেণী যেন গণ বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সক্ষম থাকে; পার্টি যেন জনগণকে ঘনবদ্ধ করে তুলতে পারে; বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট মুহূর্তটি যেন সঠিক ভাবে নির্বাচিত হয় এবং বিজয় পর্যন্ত অভ্যুত্থান চালিয়ে যাওয়া হয়। বিপ্লব শুধু একটা বিজ্ঞান নয়, শিল্পকলাও। বিপ্লবের বিজয়ের জন্য প্রয়োজন অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ শর্তের ঐক্য যা রূপ নিচ্ছে সাধারণ জাতীয় সংকটে। এই হল বিপ্লবের বনিয়াদি নিয়ম।

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে দুর্বল গ্রন্থির সূত্রায়ণ করেন লেনিন, যে গ্রন্থিতে বিরোধগুলি সবচেয়ে তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে, যেখানে প্রলেতারিয়েত আর তার সহযোগীদের শক্তি সবচেয়ে সুদৃঢ়। গ্রন্থি-সদৃশ এইসব দেশে বিপ্লব পেকে ওঠে তাড়াতাড়ি।

---

* দ্রঃ লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৬, পৃঃ ২১৮।

বিপ্লবের চালিকা শক্তি

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি ও নেতা হল শ্রমিক শ্রেণী। পুঁজিতন্ত্রে শ্রমের হাড়ভাঙা পরিস্থিতি আর দুঃসহ জীবনযাত্রা তাদের মধ্যে সঞ্চার করে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, সংগঠনশীলতা, একাত্মতা অর্থাৎ সেইসব বৈপ্লবিক গুণ যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্য আবশ্যক। যেকোনো পুঁজিতান্ত্রিক দেশে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক ভূমিকা মোট জনসংখ্যায় তাদের অংশের তুলনায় অপরিমেয় বেশি। তার কারণ পুঁজিতন্ত্রে প্রলেতারিয়েতই প্রধান উৎপাদনী শক্তি, এবং আরো এই কারণে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সে প্রকাশ করে মেহনতি জনের বিপুল অধিকাংশের সত্যকার স্বার্থ।

সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী নিঃসঙ্গ নয়। নতুন সমাজ ব্যবস্থার বিজয়ে মেহনতিদের অন্যান্য সামাজিক গ্রুপও প্রগাঢ় আগ্রহী — যেমন, কৃষক, মধ্য স্তর, নিপীড়িত জাতিসত্তা।

বিশ শতকের সমস্ত বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর লেনিনীয় তত্ত্বের সঠিকতা। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যেখানে কৃষকেরা উত্থিত হয়েছে সংগ্রামে, বিপ্লবের একেবারে গোড়া থেকেই যেখানে প্রলেতারিয়েতের মুখ্য ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে রূপ নিয়েছে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের জোট এবং বিপ্লবের গতিপথে তা সুদৃঢ় হয়েছে, সেখানে নিশ্চিত হয়েছে বিজয়। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা

যেসব দেশে অধিবাসীদের বেশির ভাগই কৃষক, সেখানে সহযোগী ছাড়া কেবল একলা সংখ্যাল্প শ্রমিক শ্রেণীর অভিযানে বিজয় লাভ সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাশিয়ায় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে রুশ প্রলেতারিয়েত একটু একটু করে ক্রমাগত বুর্জোয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে কৃষকদের, তাদের পরিণত করেছে নিজেদের সহযোগীতে, আর কৃষকেরাও তাদের দিক থেকে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে কেবল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে জোট বেঁধেই তারা সাফল্য লাভ করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে শান্তিপূর্ণ অথবা অশান্তিপূর্ণ। সেটা নির্ভর করে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, বুর্জোয়ার সশস্ত্র প্রতিরোধের ওপর। বলাই বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শান্তিপূর্ণ চরিত্র ধারণ করলে সে তো ভালোই হত। কিন্তু পুঁজিপতিরা বিনা যুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতা ছাড়ে না, তাই প্রলেতারিয়েত বাধ্য হয় বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখল করতে, সশস্ত্র পথও তার অন্যতম।

বিদ্যমান রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোনো কোনো শ্রেণীর, সামাজিক শক্তির অস্ত্র হাতে খোলাখুলি অভিযান-রূপ সশস্ত্র অভিযানের প্রশ্নে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গুরুরা। সেটাকে তাঁরা দেখেছেন একটা শিল্পকলা হিশেবে যা নিম্নোক্ত নিয়মাধীন:

— অবজেকটিভ ক্ষেত্রে পেকে না ওঠা পর্যন্ত অভ্যুত্থান শুরু করা অনুচিত;

— নির্ধারক ক্ষেত্রে ও নির্ধারক মুহূর্তে শক্তির

রীতিমতো ভারাধিক্য অর্জন করা উচিত, নইলে উত্তম প্রস্তুতি ও সংগঠন থাকায় শত্রু অভ্যুত্থানীদের নিশ্চিহ্ন করবে;

— অভ্যুত্থান একবার শুরু করলে প্রচণ্ড দৃঢ়সংকল্পে কাজ করতে হবে এবং অবশ্য-অবশ্যই চলে যেতে হবে আক্রমণে, প্রতিরক্ষা হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু;

— প্রতিদিন অন্তত সামান্য হলেও সাফল্য অর্জন করতে হবে, শ্রেষ্ঠত্ব রাখতে হবে মনোবলে।

অনুকূল পরিস্থিতিতে কোনো কোনো দেশে শ্রমিক শ্রেণী অপ্রলেতারীয় লোকেদের সঙ্গে জোট বেঁধে ব্যাপক গণসংগ্রামের পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করতে পারে শান্তিপূর্ণ উপায়েও। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে দেশে নির্দিষ্ট একটা ন্যূনতম মাত্রায় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব, যাতে শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীদের সংগঠন ও ঐক্যের পক্ষে ব্যাপকতর সুযোগ দেখা দেয়।

অন্যান্য বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য কিসে?

অন্য সমস্ত সামাজিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একেবারে অন্যরকম। আগেকার বিপ্লবগুলিতে এসেছে কেবল এক ধরনের শোষণের জায়গায় অন্য ধরনের শোষণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পুরোপুরি

বিলুপ্ত হয় শোষণ এবং শুরু হয় লোকেদের সত্যকার ভ্রাতৃত্ব ও সমতার যুগ।

বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিতে মেহনতি জনগণ সক্রিয় অংশ নিলেও প্রধান ভূমিকা নেয় নি, বিপ্লবের ফলাফল প্রতারণা করেছে তাদের, কেননা শোষণের সামন্ততান্ত্রিক রূপের বদলে আসে পুঁজিতান্ত্রিক রূপ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের প্রেরণাদাতা ও নেতা। প্রলেতারীয় বিপ্লব হল খোদ মেহনতি জনগণেরই বিপ্লব। এ বিপ্লব তারা সম্পূর্ণ করে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য।

বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ, তা পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে বাধা দিচ্ছিল। তবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক নিজেই উদ্ভূত ও বিকশিত হয় সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই। সেটা সম্ভব হয় কারণ বুর্জোয়া আর সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা হল কেবল ব্যক্তিগত মালিকানারই দুই রূপ মাত্র।

পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর ভেতরে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের জন্ম হতে পারে না। তার উদ্ভব হয় শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরে যখন কল, কারখানা, ব্যাংক, পরিবহণ ইত্যাদির ওপর পুঁজিপতিদের মালিকানা নাকচ করে সেগুলির জাতীয়করণ মারফৎ প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। শুধু তাই নয়, সমাজতন্ত্রে উঠে আসতে হলে জনগণের অর্থনৈতিক জীবন সংগঠিত করতে হয় নতুন ভাবে। সমাজতন্ত্রের নীতিতে পুনর্গঠিত করা

দরকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, কেবল অর্থনীতি, রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতি, লালনপালন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সমাধান করতে হয় জটিল সমস্যার।

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। আগে, অন্যান্য বিপ্লবে নতুন শ্রেণীটি ক্ষমতা দখল করে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী এ পথে যেতে পারে না, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগাতে পারে না, কেননা সে যন্ত্রের প্রধান কাজ হল মেহনতিদেরকে পুঁজিপতিদের অধীনে রাখা। সেইজন্যই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করতে হয়, গড়ে তুলতে হয় নতুন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

অতএব বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূলগত পার্থক্য হল এই:

প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হল উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজিক মালিকানায় পরিণত করে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ অবলুপ্ত করা আর বুর্জোয়া বিপ্লবে আসে সামন্ততান্ত্রিকের স্থলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানা আর পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে জন্মায় না, আর পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানা বাঁধে এবং

একটা ব্যবস্থা হিশেবে বিকশিত হয় সামন্ততন্ত্রের গর্ভেই।

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয় ক্ষমতা দখল করে, ওদিকে ক্ষমতা দখল করেই শেষ হয় বুর্জোয়া বিপ্লব।

বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা এবং রূপের বৈচিত্র্য

উত্তরণ পর্বের মূলকথা

আগেই যা বলেছি, পুঁজিতন্ত্র নিজেই সৃষ্টি করে তার সমাধিখনক প্রলেতারিয়েতকে, নিজেই গড়ে তোলে নতুন ব্যবস্থার উপাদান। কিন্তু প্রলেতারীয় বিপ্লব ছাড়া বিভিন্ন এইসব উপাদানে সাধারণ অবস্থা বদলায় না, পুঁজির প্রভুত্বকে তা স্পর্শ করে না। কেবল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয় এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাতেই শুরু হয় সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক এবং আত্মিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন।

অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতা হল এই যে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য প্রতিটি দেশের প্রয়োজন বিশেষ একটা উৎক্রমণ পর্ব। এই পর্বটা এড়িয়ে যাওয়া, লাফিয়ে যাওয়া চলে না, এমনকি সমাজতন্ত্রের সমস্ত বৈষয়িক পূর্বশর্ত পেকে উঠলেও। মার্কস লিখেছেন যে

পুঁজিতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে আছে এক থেকে অপরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের একটা পর্ব। এই পর্বের রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গুরুরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ ঘটবে অবজেকটিভ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তিনটি ঐতিহাসিক নিয়মবদ্ধ পর্যায় দিয়ে: ১) উৎক্রমণ পর্যায়। ২) সমাজতন্ত্রের পর্যায়। ৩) কমিউনিজমের পর্যায়।

উৎক্রমণ পর্যায় প্রয়োজনীয় কেননা পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক তৈরি অবস্থায় উদ্ভূত হয় না। তা গড়তে হলে পুরো একটা ঐতিহাসিক যুগের দরকার (উৎক্রমণ পর্বের দৈর্ঘ্য নানা দেশে নানা রকমের হতে পারে), যার ভেতরে গড়া হয় নতুন সামাজিক সম্পর্ক, শেষ শোষক শ্রেণীর এবং মানুষ কর্তৃক সর্ববিধ মানুষ শোষণের উচ্ছেদ হয়, স্থাপিত হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। এই সবকিছু তৎক্ষণাৎ, এক ধাক্কায় করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট লম্বা একটা ঐতিহাসিক পর্ব।

উৎক্রমণ পর্বের জটিল কর্তব্যগুলি সাধিত হয় 'কে কাকে শেষ করবে' এই নীতিতে সমাজতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের পরিস্থিতিতে। দুই বর্ষব্যাপী সোভিয়েত ক্ষমতার সাধারণীকরণ প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন: 'এই উৎক্রমণ পর্ব মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্র আর জায়মান কমিউনিজমের মধ্যে ;—

অথবা অন্য কথায়, পরাজিত কিন্তু এখনো যা নিশ্চিহ্ন নয় সেই পুঁজিতন্ত্র আর জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এখনো দুর্বল, সেই কমিউনিজমের মধ্যে সংগ্রামের পর্ব না হয়ে পারে না।'*

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্ব শুরু হয় প্রলেতারিয়েত কর্তৃক নিজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনে আর শেষ হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠন এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলির চূড়ান্ত বিলুপ্তিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎক্রমণ পর্বটা চলেছিল ১৯১৭ সালে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের শুরু থেকে ৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত। প্রাগ্‌বিপ্লব রাশিয়া থেকে পাওয়া অর্থনৈতিক, টেকনিকাল ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের রীতিমতো প্রাবল্য আর সেই সঙ্গে রাশিয়া যে তখন ছিল একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ, এইসব কারণে উৎক্রমণ পর্বের বেশ দীর্ঘকালীনতা ছিল অপরিহার্য।

ইউরোপের অন্য একসারি সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে উৎক্রমণ পর্বটা হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্পস্থায়ী। তা নির্ভর করেছে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের মান, উৎপাদনী উপায়ের সামাজীকরণের মাত্রা, শ্রেণী শক্তির অনুপাত, জাতীয় ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর।

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খন্ড ৩৯, পৃঃ ২৭১।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণশীল যেকোনো দেশেই কাজ করে উৎক্রমণ পর্বের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা আর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ নিয়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে: শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান ভূমিকাধীন মেহনতিদের ক্ষমতা; বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শে সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সামাজিক বিকাশের পরিচালনা; উৎপাদনের বনিয়াদি উপায়গুলির ওপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিত্তিতে জনগণের স্বার্থে অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ; 'প্রত্যেকের কাজ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার পরিশ্রম অনুসারে' — এই নীতির রূপায়ণ; সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ; সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার সমাধিকার ও মৈত্রী; শ্রেণী শত্রুর হামলা থেকে বিপ্লবের সুকৃতি রক্ষা।

আত্মিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা হল সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন যাতে বোঝায় সর্বজনীন শিক্ষা, সমাজতন্ত্রের আদর্শে একনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী গঠন, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা।

অবজেকটিভ ক্ষেত্রে আবশ্যিক হওয়ার পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা এক-একটা দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রকাশ পায় ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট রূপে। বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতি সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতার ক্রিয়ায় রূপভেদ ঘটায়, সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের বিষয়বস্তু, রূপ ও গতিবেগে নির্দিষ্ট ছাপ ফেলে। লেনিন লিখেছেন, 'সমস্ত জাতিই সমাজতন্ত্রে পেঁছবে, সেটা

অনিবার্য, কিন্তু সবাই পেঁছবে একইভাবে নয়, গণতন্ত্রের কোনো কোনো রূপে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের কোনো কোনো রূপে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কোনো কোনো গতিবেগে প্রত্যেকেই আনবে স্বকীয়তা।'*

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যে সাধারণ নিয়মবদ্ধতা আবিষ্কার করেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের, বাস্তব সমাজতন্ত্রের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায়, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সংগ্রামের বাস্তবতা ও সমাজতান্ত্রিক সৃজনে যা সমর্থিত হয়েছে, তা এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে যাবার কোনো পথ নেই, থাকতে পারে না, যেমন প্রতিটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীন হিশেব না নিয়েও সে পথে সাফল্যের সঙ্গে এগুনো অসম্ভব।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল বিষয়বস্তু হল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ করে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব — প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রশ্নটা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের একটা প্রধান কথা — প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়া কমিউনিজম নির্মাণ

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩০, পৃঃ ১২৩।

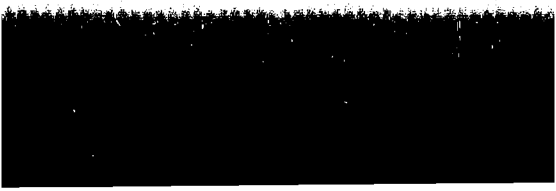

অসম্ভব। এঙ্গেলস লিখেছেন যে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল 'সেই একমাত্র অস্ত্র যার সাহায্যে বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণী সদ্যোর্জিত ক্ষমতা চালু করতে, শত্রুদের — পুঁজিপতিদের দমন করতে এবং সমাজের সেই অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ঘটাতে পারে যা ব্যতীত গোটা বিজয়টাই শেষ হবে অনিবার্য পরাজয়ে আর শ্রমিকদের ব্যাপক হত্যাকান্ডে, যা ঘটেছিল প্যারিস কমিউনের পরে।'*

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল শোষকদের প্রতিরোধ দমন ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে সমস্ত মেহনতি জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে প্রতিষ্ঠেয় শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা।

উৎক্রমণ পর্বে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মৌল কর্তব্য হল:

— উৎখাত শোষক শ্রেণীদের প্রতিরোধ দমন;

— অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন চালানো এবং মেহনতি জনগণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়ন;

— সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি জনগণকে আকর্ষণ, প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের মধ্যে জোটের সংহতি;

— বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে পিতৃভূমি রক্ষা, অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৯।

সংহতি বৃদ্ধি, শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য সংগ্রাম, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য।

ক্ষমতায় এসে শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত মেহনতিদের সঙ্গে জোট বেঁধে নতুন সমাজ গঠন শুরু করে। তার ক্ষিপ্ত প্রতিরোধ করে উৎখাত শোষক শ্রেণীগুলি। তাই প্রলেতারীয় একনায়কত্বের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল শোষক শ্রেণীগুলিকে দমন। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল নতুন পরিস্থিতিতে ও নতুন রূপে শ্রেণী-সংগ্রামের অনুবর্তন।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যে নেহাৎ একটা বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা, এমন ধারণা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অগ্রাহ্য। লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন: '...বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগ ছিল বিপ্লবের একটা আবশ্যিক ও নিয়মসঙ্গত পদ্ধতি কেবল তার বিকাশের সুনির্দিষ্ট মুহূর্তগুলিতেই, কেবল সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ পরিস্থিতি থাকাতে...'* শোষকদের প্রতিরোধ দমনের যে কর্তব্য তার সঙ্গে সঙ্গে 'তেমনি অপরিহার্য রূপে সামনে আসে — এবং যত দিন যায় ততই বেশি করে — গঠনমূলক কমিউনিস্ট নির্মাণের, নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক, নতুন সমাজের বিজয়ের আরো তাৎপর্যপূর্ণ কর্তব্য।'**

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নতুন ধরনের গণতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৮, পৃঃ ৭৪।

** ঐ. খণ্ড ৩৯, পৃঃ ১৩।

হয় অল্পাংশের ওপর অত্যধিকাংশের ক্ষমতা। এইভাবে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কার্যক্ষেত্রে মেহনতিদের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগের সম্ভাবনা নিশ্চিত করে।

সমাজতন্ত্রের শত্রুরা একনায়কত্ব আর গণতন্ত্রকে পরস্পরবিরোধী বলে দেখাতে চায়। তাদের কথায়, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল গণতন্ত্রের নাকচ, লোকেদের ওপর বলপ্রয়োগ। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র কর্তৃক শোষকদের গণতন্ত্র সীমিত করাকে* তারা ভাবে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। একই সময়ে তারা বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষক হিশেবে অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের ভাবে 'বিশুদ্ধ', 'পরিপূর্ণ' গণতন্ত্রের, যেন-বা সকলের জন্য গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু বিপরীত স্বার্থ নিয়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'শ্রেণী-ঊর্ধ্ব', 'পরিপূর্ণ', 'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্র নেই, থাকতে পারে না, যেমন নেই, থাকতে পারে না শোষক ও শোষিতদের মধ্যে সমতা। গোটা প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই: কোন শ্রেণীর জন্য গণতন্ত্র রয়েছে, কোন শ্রেণী কার ওপর একনায়কত্ব চালু করছে অর্থাৎ ক্ষমতা রয়েছে কার হাতে এবং কাদের স্বার্থে তা হাসিল হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কার্যকৃত হয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও গণসংগঠনাদির (পার্টি, সোভিয়েত, ট্রেড-ইউনিয়ন, কমসোমল ইত্যাদি) সাহায্যে। এইসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ব্যবস্থা।

কমিউনিস্টদের পার্টি প্রলেতারীয় একনায়কত্বের

সংযোজক, নির্ধারক শক্তি। মেহনতিদের অন্যান্য সংগঠনের ক্রিয়াকলাপে তা নেতৃত্ব দেয়, সেগুলিকে চালিত করে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে। লেনিন মন্তব্য করেছেন, '...কমিউনিস্ট পার্টির মধ্য দিয়ে ছাড়া অন্যভাবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অসম্ভব।'* সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারার জন্য বৈপ্লবিক তত্ত্বের ওপর দখল থাকা চাই পার্টির, নিবিড়ভাবে জড়িত থাকতে হবে জনগণের সঙ্গে। তার কাজ জনগণকে শেখানো আর তাদের কাছ থেকে শেখা, কঠোর ভাবে নিজেদের পঙক্তির ভাবাদর্শীয় বিশুদ্ধতা ও ঐক্য রক্ষা করা। সমাজতন্ত্র নির্মাণের গতিপথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ভূমিকা অবিচলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিভিন্ন দেশে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব আবির্ভূত হয় বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা রূপলাভ করেছে সোভিয়েতে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে — জনগণতন্ত্রের সংস্থাদিতে। শ্রেণীগত চরিত্র, নিজেদের কর্তব্য ও কর্মনির্বাহের দিক থেকে এগুলি একই প্রকার। পার্থক্য প্রকাশ পায় কেবল সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিশেষ রূপ হিশেবে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির স্বকীয়তা প্রকাশ পায় এইগুলিতে: কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪৩, পৃঃ ৪২।

সঙ্গে অন্যান্য পার্টিও আছে যারা সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থে দেশ শাসনে অংশ নেয়। বেশ কিছু রাষ্ট্রে গড়া হয়েছে জন ফ্রন্ট। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও তাতে আছে অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি, ট্রেড-ইউনিয়ন, সমবায় সংগঠন, যুব লীগ।

সোভিয়েতগুলির অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জনগণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির পক্ষে প্রভূত গুরুত্ব ধরে। ভবিষ্যৎ বিপ্লবগুলিও পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আরো নতুন নতুন রাজনৈতিক রূপের নমুনা দেখাতে পারে। এই রূপগুলি যতই বিভিন্ন হোক না কেন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অবধারিত পরিস্থিতি, অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সার-বিবরণীতে বলা হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, নতুন সমাজ নির্মাণ একটা জটিল ও দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া, এবং সর্বাগ্রে, নেতৃত্বে দণ্ডায়মান কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ওপর, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধরনে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সমস্যাদি সমাধানে তাদের সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করে নতুন ব্যবস্থায় উন্মোচনীয় বিপুল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার।

সংযোজক, নির্ধারক শক্তি। মেহনতিদের অন্যান্য সংগঠনের ক্রিয়াকলাপে তা নেতৃত্ব দেয়, সেগুলিকে চালিত করে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে। লেনিন মন্তব্য করেছেন, '...কমিউনিস্ট পার্টির মধ্য দিয়ে ছাড়া অন্যভাবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অসম্ভব।'* সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারার জন্য বৈপ্লবিক তত্ত্বের ওপর দখল থাকা চাই পার্টির, নিবিড়ভাবে জড়িত থাকতে হবে জনগণের সঙ্গে। তার কাজ জনগণকে শেখানো আর তাদের কাছ থেকে শেখা, কঠোর ভাবে নিজেদের পঙক্তির ভাবাদর্শীয় বিশুদ্ধতা ও ঐক্য রক্ষা করা। সমাজতন্ত্র নির্মাণের গতিপথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ভূমিকা অবিচলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিভিন্ন দেশে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব আবির্ভূত হয় বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা রূপলাভ করেছে সোভিয়েতে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে — জনগণতন্ত্রের সংস্থাদিতে। শ্রেণীগত চরিত্র, নিজেদের কর্তব্য ও কর্মনির্বাহের দিক থেকে এগুলি একই প্রকার। পার্থক্য প্রকাশ পায় কেবল সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিশেষ রূপ হিশেবে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির স্বকীয়তা প্রকাশ পায় এইগুলিতে: কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪৩, পৃঃ ৪২।

সঙ্গে অন্যান্য পার্টিও আছে যারা সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থে দেশ শাসনে অংশ নেয়। বেশ কিছু রাষ্ট্রে গড়া হয়েছে জন ফ্রন্ট। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও তাতে আছে অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি, ট্রেড-ইউনিয়ন, সমবায় সংগঠন, যুব লীগ।

সোভিয়েতগুলির অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জনগণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির পক্ষে প্রভূত গুরুত্ব ধরে। ভবিষ্যৎ বিপ্লবগুলিও পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আরো নতুন নতুন রাজনৈতিক রূপের নমুনা দেখাতে পারে। এই রূপগুলি যতই বিভিন্ন হোক না কেন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অবধারিত পরিস্থিতি, অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সার-বিবরণীতে বলা হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, নতুন সমাজ নির্মাণ একটা জটিল ও দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া, এবং সর্বাগ্রে, নেতৃত্বে দণ্ডায়মান কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ওপর, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধরনে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সমস্যাদি সমাধানে তাদের সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করে নতুন ব্যবস্থায় উন্মোচনীয় বিপুল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার।

বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের মহতী শক্তি — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

সর্বব্যাপী একটা মতবাদরূপ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিপন্ন করেছে যে পুঁজিতন্ত্রের চরিত্র অস্থায়ী, সমাজতন্ত্রের এবং পরে কমিউনিজমের বিজয় অনিবার্য। তারই পতাকাতলে বর্তমান বিশ্বে চলেছে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গ্রহের সর্বপ্রান্তে কোটি কোটি শ্রমজীবীর মনন ও হৃদয় অধিকার করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের রূপান্তরসাধক এক পরাক্রান্ত বৈষয়িক শক্তি।

বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুলিতে জনগণের ক্রিয়াকলাপ আলোকিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদে, যার মন্ত্রবাণী: 'সবকিছু মানুষের কল্যাণার্থে, সবকিছু মানুষের জন্য।'

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুর্জোয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ আর সামাজিক

অসাম্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর, সমস্ত মেহনতিদের সংগ্রামের অস্ত্র।

উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল ঔপনিবেশিকতার অবশেষ, দারিদ্র্য আর পশ্চাৎপদতা দূর করা, বড়ো বড়ো পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হুকুমদারির পলিসি রোখা, প্রগতিশীল সামাজিক পুনর্গঠন রূপায়িত করার জন্য তাদের প্রয়াসে নির্ভরযোগ্য দিগ্‌দর্শন।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ের কয়েক বছর আগে উনিশ শতকী মার্কসবাদের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে লেনিন এই দৃঢ় বিশ্বাস জানিয়েছিলেন যে 'প্রলেতারিয়েতের মতবাদ হিশেবে মার্কসবাদের আরো বিপুল বিজয় এনে দেবে আসন্ন ঐতিহাসিক যুগ।'* পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে মানবজাতির যে উত্তরণ শুরু হয়েছে, বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া যেভাবে বেড়ে উঠছে, সেটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিকতার সাক্ষ্য। বাস্তব জীবনে ক্রমেই বেশি করে সমর্থিত হচ্ছে লেনিনের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি। সামাজিক বিকাশের সত্যকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদে প্রকাশ পায় শ্রমজীবী মানুষের মূলগত স্বার্থ, সামাজিক ন্যায়ের আদর্শ। তার প্রাণশক্তি নিহিত তার চিরযৌবনে, বিকাশের, নতুন নতুন কারিকা আর ঘটনা, বৈপ্লবিক সংগ্রাম আর সামাজিক পুনর্গঠনের অভিজ্ঞতা সাধারণীকরণের অবিরাম সামর্থ্যে।

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৪।

ইতিহাসের মহত্তম বিপ্লব

১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গর্জন করে উঠল 'অরোরা' যুদ্ধজাহাজের কামান, শুরু হল রুশ বুর্জোয়া সরকারের শেষ ঘাঁটি শীত প্রাসাদের ওপর বিজয়ী ঝঞ্ঝাক্রমণ। একই সময়ে স্মোলনির সমাবেশ হলে উদ্বোধন হল পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের জরুরি অধিবেশন। চূড়ান্ত স্পষ্টতা, সুনির্দিষ্টতা আর সাধাসিধে ভাষায় লেনিন ঘটনাবলির সারসংক্ষেপ করলেন: 'যে শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলশেভিকরা সর্বদা বলে এসেছে, তা ঘটল।'*

আমেরিকান সাংবাদিক অ্যালবার্ট রিস উইলিয়মস্ অবিস্মরণীয় এই ঘটনাটির বিবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'সৈনিক, শ্রমিক, নাবিকে পরিপূর্ণ স্মোলনির বিরাট হলে আমি লেনিনকে দেখলাম প্রথম। এটা সেই সময় যখন গর্জন করছিল 'অরোরার' কামান, হল টগবগ করছে, গুঞ্জন করছে। এইসময় সভাপতি ঘোষণা করলেন, 'এখন লেনিন বলবেন...।' মুহূর্তে সব চুপ করে গেল, তারপর এমন করতালি আর অভিনন্দন ফেটে পড়ল যে মনে হল সবচেয়ে জগদ্দল থামগুলোও কেঁপে উঠছে। সাংবাদিকদের জায়গায় বসে আমরা

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ২।

আড়ষ্ট হয়ে রইলাম উত্তেজনায়: এই বার দেখা দেবে সেই মানুষটি যাকে দেখবার জন্য আমরা এত উন্মুখ। কিন্তু প্রথমে, যতই না কেন আমরা উঠে দাঁড়াই, লক্ষ করা গেল কেবল মঞ্চে হুলুস্থুল, লোকেদের উল্লাস আর করতালির মধ্যে কে যেন সেখানে উঠছে। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম লেনিনকে এবং অবাক হয়ে গেলাম। আমরা কল্পনা করেছিলাম যে আমাদের সামনে আবির্ভূত হবেন বিরাটকায় এক পুরুষ, যার বাহ্যিক চেহারা তৎক্ষণাৎ মনোযোগ আকর্ষণ করবে, কিন্তু মঞ্চে দাঁড়ালেন অনুচ্চ দৈর্ঘ্যের গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একটি লোক, টেকো মাথা, বাদামি দাড়ি। হল মনে হচ্ছিল অভিনন্দনে ভেঙে পড়বে, আর উনি দাঁড়িয়ে রইলেন সামান্য হাসিমুখে, অধৈর্যের কয়েকটা ভঙ্গি করলেন, ঘড়ির দিকে দেখালেন, যেন বলতে চান সময় চলে যাচ্ছে, খামকা তা নষ্ট করা উচিত নয়...। আর এই অভিনন্দনোচ্ছ্বাস যখন তিনি কোনোক্রমে থামতে পারলেন, তখন তিনি সতেজ, আমি বলব উৎফুল্ল কণ্ঠে যে কথাগুলো বললেন, বলাই বাহুল্য আমরা তা তৎক্ষণাৎ টুকে নিলাম... 'রাশিয়ায় আমাদের এখন প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণে ব্যাপৃত হতে হবে।' ...এই ভাবেই শুরু করলেন তিনি।'

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব ছিল সামাজিক বিকাশের, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়মসঙ্গত উপায়। এর বিজয়ে পৃথিবীতে দেখা দিল প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

বিজয়ী অক্টোবরের আগে লেনিন আর তৎসৃষ্ট

বলশেভিক পার্টি প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপুল কাজ চালিয়েছিলেন। প্যারিস কমিউনের (১৮৭১) অভিজ্ঞতা বিচার করে মার্কস ও এঙ্গেলসের শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ লেনিন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অনুবর্তিত করে যান। রাশিয়ায় ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম গণবিপ্লব তিনি সরাসরি পরিচালিত করেন। পরাজিত হলেও তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে সমৃদ্ধ করে, সেটা ছিল মহান অক্টোবরের সাধারণ মহলা। এ বিপ্লব জনগণকে সশস্ত্র করে বিপুল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায়, তাদের উত্থিত করে সচেতন ঐতিহাসিক সৃজনশীলতায়। উদ্‌ঘাটিত হয় শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন রূপ ও পদ্ধতি। রাজনৈতিক গণ ধর্মঘটের মতো প্রবল অস্ত্র মেহনতিরা ব্যবহার করল সেই প্রথম। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে মস্কোয় তারা উত্থিত হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। লেনিনের কথায় জনগণ পেল তাদের রণদীক্ষা। অভ্যুত্থানে পোড় খেয়ে উঠল তারা। সেই যোদ্ধাদের কাতার তা গড়ে তোলে যারা জয়লাভ করে ১৯১৭ সালে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব বিশ্বকে দেখায় মূলগত সামাজিক সমস্যা সমাধানের নিদর্শন, যথা: শোষকদের ক্ষমতা উচ্ছেদ আর প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত, বুর্জোয়া-জমিদারি মালিকানার সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তর, কৃষকদের হিতার্থে কৃষি সমস্যার ন্যায্য সমাধান, ঔপনিবেশিক ও জাতীয় নিগড় থেকে পরাধীন

জাতিদের মুক্তি, সমাজতন্ত্র নির্মাণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত গঠন।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় দেখাল যে বিশ্ব ইতিহাসে শুরু হয়েছে নতুন যুগ, পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস আর কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের যুগ। বিশ্ব ইতিহাসে এটা একটা বৃহত্তম উল্লম্ফন। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম বিলুপ্ত হল শোষক স্তর। লেনিন লিখেছেন, 'গর্বিত হবার, সৌভাগ্যবান বোধ করার অধিকার আছে আমাদের এইজন্য যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে ভূগোলকের এক প্রান্তে হিংস্র জন্তুটাকে, পুঁজিতন্ত্রকে ভূপাতিত করার যা মাটি ভাসিয়েছে রক্তে, যা মানবজাতিকে টেনে এনেছে বুভুক্ষায় আর উন্মত্ততায়'...।*

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহিমা এইখানে যে তা শুধু জনগণকে সত্যকার স্বাধীনতা দিয়েছে তাই নয়, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ বিলুপ্ত করেছে তাই নয়, দিয়েছে বৈষয়িক সম্পদও, শ্রম, শিক্ষা, বিশ্রাম ইত্যাদির অধিকারও সুনিশ্চিত করেছে। অক্টোবরের পতাকা তলে লম্ফ আর জ্বালানি-কাঠি থেকে দেশ এগিয়ে গেল বিশালাকার সব জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্টেশনে, কাঠের লাঙল আর পেটাই হাতুড়ি থেকে ইলেকট্রনিকস আর স্বয়ংক্রিয়তায়। নিঃস্ব অর্ধসাক্ষর রাশিয়া পরিণত হল পরাক্রান্ত শিল্প-

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৪৭৮।

যৌথখামারি শক্তিতে, প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুতনিক) আর মহাজাগতিক উড্ডয়নের দেশে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব সারা বিশ্বে একটা প্রবল প্রেরণা দিয়েছে বৈপ্লবিক সংগ্রামের। অক্টোবরের বজ্রঝলকে আলোকিত হয়েছে বহু দেশের ভবিষ্যৎ পথ। আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাস এগিয়ে গেছে সাত-মাইলি পদক্ষেপে। বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯১৭ সালে, তাতে মানব জীবনে ঘটেছে একটা আমূল পরিবর্তন, বদলে গেছে আমাদের গ্রহের গোটা সামাজিক-রাজনৈতিক চেহারা।

অক্টোবরের প্রভাবে প্রবল হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম, অনেক সঙ্গতি সহকারে আর সতেজে তা নিজের লক্ষ্য সাধনে চেষ্টিত। বেড়ে উঠেছে তার রাজনৈতিক পরিপক্কতা আর সংগঠনশীলতা, তা পরিণত হয়েছে এমন গুরুত্বপূর্ণ এক শক্তিতে যা ক্রমেই বেশি করে ছাপ ফেলছে আন্তর্জাতিক সমাজজীবনের ওপর। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বে প্রলেতারিয়েত এগিয়ে আসছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রধান যোদ্ধা হিশেবে।

রাশিয়ায় বিপ্লবের বিজয় বহু উপনিবেশ আর পরাধীন দেশেও এক সারি বৈপ্লবিক অভিযান জাগায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ারে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমগ্রভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাতে করে সাহায্য করে পুঁজিতন্ত্রের ঘাঁটিগুলিতে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সর্বাগ্রে এই যে তা সমগ্র মানবজাতিকেই সমাজতন্ত্রের পথ দেখিয়েছে। এই পথ গ্রহণ করে প্রতিটি দেশ নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিজের নিজের মতো করে। সেই সঙ্গে বলবৎ থাকে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সাধারণ, অবিচ্ছেদ্য দিকগুলি। কী সেইসব দিক?

— বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন রয়ে গেছে আগের মতোই ক্ষমতার প্রশ্ন। হয় সমস্ত মেহনতি জনগণের সঙ্গে অভিযানী শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা, নয় বুর্জোয়ার ক্ষমতা, তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই।

— সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কেবল সেইক্ষেত্রে সম্ভব যখন শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীরা সত্যকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সেটাকে কাজে লাগায় পুঁজিপতি ও অন্যান্য শোষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য দূর করার জন্য।

— সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব হয় যদি শ্রমিক শ্রেণী আর তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি নতুন সমাজ গঠনের জন্য, সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে অর্থনীতি এবং সমগ্র সামাজিক সম্পর্ককে পুনর্গঠনের জন্য মেহনতি জনগণকে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে।

— সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবল সেই ক্ষেত্রে যদি মেহনতিদের ক্ষমতা শ্রেণীশত্রুর যেকোনো আক্রমণ থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

অক্টোবরের যা শিক্ষা, এ হল তার মাত্র কয়েকটি।

অক্টোবর বিপ্লব যেসমস্ত স্বকীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, তা সত্ত্বেও তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য এইগুলিতে নিহিত। তাতে লেনিনের উক্তির প্রগাঢ় সঠিকতা সমর্থিত হয়, যিনি বলেছিলেন যে সমস্ত দেশেরই যা অনিবার্য এবং অদূর ভবিষ্যৎ, তার কিছু কিছু এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখাচ্ছে রুশ বিপ্লব।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব তার প্রকৃতির দিক থেকেই প্রগাঢ় আন্তর্জাতিক। সমগ্র মানবজাতির জীবনের ওপর তার প্রভাব বিপুল। বিশ্বের কোনো শক্তি তা সে যতই হিংস্র হোক, কোটি কোটি লোকের ওপর যতই দুর্ভাগ্য আর যন্ত্রণা হানুক, অক্টোবর বিপ্লবের মূলগত বিজয়গুলি ছিনিয়ে নিতে তা অক্ষম। ক্রমেই কোটি কোটি নতুন লোকের চেতনায় সঞ্চারিত হচ্ছে মহান অক্টোবরের ধ্যানধারণা, জনগণের মুক্তি ও সৌভাগ্যের জন্য সংগ্রামের চিন্তা। তা তাদের উদ্বোধিত ও উত্থিত করছে উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে।

লেনিনবাদের জন্মভূমিতে বাস্তব সমাজতন্ত্র

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ের ফলে রুশ শ্রমিক শ্রেণী স্বহস্তে ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রমিকেরা সোভিয়েত ক্ষমতাকে কাজে লাগায় সর্বাগ্রে পুরনো অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক

অর্থনীতি গড়ার হাতল হিশেবে। চালানো হয় সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণ, তাতে যে সম্পদ, — কল, কারখানা, খনি ইত্যাদি বুর্জোয়ারা লুট করে নিয়েছিল, তা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে। ব্যাংক, রেলপথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতিও আসে সর্বজনীন মালিকানাধীনে। সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণে উৎপাদনের উপায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক মালিকানা।

কৃষির প্রগাঢ় পুনর্গঠনও ছিল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারদের জমি, পশুপাল, কৃষি যন্ত্রপাতি কেড়ে নিয়ে বিনামূল্যে তা তুলে দেয় মেহনতি কৃষকদের হাতে। ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর ২য় সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের যে অধিবেশনে 'ভূমি আইন' গৃহীত হয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও পার্টির কর্মকর্তা, লেনিনের স্ত্রী ন. ক. ক্রুপস্কায়া তার বর্ণনায় লিখেছেন: 'মনে পড়ছে, ভূমি ডিক্রির যুক্তি দেখিয়ে কিভাবে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন ইলিচ, কথা বলছিলেন তিনি শান্তভাবে। শ্রোতৃমণ্ডলী শুনছিল উত্তেজিত হয়ে। ভূমি ডিক্রি পাঠের সময় আমার কিছু দূরে উপবিষ্ট একজন প্রতিনিধির মুখভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। লোকটি যুবাবয়সী নয়, কৃষকের চেহারা। উত্তেজনায় তার মুখ হয়ে উঠল কেমন যেন স্বচ্ছ, একেবারে মোমের মতো, চোখে জ্বলজ্বল করছিল বিশেষ একটা ছটা।'

ভূমির জন্য কৃষকের যুগযুগের স্বপ্ন পূর্ণ হল। এর

ফলে জোরদার হল শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষকদের জোট।

সোভিয়েত রাশিয়ার মেহনতিরা অবিশ্বাস্য কঠিন পরিস্থিতিতে প্রবৃত্ত হল নতুন জীবন গড়ায়। দুরূহতাটা সর্বাগ্রে এইখানে যে জার রাশিয়া ছিল পশ্চাৎপদ রাষ্ট্র। ১৯১৪—১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ রাশিয়ার অর্থনীতিকে আরো দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত করে। প্রগাঢ় অর্থনৈতিক ভগ্নদশায় পড়ে রাশিয়া। দেশের সামনে প্রশ্ন দাঁড়াল: হয় ধ্বংস পেতে হবে, নয় উৎপাদনের উচ্চতর উপায়ে অতি দ্রুত ও আমূল উত্তরণের জন্য সবচেয়ে বৈপ্লবিক শ্রেণীর হাতে ভাগ্য তুলে দিতে হবে।

অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ আর গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক অবরোধ, অন্যান্য নানা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল দেশকে। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয়েছিল বিচক্ষণ তীক্ষ্মধী রাজনীতির, প্রয়োজন হয়েছিল লৌহকঠিন সহ্যশক্তি আর সংগঠনশীলতার, আত্মশক্তিতে অটল বিশ্বাসের। এই ঐতিহাসিক দাবি পূরণের যোগ্যতা দেখিয়েছিল সোভিয়েত জনগণ।

নতুন জীবন নির্মাণকে লেনিন একবার তুলনা করেছিলেন এমন একটা পাহাড়ে ওঠার সঙ্গে যা খুবই উঁচু, খাড়াই, পথঘাট যার জানা নেই। বিপুল দুরূহতা জয় করার জন্য সোভিয়েত দেশের আত্মোৎসর্গী সংগ্রামের ছবি দিয়েছিলেন রূপকের মাধ্যমে; বলেছিলেন শত্রুদের কথাও, যারা গোপন আশায়

অপেক্ষা করছে কখন নবীন প্রজাতন্ত্রটি হড়কে পড়বে অতল গহ্বরে। তিনি লেখেন: ‘একদল দাঁত কিড়মিড়িয়ে উল্লাস করছে, দুয়ো দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে: এই খসে পড়ল বলে, তাই পড়ুক, পাগলামি করতে যেও না! এরা হল খোলাখুলি শত্রু। অন্যদল... আকাশের দিকে চোখ তুলে দুঃখ করেছে। কী দুঃখের কথা, আমাদের আশঙ্কা সত্য হচ্ছে! এই পর্বতটায় ওঠার বিচক্ষণ পরিকল্পনা রচনায় আমরা সারা জীবন ব্যয় করেছি, আমরা কি বলি নি পরিকল্পনাটা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আরোহণ মুলতবি রাখতে?’*

তাহলেও কমিউনিস্ট পার্টি নির্ভয়ে জনগণকে নিয়ে গেছে ঝঞ্ঝাক্রমণে। সে পার্টি চালিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিনীয় পরিকল্পনায়। লেনিনের প্রতিভাদীপ্ত পরিকল্পনা মশালের মতো সমাজতন্ত্রের পথ আলোকিত করেছে মেহনতিদের জন্য, পার্টির মহাসাধনায় সুদৃঢ় করেছে তাদের বিশ্বাস।

১৯২৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে, গুরুতর পীড়ার পর তাঁর অবস্থা যখন খানিকটা ভালো হয়, লেনিন তখন শ্রুতিলিখন দেন তাঁর শেষ প্রবন্ধগুলির: ‘দিনলিপির পাতা’, ‘সমবায় প্রসঙ্গে’, ‘আমাদের বিপ্লবের কথা’, ‘শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠন করা উচিত কীভাবে’, ‘বরং কম, কিন্তু ভালো করে’। তিনি মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সমস্ত সম্ভাবনা

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪৪, পৃঃ ৪১৬।

রাশিয়ায় আছে। সমাজতন্ত্র গড়া যেতে পারে কেবল বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ভিত্তিতে। তিনি দেখান যে দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন, ভারি শিল্পের সর্বোপায়ে বিকাশ, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির বৈদ্যুতীকরণে পুনর্জন্ম হবে রাশিয়ার, পরিণত হবে তা সমাজতান্ত্রিক মহাশক্তিতে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিনীয় কর্মসূচিতে প্রথম শ্রেণীর গুরুত্ব ধরে ১৯২০ সালে গৃহীত দেশের বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা — 'গোয়েলরো' পরিকল্পনা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিস্ময়কর আর সুগভীর তাঁর এই নির্দেশ: 'কমিউনিজম হল সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে সারা দেশের বৈদ্যুতীকরণের যোগফল', সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশের ভিত্তিতে সেটা রাখা হয়েছে।

সাফল্যের সঙ্গে চালানো হয় কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

সোভিয়েত জনগণের বীর্যমণ্ডিত শ্রম, লেনিনীয় পার্টির বিপুল প্রয়াসে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গোটা দেশের জীবনে। অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠে হাজার হাজার উদ্যোগ, গোটাগুটি এক-একটা শিল্পশাখা, যা প্রাগ্‌বিপ্লব রাশিয়ায় জানা ছিল না। বেড়ে ওঠে নতুন নতুন শহর, শিল্প কেন্দ্র। রেলপথ প্রসারিত হল বহু হাজার কিলোমিটার। আলো জ্বলে উঠল সদ্যোনির্মিত বিদ্যুৎ স্টেশনগুলিতে। সোভিয়েত লোকেদের হাতে গড়া খনি আর আকরিক ক্ষেত্র, ব্লাস্ট আর ওপেন-হার্থ ফার্নেস দিতে থাকল কয়লা আর আকরিক, লোহা আর ইস্পাত।

যে দেশটা সম্পর্কে রুশ কবি নিকলাই নেক্রাসভ (১৮২১-১৮৭৭) লিখেছিলেন: ‘অভাগিনী, তুমি ধনোচ্ছলা, পরাক্রান্তা, তবুও অবলা, জননী-রাশিয়া!’— তাই হয়ে দাঁড়াল বিশ্বের একটি প্রবল শক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তুলল উচ্চবিকশিত শিল্প আর সবচেয়ে অগ্রণী সমাজতান্ত্রিক কৃষি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পাকাপোক্ত বনিয়াদ গড়ে উঠল সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত ১৭শ পার্টি সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বলা হয়: ‘সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, কে কাকে হারাবে লেনিনের এই প্রশ্নের পুরোপুরি ও অমোঘ রূপে সমাধান হয়েছে শহরেও এবং গ্রামেও পুঁজিতন্ত্রের প্রতিকূলে, সমাজতান্ত্রের অনুকূলে।’

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ফলে প্রাধান্য লাভ করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক। আমূল বদলে যায় সোভিয়েত সমাজের শ্রেণীগত গঠন। শোষক — পুঁজিপতি, বেনিয়া, ধনীচাষী তাতে আর রইল না। ১৯২৮ সালেই পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব নেমে আসে ৪·৬ শতাংশে আর ১৯৩৭ সালে তা একেবারে বিলুপ্ত হয়। এতে করে সমস্ত শোষক শ্রেণীই নিশ্চিহ্ন হয়, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান হয় চিরকালের জন্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রইল দুটি মিত্র শ্রেণী — শ্রমিক আর কৃষক। তদুপরি এই শ্রেণী দুটিরও পরিবর্তন ঘটল। সমাজতন্ত্র নির্মাণের ফলে শ্রমিক শ্রেণী আর যৌথখামারি কৃষক কাছাকাছি এল, তাদের

মৈত্রী হয়ে উঠল অটুট। বেড়ে উঠল নতুন, জনগণ থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। সমস্ত শ্রমজীবীই একই রকম আগ্রহী হল জাতীয় অর্থনীতির উত্থানে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংহতিতে, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির বিকাশে। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক স্বার্থের মিলের ভিত্তিতে গড়ে উঠল সোভিয়েত জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় ঐক্য।

৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পার্টির দলিলাদিতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ মূলত গড়া হয়েছে। এই কথাটা নিবদ্ধ হয় ১৯৩৬ সালের সোভিয়েত সংবিধানে।

সমাজতন্ত্র কী জিনিস? মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বলা হয় যে সমাজতন্ত্র হল কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়। এই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন: সাধারণত যাকে সমাজতন্ত্র বলা হয়, মার্কস তাকে কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' বা নিম্ন পর্যায় বলেছেন, উৎপাদনের উপায় যেহেতু সাধারণ সামাজিক মালিকানাধীন, তাই 'কমিউনিজম' কথাটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি না ভোলা হয় যে এটা পূর্ণ কমিউনিজম নয়।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হল রাষ্ট্রায়ত্ত আর সমবায়মূলক — এই দুই রূপে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা। সমাজতন্ত্র তেমন সমাজ যার পতাকায় লেখা: 'সবকিছু মানুষের জন্য, সবকিছু মানুষের কল্যাণার্থে।' এসমাজে:

— উৎপাদনের উপায় জনগণের হাতে, মানুষ কর্তৃক

মানুষ শোষণের, সামাজিক পীড়নের, সুবিধাভোগী অল্পাংশের ক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ লোকের নিঃস্বতা ও নিরক্ষরতার অবসান হয়েছে চিরকালের মতো;

— উৎপাদনী শক্তির গতিময় ও পরিকল্পিত বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল প্রগতিতে বেকারি দেখা দেয় না, সমগ্র জনগণের সচ্ছলতা অবিরাম বাড়তে থাকে;

— 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে' এই নীতিতে সবার জন্য শ্রমের ও পারিশ্রমিকের সমান অধিকার সুনিশ্চিত, বিনামূল্যে চিকিৎসাঘটিত সাহায্য, শিক্ষা, সামান্য ভাড়ায় বাসস্থানের মতো সামাজিক কল্যাণাদি ভোগ করে জনগণ;

— শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারি কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের অটুট মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত, নারী ও পুরুষের অধিকার সমান, কার্যক্ষেত্রে তার রূপায়ণ গ্যারাণ্টিকৃত, নবীন পুরুষদের জন্য নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত, শ্রমপ্রবীণদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা গ্যারাণ্টিকৃত;

— জাতিগত অসাম্য দূরীভূত, সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার সমতা, মৈত্রী, সৌভ্রাত্র আইনত ও কার্যত প্রতিষ্ঠিত;

— সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও বিকাশমান — ক্ষমতা কার্যকৃত হয় জনগণের জন্য এবং জনগণ দ্বারা, উৎপাদনী, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির পরিচালনায় জনগণের ব্যাপক ও সমাধিকারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত;

— স্বাধীনতা, মানবিক অধিকার, ব্যক্তির মর্যাদা বাস্তব অর্থ ধরে, অধিকার ও কর্তব্যের ঐক্য সুনিশ্চিত, প্রত্যেকের ও সকলের জন্য নৈতিকতার একই নিয়ম ও আদর্শ, একই শৃঙ্খলা বলবৎ, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য ক্রমেই অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে;

— সত্যকার মানববাদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের প্রাধান্য, জ্ঞানের সমস্ত উৎস জনগণের জন্য উন্মুক্ত। বিশ্ব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সবকিছু নিয়ে গড়ে উঠেছে অগ্রণী সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি;

— সামাজিক ন্যায়, যৌথতা, কমরেডসুলভ পারস্পরিক সাহায্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা, যা শ্রমজীবী মানুষকে দেয় ভবিষ্যতে আস্থা। নতুন সামাজিক সম্পর্কের স্রষ্টা, নিজের ভাগ্যবিধাতা রূপে তাকে উন্নত করে আত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে;

— সামাজিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষে রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে বৈদেশিক পলিসি। এটা হল শান্তির জন্য সংগ্রামের নীতি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণতা সাধন

সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেনিনের অবদান বিপুল। তাঁর এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ছিল যে সমাজতন্ত্র একটা তৈরি ব্যবস্থা নয়, নিজের বিকাশে তা পরিপক্কতার কয়েকটা ধাপের (পর্ব, পর্যায়) মধ্য দিয়ে যায়।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্পূর্ণ হবার

পর সোভিয়েত ইউনিয়নে শুরু হয় সমাজন্ত্রের পর্যায়।

শুরু হল বিকশিত, পরিণত সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্ব। উৎক্রমণ পর্বের তুলনায় এ পর্যায়টা বেশি দীর্ঘকালীন। বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মাণ শুরু করার পর তা ব্যাহত হয় পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে (১৯৪১-১৯৪৫)। তারপর দেখা দিল দেশের যুদ্ধোত্তর পুনরুদ্ধারের কাল। কেবল এর পরেই সোভিয়েত সমাজ সমাজতন্ত্রের আরো নির্মাণকর্মে পূর্ণোদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পারে। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি দেশ বিকশিত সমাজতন্ত্রের পর্বে প্রবেশ করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রথমত, বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মাণ এবং তার আরো পূর্ণতাসাধন চলে তার নিজস্ব ভিত্তির ওপর, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক এবং তার প্রকৃতিগত নিয়মবদ্ধতা আর নীতির ওপর। দ্বিতীয়ত, বিকশিত সমাজতন্ত্র হল সমাজতন্ত্র বিকাশের একটা সুদীর্ঘ পর্যায়, যার ভেতর থাকে বিকাশের একাধিক ধাপ। তৃতীয়ত, বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ায় একই সঙ্গে সূচিত হয় কমিউনিজমের পথে তার পদার্পণ।

বিকশিত সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, তার মর্মার্থ দেওয়া হয়েছে ১৯৭৭ সালের সোভিয়েত সংবিধানে। তাতে এই কথায় জোর দেওয়া হয়েছে যে বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মাণ হল কমিউনিজমের পথে একটা নিয়মসঙ্গত পর্যায়। এই পর্যায়ে সমাজতন্ত্র বিকশিত হয় তার নিজস্ব বনিয়াদের ওপর, যাতে ক্রমেই বেশি করে অবারিত হতে থাকে নতুন ব্যবস্থার সৃজনী শক্তি,

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার সুবিধা, যাতে মেহনতি জনগণ বৈপ্লবিক অর্জনের ফলভোগ করতে পারে ব্যাপকভাবে।

এটা তেমন সমাজ যাতে গড়ে তোলা হয়েছে প্রবল উৎপাদনী শক্তি, অগ্রণী বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, যেখানে অবিরাম বাড়ছে জনগণের সচ্ছলতা, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্রমেই অনুকূল পরিস্থিতি দানা বাঁধছে।

এটা হল পরিপক্ব সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের সমাজ যেখানে সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের নৈকট্য, সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার আইনত ও কার্যত সমাধিকার, তাদের ভ্রাতৃকল্প সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে লোকেদের নতুন একটা ঐতিহাসিক মেল — সোভিয়েত মানুষ।

এটা হল শ্রমজীবীদের — দেশভক্ত ও আন্তর্জাতিকতাবাদীদের অত্যুচ্চ সংগঠনশীলতা, আদর্শবাদিতা, সচেতনতার সমাজ।

এ সমাজের আইন হল প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য সবার, সকলের কল্যাণের জন্য প্রত্যেকের প্রযত্ন।

এটা হল সত্যকার গণতন্ত্রের সমাজ, তার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুনিশ্চিত হয় সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের ফলপ্রদ পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় জীবনে মেহনতিদের ক্রমেই সক্রিয় অংশগ্রহণ, নাগরিকদের বাস্তব অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের কর্তব্য আর সমাজের নিকট দায়িত্বের মিলন।

পার্টির অর্থনৈতিক রণনীতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল এবং এখনো তাই — জনগণের জীবনযাত্রার বৈষয়িক ও

সাংস্কৃতিক মানের অবিরাম উন্নয়ন। সামনের পর্বে এ লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ত্বরণ, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল প্রগতির ভিত্তিতে সামাজিক উৎপাদনের প্রখরীকরণ ও ফলপ্রদতা বর্ধন। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্ককে গুণগতভাবে নতুন পর্যায়ে তুলতে হবে। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি আমূল ত্বরান্বিত করতে হবে, অর্থনৈতিক বিকাশের রণনৈতিক ধারায় দ্রুত এগিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে এমন উৎপাদনী সম্ভাব্যতা যা সোভিয়েত ক্ষমতার পূর্ববর্তী সমস্ত বছরগুলিতে সঞ্চিত সম্ভাব্যতার সমান।

সমাজতন্ত্রে সূচিত হয় উৎপাদনী সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থাটার পরিপক্কতার উচ্চ মান, যা ক্রমশ পরিবিকশিত হচ্ছে কমিউনিস্ট সম্পর্কে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সমাজ হল অত্যুন্নত অর্থনীতির সমাজ। প্রাগ্‌যুদ্ধ মানের তুলনায় দেশের জাতীয় আয় বেড়েছে ১৬ গুণের বেশি, শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ২৪ গুণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প বেড়ে উঠছে অগ্রণী পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত। বিশ্বের যেকোনো শক্তির চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাঁচা লোহা আর ইস্পাৎ, গ্যাস আর তেল, সিমেণ্ট আর রাসায়নিক সার, মেসিন-টুল, ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার কম্বাইন এবং অন্যান্য অনেক ধরনের জিনিস উৎপাদন করে বেশি। দেখা দিয়েছে পারমাণবিক, রকেট-মহাজাগতিক, ইলেকট্রনিক, অনুজীববিদ্যা ঘটিত শিল্পের নতুন নতুন শাখা। গড়ে উঠেছে বা উঠছে শক্তিশালী উৎপাদনী কমপ্লেক্স। দেশ ছেয়ে গেছে

পল্লবিত বৈদ্যুতিক লাইন, গ্যাস আর তেলের পাইপ-লাইনে। হাজার হাজার কিলোমিটার ধরে প্রসারিত সেচ ক্যানেলে উর্বর হয়েছে এককালের ঊষর আর জলাজমি। সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকনিক অতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নেই নির্মিত হয় বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, পারমাণবিক বরফ-ভাঙ্গা জাহাজ, ছাড়া হয় প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। মহাজাগতিক কক্ষপথ থেকে পৃথিবীকে প্রথম দেখেন সোভিয়েত নাগরিক ইউরি গাগারিন।

অর্থনীতির দ্রুত উত্থানে সম্ভব হয় সোভিয়েত মেহনতিদের চাহিদা আরো পুরোপুরি মেটাবার দিকে মোড় নেওয়া। অধিবাসীদের মাথাপিছু আসল আয় যুদ্ধপূর্বের তুলনায় ছাড়িয়ে গেছে ৬ গুণের বেশি। গৃহ নির্মাণ চলেছে বিপুলাকারে। বিস্তৃত হয়েছে হাসপাতাল আর পলিক্লিনিক, কিণ্ডারগার্টেন আর ক্রেশের জাল।

বর্তমানের সোভিয়েত সমাজ উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিমান জনগণের সমাজ। যুদ্ধের আগে প্রধানত দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ছিল কেবল শতকরা ৮ জন লোকের, এখন সংখ্যাটা ৮২ শতাংশ।

বড়ো বড়ো সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, পাকাপোক্ত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকসম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের জোট। শহর ও গ্রাম, দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে মূলগত পার্থক্য ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে। জাতি ও জাতিসত্তাগুলির প্রস্ফুরণের

আঙ্গিক মিলন হচ্ছে তাদের সর্বাঙ্গীন নৈকট্যের সঙ্গে। দেখা দিয়েছে ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব এক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনসমাজ — সোভিয়েত জনগণ।

আজকের সোভিয়েত সমাজ হল সত্যকার, বাস্তব গণতন্ত্রের, নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি সম্মানের সমাজ। নিজেদের দেশ নিজেদের যৌথের ব্যাপারে মেহনতিদের অংশগ্রহণ ক্রমেই প্রসারিত ও সক্রিয় হচ্ছে, জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মপরিচালনার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে।

এইভাবে কমিউনিস্ট ভবিষ্যতের দিকে পথটা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণীকরণের মধ্য দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরিত করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৭ম কংগ্রেসে (১৯৮৬), তা কার্যে পরিণত করার মধ্য দিয়ে।

সোভিয়েত দেশ যে পথ অতিক্রম করে এসেছে, তার যা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব, সেটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণশক্তির সমাজতন্ত্রে নিহিত বিপুল সম্ভাবনার নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য।

কমিউনিজম নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত

লেনিন বলেছেন, '...সমাজতন্ত্রকে অনিবার্যই ক্রমশ কমিউনিজমে পরিবিকশিত হতে হবে...।'* তবে সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজম দেখা দেয় কেবল ক্রমশই,

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৮০।

বিকশিত সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণীকরণের পথেই। এই ক্রমশ কথাটাকে এই অর্থে বোঝা উচিত যে এখন গুণগত পরিবর্তন ঘটছে এক লহমায় নয়, এক দফাতেই নয়, ঘটছে অবিরাম ধারায়, সমাজজীবনের সমস্ত দিকের সম্পূর্ণীকরণ ও বিকাশের পথে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার আধিপত্য থেকে আসে উভয়ের পক্ষে একই অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ক্রিয়া, যথা: সমাজতন্ত্রের মূলগত অর্থনৈতিক নিয়ম, জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশের নিয়ম, শ্রমের উৎপাদনশীলতার অবিচল বৃদ্ধির নিয়ম ইত্যাদি। পরিকল্পিত বিকাশের নিয়মটিতে প্রকাশ পাবে সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত সংগঠনের উচ্চ কমিউনিস্ট পর্যায়। সমাজতন্ত্র যত বিকশিত হবে, শ্রম অনুসারে বণ্টনের অর্থনৈতিক নিয়মটির ক্রিয়া ততই পরিভোগের সামাজিক তহবিল থেকে মেহনতিদের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি মিলিত হতে থাকবে। কমিউনিজমে এ নিয়মটির জায়গায় আসবে প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনের নিয়ম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সৃজনশীলতার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন রয়েছে বিকশিত সমাজতন্ত্রের গোড়ার পর্যায়ে, তার ঐতিহাসিক কাঠামো নির্ধারিত হতে পারে কেবল অভিজ্ঞতায়, জীবন্ত বাস্তবতায়। কেবল দীর্ঘ একসারি বছর পেরিয়েই নতুন সমাজ পৌঁছবে 'পূর্ণ বিকশিত,

পুরোপুরি কায়েম আর দানাবাঁধা, পরিপূর্ণ অবারিত ও পরিপক্ক কমিউনিজমের অবস্থায়!'*

কমিউনিজম হল শ্রেণীহীন এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে থাকে উৎপাদনের উপায়ের ওপর একই সর্বজনীন মালিকানা, সমাজের সমস্ত সভ্যের পরিপূর্ণ সামাজিক সমতা, যেখানে লোকেদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম বর্ধমান বিজ্ঞান ও টেকনিকের ভিত্তিতে বেড়ে উঠতে থাকে উৎপাদনী শক্তিও, সামাজিক সম্পদের সমস্ত উৎস পূর্ণ স্রোতে প্রবাহিত এবং কার্যকৃত হবে কমিউনিজমের মূলনীতি: প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে।'

কমিউনিজম হল শ্রমরত স্বাধীন ও সচেতন মানুষের এমন সমাজ যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক আত্মপরিচালনা, সমাজের কল্যাণের জন্য শ্রম হয়ে দাঁড়ায় সকলের কাছে জীবনের একটা প্রাথমিক চাহিদা, স্বীকৃত (সচেতন) প্রয়োজন, প্রত্যেকের সামর্থ্য নিয়োজিত হবে জনগণের সর্বাধিক উপকারে।

কমিউনিজম ইতিহাসের একটা নিয়মানুগ পরিণাম। মানবজাতির সমাজজীবন উঠে আসবে বিকাশের গুণগতভাবে অন্য একটা অনেক উচ্চ মানে। যুগে যুগে, পুরুষানুক্রমে শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান যাকিছু সৃষ্ট হয়েছে, সেগুলো তা বাঁচিয়ে রাখবে, গ্রহণ করবে।

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪১, পৃঃ ৩৩।

সংক্ষেপে, ঐতিহাসিক বিকাশের গতিতেই কমিউনিজম অনিবার্য। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছিল এবং রয়ে গেছে একটা সত্যকার বিজ্ঞান, জনগণের বৈপ্লবিক সৃজনকর্মের রাজনৈতিক পরিচালনার অদ্বিতীয় একটা বিদ্যা।

পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থলে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অনিবার্য আগমন এখন ঘটছে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া রূপে। এ প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং সাফল্যের সঙ্গে বিকশিত হচ্ছে বর্তমান কালের তিনটি পরাক্রান্ত বৈপ্লবিক প্রবাহের মিলন ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে। এটা হল সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুলি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিয়ে।

সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা — বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের নির্ধারক শক্তি

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার মর্মার্থ, বিকাশের পর্যায় এবং প্রধান প্রধান দিক

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সামাজিক প্রগতির প্রবল শক্তিকে জাগ্রত ও কর্মে চালিত করেছে। শুরু হয়েছে বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়ন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বাস্তব রূপ নিয়েছে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে, যার উদ্ভব একটা নিয়মবদ্ধ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

এখানে ফরাসি সাংবাদিক ল. নাদোর সঙ্গে লেনিনের আলাপ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আলাপটা হয় ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ক্রেমলিনে। ভবিষ্যৎটা কার, নাদোর এই প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বলেন, 'বিশ্বের ভবিষ্যৎ? আমি পয়গম্বর নই। কিন্তু একটা কথা নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যায়...। পুরনো ব্যবস্থা মৃত্যুদণ্ডিত। মানবসমাজ অনিবার্যতই যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের দিকে।'*

ইউরোপ, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার একসারি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় হল ১৯১৭ সালের অক্টোবরের পর বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। একটা দেশের সীমা ছাড়িয়ে গেল সমাজতন্ত্র, পরিণত হল সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থায়। বিশ্বের মানচিত্রে পুঁজিতন্ত্রের এলাকাটা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। হ্রাস পাচ্ছে নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদয়ে, যারা ঘোষণা করছে যে সমাজতন্ত্র নির্মাণ তাদের লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থায় আছে: আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, ভিয়েতনাম, গণতান্ত্রিক জার্মানি, চীন জনপ্রজাতন্ত্র, কোরিয়া জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কিউবা, লাওস, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া। ভূখণ্ডের দিক থেকে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা বিশ্বের স্থলভাগের প্রায় ৩০ শতাংশ, ৩ কোটি ৫২ বর্গ

---

* লেনিন ভ. ই.। জীবনীর কালপঞ্জি। — মস্কো, ১৯২৫, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৯৮

কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি, বিশ্বের ৩৩·৭ শতাংশের বেশি। বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের ৪০ শতাংশের বেশি তাদের ভাগে, এটা হল শিল্পোন্নত পঃজিতান্ত্রিক দেশগুলির সমগ্র শিল্পোৎপাদনের ৭০ শতাংশ।

বিশ্ব সমাজতন্ত্র একটা প্রবল আন্তর্জাতিক গঠন, তা দণ্ডায়মান উচ্চবিকশিত অর্থনীতি, পাকা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, নির্ভরযোগ্য সামরিক-রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্ভাব্যতার ওপর। এই এক-তৃতীয়াংশাধিক বিশ্বজন, কয়েক গণ্ডা দেশ ও জাতি চলেছে মানবের ও সমাজের মানসিক ও নৈতিক ঐশ্বর্যের সর্বাঙ্গীন উন্মুক্তির পথে। দেখা দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ধরনের জীবনযাত্রা যাতে নেই নিপীড়ক আর নিপীড়িত, শোষক আর শোষিত, ক্ষমতা যেখানে জনগণের হাতে। তার পার্থক্যসূচক দিক হল যৌথতা আর কমরেডসুলভ পারস্পরিক সাহায্য, স্বাধীনতা প্রেরণার জয়যাত্রা, সমাজের প্রতিটি সদস্যের অধিকার আর কর্তব্যের অচ্ছেদ্য ঐক্য, ব্যক্তির মর্যাদা, সত্যকার মানবিকতা।

সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার রূপলাভে তিনটি পর্যায় দেখা গেছে। প্রথম পর্যায়ে (১৯৪৫-১৯৪৯) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শীয় ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তি পাতা হয়। সম্পাদিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে, তথা জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও

পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি। এই পর্বে চুক্তিগুলির চরিত্র ছিল মূলত দ্বিপাক্ষিক।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৯৪৯-১৯৫৯) বৈশিষ্ট্য হল সমাজতন্ত্র নির্মাণে বৃহৎ সাফল্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পাকাপোক্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন। এর ফলে ঘটে দ্বিপাক্ষিক থেকে বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় উত্তরণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্য আরো সংহত হয় যা প্রকাশ পায় ১৯৫৫ সালের ১৪ মে, মৈত্রী, সহযোগিতা আর পারস্পরিক সাহায্যের ওয়ারশ চুক্তিতে, যাতে স্বাক্ষর দেয় বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, গণতান্ত্রিক জার্মানি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া ও আলবেনিয়া (শেষোক্ত দেশটি ওয়ারশ চুক্তি সংগঠন থেকে বেরিয়ে যায় ১৯৬৮ সালে।) প্রতিরক্ষামূলক এই চুক্তি সম্পাদিত হয় আগ্রাসনাত্মক ন্যাটো ব্লককে ঠেকা দেবার জন্য। পরে গড়া হয় ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটি, তাতে থাকে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দ, সরকার-প্রধান, বৈদেশিক মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তৃতীয় পর্যায়ের (১৯৬০ থেকে বর্তমান কাল অবধি) বৈশিষ্ট্য হল সমাজতন্ত্রের সংহতি এবং আরো সম্পূর্ণীকরণে রীতিমতো সাফল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত হচ্ছে বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ; একসারি ইউরোপীয়

সমাজতান্ত্রিক দেশও প্রবৃত্ত হল বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মাণে; কয়েকটি দেশে সাফল্যের সঙ্গে পাতা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ; সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা আরো গভীর হচ্ছে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ নিল কিউবা প্রজাতন্ত্র। জনগণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ের ফলে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হল উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। সমাজতন্ত্রের ভ্রাতৃপরিবারে যোগ দিন লাওস জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার মূলগত দিকগুলি হল এই: প্রথমত, একই ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তি তার প্রকৃতিগত, যথা, দুই রূপে — রাষ্ট্রীয় বা সর্বজনীন এবং সামবায়িক বা গ্রুপভিত্তিক, এই দুই আকারে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার প্রাধান্য; অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে কাজ করে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতিগত অর্থনৈতিক নিয়ম, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে দেখা দেয় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের ব্যবস্থা, যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে, তেমনি বণ্টন, উৎপাদ বিনিময়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকশিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক মিলের ভিত্তিতে দেখা দেয় বিশিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মবদ্ধতা, যেমন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের মান সমান হয়ে ওঠা, একই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার দিকে জাতীয়

অর্থনীতিগুলির বিকাশ কাছাকাছি আসা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল একই ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ভাবাদর্শের মিল। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পরিচালক ও সংগঠক শক্তি হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি, যারা শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীর চারপাশে সমস্ত মেহনতিদের সম্মিলিত, শিক্ষিত ও সংগঠিত করে, জনগণের সক্রিয়তা চালিত করে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্তব্য সাধনে।

আমাদের যুগে বিশ্বের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের অভিজ্ঞতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা মেলে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্টদের বিজয় কার্যক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগত ও সৃজনশীল প্রয়োগের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভুলচুক, গলতি, কোনো একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশ পেছিয়ে বা আটকে থাকার কারণ হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অপ্রতুল জ্ঞান, নয় সুবিধাবাদী ধ্যানধারণা বা জাতিবাদী সংস্কারের প্রভাবে তা থেকে বিচ্যুতি, কিংবা তত্ত্বের বিকাশ থেকে পেছিয়ে গড়া, লেনিনীয় তত্ত্বের বদলে দেওয়া হয় সূত্রভিত্তিক ব্যাখ্যাকরণ, অথবা এবং শেষত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বনিয়াদি ভাবনা ও নীতিগুলির অনিপুণ বা দ্বিধাগ্রস্ত প্রয়োগ।

তৃতীয়ত, এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল বৈপ্লবিক বিজয়গুলি রক্ষার সাধারণ স্বার্থ, প্রতিটি দেশে

কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ ও সমগ্রভাবে বিশ্ব ব্যবস্থার সংহতির জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মেহনতিদের সংগ্রামের একই লক্ষ্য, বিশ্বায়তনে কমিউনিজমের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম।

এসব থেকে দেখা যায় যে পুঁজিতন্ত্রের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বিপুল। তাতে মানবজাতির বিকাশের গোটা পর্ব জুড়ে তার প্রগতি কেন্দ্রীভূত। পুঁজিতন্ত্রের পচন-ধরা ব্যবস্থা অপসারিত করে এ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সারা ভূগোলকে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রের দিকগুলি নিয়মবদ্ধতা রূপে আত্মপ্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রেই: অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শীয় এবং সাংস্কৃতিক।

সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার বিকাশে জটিলতা কম নেই, ভুলও হয় বেশ। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপলাভ একটা বহুমুখী প্রক্রিয়া, অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ ধরনের ছোটো বড়ো নানা সমস্যা সমাধানের সঙ্গে তা জড়িত।

সম্পর্ক আর সহযোগিতা গড়ে উঠছে এমন সব দেশের মধ্যে যাদের অর্থনৈতিক মান, ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর যোগাযোগ. সামাজিক গঠন ইত্যাদি মোটেই একরকম নয়। তবে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির পীড়ন এখানে বাতিল, তার কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সম্পর্কে বৈরিতামূলক শ্রেণীবিরোধ নেই। অনেক আগেই মার্কস লিখেছিলেন, 'জাতিরা যাতে সত্যই মিলিত

হতে পারে, তার জন্য তাদের থাকা চাই সাধারণ স্বার্থ। তাদের স্বার্থ সাধারণ হতে হলে মালিকানার বিদ্যমান সম্পর্ক বিলুপ্ত করা দরকার, মালিকানার বিদ্যমান সম্পর্কই ঘটায় এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণ...। বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের জয়লাভের অর্থ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব জাতীয় ও শিল্পঘটিত সংঘাত চলছে একই সঙ্গে সেগুলিরও অবসান।'*

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে রয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা, তাতে বোঝায় প্রতিটি দেশের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র সহমিতালির স্বার্থের মিল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির মধ্যে সঙ্গতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শের সমস্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতা আর পারস্পরিক সাহায্যের বিকাশ। সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতায় ধরে নেওয়া হয় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাধিকার আর পারস্পরিক লাভজনকতা, তাদের সার্বভৌমত্ব আর স্বাধীনতা, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির সুসঙ্গত অনুসরণ। এ নীতিগুলির পরিপূরণ হয় কমরেডসুলভ পারস্পরিক সাহায্য, প্রলেতারীয় একাত্মতা এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য একত্র সংগ্রামে।

---

* মার্কস ক. এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৭১।

সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার বিকাশে নির্ধারক তাৎপর্য ধরে তার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভ্রাতৃকল্প সহোদ্যোগ। তাতে প্রকাশ পায় কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অবজেকটিভ মিলের অবস্থাই নয়। পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিবিড়, সচেতনভাবে সুব্যবস্থিত, মৈত্রী সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একত্রে সুসমন্বিত, একাত্মতাসূচক ক্রিয়া, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা। সমাজতন্ত্রের যা প্রকৃতিগত, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সেরূপ সম্পর্ক সর্বাধিক পূর্ণতায় রূপ নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিতে। তাতে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে এমন সব সার্বভৌম, সমাধিকারী রাষ্ট্রদের মধ্যে নতুন একটা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যারা মূলগত স্বার্থ ও লক্ষ্যের মিলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শে ঐক্যবদ্ধ ও কমরেডসুলভ একাত্মতা ও পারস্পরিক সাহায্য, সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ।

বর্তমানে এরূপ সহোদ্যোগ চলছে ১৯৪৯ সালে গঠিত অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। তাতে যোগ দিয়েছে নিম্নোক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র: বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, ভিয়েতনাম, গণতান্ত্রিক জার্মানি, কিউবা, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর চেকোস্লোভাকিয়া। এ পরিষদে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির ভূখণ্ডের আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রতিনিধিত্ব সমান, ভোট সমান। এটি একটি মুক্তদ্বার

সংগঠন, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে তা সহযোগিতা চালায়, যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলছে কোরিয়া জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আঙ্গোলা, ইথিয়োপিয়ার সঙ্গে। পরিষদভুক্ত দেশগুলি সহযোগিতা করে ৯০টির বেশি উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে, ৬০টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

পরিষদের নিয়মাবলি অনুসারে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য হল পরিষদভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রয়াস সম্মিলিত ও সমন্বিত করে তাদের জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশে, অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল প্রগতির ত্বরণে, শিল্পায়নের মান উন্নয়নে, শ্রমের উৎপাদনশীলতার অবিরাম বৃদ্ধিতে, জনগণের সচ্ছলতার অবিরাম সমৃদ্ধিতে সহযোগিতা।

অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ গঠনের সময় বুর্জোয়া রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদেরা তার ভরাডুবি, খেয়োখেয়ি, অকিঞ্চিৎকর ফলপ্রসূতার ভবিষদ্বাণী করেছিল। ভুল হয়েছিল তাদের।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুলি একটা পরাক্রান্ত অর্থনৈতিক যোগ। এ দেশগুলিতে আছে ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ, অর্থাৎ বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ। আর তা উৎপন্ন করে বিশ্বের জাতীয় আয়ের মোটামুটি ২৫ শতাংশ, বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের ৩৩ শতাংশ তাদের ভাগে। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সম্ভাব্যতার ১/৩ এখানেই। ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৮৪ সালে এই দেশগুলির জাতীয়

আয় বেড়েছে ৮·৬ গুণের বেশি, আর শিল্পোৎপাদন— ১৪ গুণ।

সমাজতান্ত্রিক সহমিতালি একেবারে নতুন ধরনের একটা মৈত্রী। নেহাৎ একদল রাষ্ট্রের স্বার্থের মিলের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত নয়, এ হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি দ্বারা পরিচালিত, সাধারণ বিশ্ববীক্ষা, সাধারণ উচ্চাদর্শ, কমরেডসুলভ একাত্মতা আর পারস্পরিক সমর্থনে সংযোজিত জনগোষ্ঠীগুলির এক ভ্রাতৃপরিবার। এ মৈত্রী অবস্থান ও কর্মের যে ঐক্যের ওপর দাঁড়ায় সেটা সাময়িক নয়, ফলে তার প্রতিটি সরিক পায় জাতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য পরিপূরক শক্তি। বিশ্ব ব্যাপারে তাদের সমষ্টিগত ভার এবং প্রভাব বহুগুণ বেড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদে অর্থনৈতিক সহযোগিতা কিভাবে চলে? সর্বাগ্রে তা গড়া হয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগের নীতির ওপর, এ বিভাগ দেখা দেয় ও দানা বাঁধে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের অভ্যন্তরে ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরিসরে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ক্রিয়ার ফলে। পরিকল্পনশীলতা সমাজতন্ত্রের ধর্ম, তার কল্যাণে প্রতিটি সরিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে তার বিশেষ ধরনের উৎপাদনের গ্যারান্টিকৃত বাজার এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে সময় থাকতে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপায় পাওয়া নিশ্চিত হয়।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগে জাতীয় শ্রম ও বৈষয়িক সম্পদের সদ্ব্যবহার উন্নত হয়, প্রতিটি দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি, তার উৎপাদন খরচা হ্রাস, সেই সঙ্গে শ্রমের গুণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য হয়। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতিতে উৎপাদনী শক্তির যথোপযোগী ও সুষ্ঠু স্থানবণ্টন এবং সবচেয়ে লাভজনক অর্থনৈতিক অনুপাত স্থাপন সম্ভব হয়।

পরিষদভুক্ত সমাজতান্ত্রিক* দেশগুলির আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগের ভিত্তিতে বেড়ে উঠতে থাকে তাদের অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যবদ্ধতার, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবনের আরো গভীরতাসাধনের পক্ষপাতী। ঐতিহাসিক গুরুত্বের যে কর্তব্য — নিজেদের জনগণের সচ্ছলতার আরো বৃদ্ধি, তাদের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও টেকনিকের অগ্র শিখরে আরোহণ, এই কর্তব্য একত্রে সাধন করার জন্য তা উৎপাদনের প্রখরীকরণ ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল প্রগতি ত্বরণের মূলগত ধারায় ভ্রাতৃদেশগুলির প্রয়াস সুসঙ্গতভাবে মিলিত করার ওপর বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন কী জিনিস? এটা হল পরিষদভুক্ত দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি ও সরকারগুলির সচেতন ও পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণে তাদের অর্থনৈতিক নৈকট্য এবং জাতীয় অর্থনীতিগুলির আধুনিক, উচ্চফলপ্রসূ কাঠামো গঠন, তাদের

অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা ক্রমশ কাছাকাছি আসা ও সমান হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চলছে অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও টেকনিকের বনিয়াদি শাখাগুলিতে সচেতনভাবে সুগভীর ও সুদৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন, এইসব দেশের আন্তর্জাতিক বাজার প্রসারণ ও সুদৃঢ়করণ, পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক সমন্বয়নের ভিত্তিতে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবনের বৈষয়িক ভিত্তি গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক জীবনের আন্তর্জাতীয়ভবনে, এটা হল উৎপাদনের সামাজীকরণ গভীর হওয়ার ফলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক পরস্পরনির্ভরতা স্থাপন, প্রসারণ ও গভীরীভবনের একটা অবজেকটিভ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ ও জটিল। শুধু নির্দিষ্ট দেশটির নয়, সহযোগিতার সমস্ত অংশীর স্বার্থ পুষ্ট হবে এমন ধরনের সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত সমাধান খুঁজে পাবার নৈপুণ্য থাকা চাই তাতে। তা দাবি করে বিজ্ঞান ও টেকনিকের সর্বাধুনিক কৃতিত্ব সদ্ব্যবহারের দিকে সুদৃঢ় অভিমুখ, সবচেয়ে লাভজনক আর টেকনিকের দিক থেকে অগ্রণী উৎপাদন।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন ক্রমাগত গভীর ও প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে পরিষদভুক্ত দেশগুলির মনোযোগ কেন্দ্রীভূত এই ধরনের সমস্যা সমাধানের দিকে, যেমন, শক্তির বিকাশ, জ্বালানি-কাঁচামালের সম্পদ বৃদ্ধি ও তার যুক্তিযুক্ত সদ্ব্যবহার; যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের উৎপন্নগুলির টেকনিকাল মান ও গুণ উন্নয়ন; অগ্রণী ধরনের যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম উৎপাদনে যৌথ প্রয়াসের বৃদ্ধি; ভোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য

বৃদ্ধি ও গুণের উৎকর্ষ। এই ধারায় পরিষদভুক্ত দেশেরা একত্রে রচনা করে সহযোগিতার দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মসূচি।

বিগত বছরগুলিতে পরিষদভুক্ত দেশগুলি বহুমুখী অঙ্গীভূতি ব্যবস্থার সর্বসম্মত পরিকল্পনা আর ১৯৮১ — ১৯৯০ সালের জন্য বিশেষীকরণ ও সমবায়ীকরণের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি রচনা নিয়ে খেটেছে। গৃহীত হয়েছে ২০০০ সন অবধি বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির মিলিত যৌগ কর্মসূচি। বর্তমানে বিবেচিত হচ্ছে অর্থনৈতিক যন্ত্রব্যবস্থার গঠনগুলিকে কাছিয়ে আনা, সমবায়ে অংশগ্রাহী মন্ত্রিদপ্তর, উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ আরো বাড়িয়ে তোলা, একত্রে ফার্ম গড়ার মতো সব প্রশ্ন। প্রয়াস ও সম্পদ মিলিত করার অন্যান্য রূপও সম্ভব।

নিজেদের অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যা সাফল্যের সঙ্গে সমাধানে, সমস্ত ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলপ্রদতা বৃদ্ধিতে পরিষদভুক্ত দেশগুলির সাহায্য হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবনে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় অর্থনীতিকে প্রখর বিকাশের পথে দ্রুত নিয়ে আসা, তার ফলপ্রদাতা বাড়ানো, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক-টেকনিকাল বনিয়াদের সংহতি ও জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধির ভিত্তি হিশেবে সামাজিক উৎপাদনের আরো বিকাশ, উৎপন্নদ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা, উৎপাদনী শক্তির আরো যুক্তিযুক্ত সমাধানের যে কর্তব্য তা সমাধানের ওপর।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জনগণের ক্রমশ কাছাকাছি আসার চরিত্র সর্বাঙ্গীণ ও বহুমাত্রিক। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবনের বিকাশ। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এটা হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও সম্পূর্ণীকরণ, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, শান্তি ও জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর সংহতি, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের গভীরতা বৃদ্ধির সর্বসম্মত, সুসমন্বিত ধারার রূপায়ণ, ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারার আরো প্রতিষ্ঠা। এই প্রক্রিয়ার সমস্ত দিক পরস্পর সম্পর্কিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক চলতে থাকে যেন পরস্পরের ওপর সক্রিয় দুটি ধারায়। একদিকে এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা সুদৃঢ়, নিজস্ব অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকশিত করতে সচেষ্ট। অন্যদিকে বাস্তব জীবন তাদের নিয়ে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে আরো ব্যাপক সহযোগিতা আর নৈকট্যে। যেমন পৃথক এক-একটা দেশ, তেমনি সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির স্বার্থ মেটে এই দুই ধারার সুসমন্বিত মিলনে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যের নিবিড় বন্ধনে।

ভ্রাতৃকল্প দেশগুলির বহুমুখী সহযোগিতা ও নৈকট্য আসছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের অবজেকটিভ চাহিদা থেকে। কমিউনিস্ট পার্টিরা তাকে সংগঠিত ও চালিত করে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের নিয়মবদ্ধতার বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞানের ভিত্তিতে। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নির্ধারক শক্তি; শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির দুর্গ।

শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সশস্ত্র শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসের গতিপথে নির্ধারক প্রভাব ফেলে, ত্বরান্বিত করে তাকে। শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা বিষয়ে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সমর্থিত হচ্ছে। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী দেখিয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, মুক্তি ও সাম্যের জন্য জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া, নিজেদের শ্রেণী যুদ্ধের বিপুল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত করার সামর্থ্য।

স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিশেবে শ্রমিক আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের সন্ধিক্ষণে, যখন প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম রীতিমতো তীব্র হয়ে ওঠে। বৈপ্লবিক পথে ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করেছে শ্রমিক শ্রেণী। তাদের সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব ও সংহতি। শাসক শ্রমিক শ্রেণী পরিণত হয়েছে সামাজিক অগ্রগতির পড়াক্রান্ত শক্তিতে।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীই হল প্রধান বৈপ্লবিক শক্তি। শিল্পোন্নত দেশের প্রলেতারিয়েতের ওপর অত্যন্ত মূল্য দিয়েছিলেন

লেনিন, বলেছিলেন যে এরা 'আমাদের প্রধান ভরসা, আমাদের প্রধান খুঁটি।...'* তাই বর্তমান বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ধরে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি, মানসিক শ্রমের কর্মী ও সমগ্র অধিবাসীদের প্রলেতারিয়েতে পরিণত হবার প্রবণতা অব্যাহত থেকে গেছে। গত শতকের মাঝামাঝি শ্রমিকদের মোট সংখ্যা যেখানে ছিল ৯০ লক্ষ, বিশ শতকের গোড়ায় প্রায় ৩ কোটি, সেখানে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি তাদের সংখ্যা ৬০ কোটির বেশি। শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির কর্মরত অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশই শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু মার্কস যা বলেছেন, সংখ্যাবহুলতায় একটা ব্যাপারের ফয়সালা কেবল তখনই হয়, যখন ব্যাপকভাবে তারা সংগঠনবদ্ধ এবং জ্ঞান দ্বারা চালিত।

বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক নবায়নের জন্য শ্রমিক সংগ্রামের আরো বৃদ্ধি পূর্বনির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে কী কী অবজেকটিভ কারিকায়?

প্রথমত, পুঁজিতন্ত্রে শ্রম ও উৎপাদনের চরিত্র হয়ে উঠছে ক্রমেই বেশি করে সামাজিক অথচ সাধারণ

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৭, পৃঃ ৩৬৩।

শ্রমের ফল আগের মতো আত্মসাৎ করা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে। লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, 'সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পংজিতন্ত্র পুরোপুরি নিয়ে আসছে উৎপাদনের সর্বাঙ্গীণ সামাজীকরণ, তা, বলা যায়, পংজিপতিদের ইচ্ছা ও চেতনা গ্রাহ্য না করে তাদের ঠেলছে কী একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থার দিকে, যা পুরোপুরি অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে পুরোপুরি সামাজীকরণে উত্তরণ।'* পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে পংজিতন্ত্র, প্রভুত্বের নতুন রূপ খোঁজে, রং পালটায়। কিন্তু নিজের মূলগত বিরোধ থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রম ও পংজির মধ্যে বৈরিতা তীব্র হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণের মাত্রা বেড়ে উঠছে, মেহনতিদের পারিশ্রমিকের মান আর একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রামের মূল্যে মেহনতিরা যেসব সুবিধা লাভ করেছে, যাতে প্রকাশ পায় জনগণের অতি জরুরি প্রয়োজন, সেগুলি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা।

তৃতীয়ত, পংজিতন্ত্রের বিরোধগুলি শ্রেণী চেতনা, পংজিতন্ত্রবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধির সহায়ক। শেষ পর্যন্ত তা জনগণের, সর্বাগ্রে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা জাগিয়ে তোলে।

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩২০-৩২১।

পুঁজিতন্ত্রের দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতিদের সংগ্রাম বৃদ্ধির প্রোজ্জ্বল প্রকাশ হল ধর্মঘট আন্দোলনের জোয়ার। এখন তা অত্যন্ত উচ্চ মাত্রায় উঠেছে। ৮০'র দশকের শ্রেণী-সংগ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে রাজনৈতিক দাবির গণ্ডি যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক দাবিতে ধর্মঘটীদের চেয়ে রাজনৈতিক অভিযানে অংশীদের সংখ্যা বাড়ছে বেশি দ্রুতবেগে। ১৯৭৫-১৯৭৯ সালে রাজনৈতিক ধরনের সংঘর্ষে যোগ দিয়েছিল বছরে গড়ে ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক, ১৯৮০-১৯৮৪ সালের পর্বে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। তদনুযায়ী ধর্মঘটীদের — মোট সংখ্যার মধ্যে বুর্জোয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত লোকেদের সংখ্যাও বাড়ছে। প্রথম ক্ষেত্রে সূচকটা ৫৫, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রলেতারীয় সংগ্রামের উত্থানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে চলেছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলন

শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতির মূলগত স্বার্থের অভিব্যক্তি হল কমিউনিস্ট আন্দোলন। এটা রাজনৈতিক শক্তি, তার ক্রিয়াকর্ম মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক অগ্রগতির অবজেকটিভ নিয়মানুসারী। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা

দেখিয়েছে যে কেবল কমিউনিস্ট পার্টিই সামাজিক পুনর্গঠনের সঠিক পথ নির্দেশ এবং বৈপ্লবিক সৃজনকর্মে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রকাশ পায় সবচেয়ে অগ্রণী দৃষ্টিভঙ্গি, মানবজাতির যুগযুগের স্বপ্ন — কমিউনিজমের জন্য সংগ্রাম তা চালিত করে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৮৪৭ সালে প্রথম কমিউনিস্ট সংগঠন — কমিউনিস্ট লীগ স্থাপনে এবং ১৮৪৮ সালে তার প্রথম কর্মসূচিগত দলিল, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' প্রকাশে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্তাল বিকাশ দেখা দেয় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ের পর। যেমন, ১৯১৮ সালে যেখানে দুনিয়ায় কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির সংখ্যা ছিল মোটে ১০টি, ১৯২৮ সালে সেখানে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬, আর বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে বিশ্বের ৯৫টি দেশে। ৬৫ বছরে (১৯১৭-১৯৮২) ফ্যাসিজম ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের সংখ্যা বেড়েছে ২০০ গুণের বেশি, ৩ লক্ষ থেকে প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভূমিকা বৃদ্ধি হল বর্তমান সামাজিক বিকাশের একটা অবজেকটিভ নিয়ম। ভূমিকা বৃদ্ধির কারণ, প্রথমত, যুগ যুগ ধরে শোষণমুক্ত সমাজের যে স্বপ্ন দেখে এসেছে মানবসমাজ, কমিউনিস্টরাই সেটাকে বাস্তব করে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বকে রূপ দিয়েছে সমাজতন্ত্র ও

কমিউনিজম নির্মাণের ব্যবহারিকতায়; দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যের ঐক্যে মিলিত সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিরা একটি একক, ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিশেবে এগিয়ে আসে; তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিকতা আর শান্তির জন্য সঙ্গতিপরায়ণ সংগ্রামের ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য নিশ্চিত হয় শ্রমিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা, তার দিকে আকৃষ্ট হয় সমস্ত শান্তিকামী শক্তির মনোযোগ। কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি মেহনতিদের অধিকারের জন্য, শান্তি আর জাতিসমূহের নিরাপত্তার জন্য সক্রিয় সংগ্রামী হিশেবে এগিয়ে আসে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি ও প্রাণবত্তার অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এ মতবাদের বহুকালের ইতিহাস তর্কাতীতরূপে দেখিয়েছে যে এটিই একমাত্র মতবাদ যা সামাজিক প্রগতির সাধারণ পথ ও চালিকা শক্তির সঠিক নির্দেশদানে সক্ষম। বিকাশের সাধারণ নিয়মবদ্ধতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা যেকোনো মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীকে যথোচিত একটা অভিমুখ নেওয়াতে পারে। এমনকি অতি সুকঠিন অবস্থাতেও বাস্তব জীবন যে প্রশ্ন তোলে তার সঠিক জবাব খুঁজে পায় তারা। কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বে একমাত্র শক্তি যার আছে বিপ্লবের জন্য, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের বিজ্ঞানসম্মত রণনীতি ও রণকৌশল।

কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিক। প্রতিটি পার্টিই শ্রেণীগত আত্মীয়তার বন্ধনে, ভাবাদর্শীয় নীতি আর সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যের মিলে সমগ্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। সেই সঙ্গে প্রতিটি পার্টিই কাজ করে তাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা একাধিকবার এই কথায় জোর দিয়েছেন যে শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতার নীতিকে কখনো দৃষ্টিচ্যুত করা উচিত নয় কমিউনিস্টদের। তাঁরা মনে করতেন যে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের পলিসি, রণনীতি ও রণকৌশলের নীতিগত ভিত্তি, যা আসে বিপ্লবের বিকাশ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতার স্বীকৃতি থেকে। তাই কমিউনিস্টরা সমাজ বিকাশের অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতা অবলম্বন করে সে জ্ঞানটাকে প্রয়োগ করে প্রতিটি পৃথক দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থার, ঐতিহ্যের হিশেব নিয়ে। জাতীয় পার্থক্যকে তারা বাড়িয়েও দেখে না, উপেক্ষাও করে না। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হয় সমগ্রভাবে বিশ্ব পরিস্থিতির হিশেব আর বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের কাছে দায়িত্বের চেতনা নিয়ে।

শুধু তাই নয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা সমস্ত জাতি ও অধিজাতির (race) মেহনতিদের ভ্রাতৃকল্প ঐক্যের পক্ষ নিয়েছেন, নাকচ করেছেন এক জাতি (বা জাতিগোষ্ঠীর) সঙ্গে অন্য জাতি (বা জাতি গোষ্ঠীর) সর্ববিধ বিরোধ। প্রখ্যাত এই উক্তিটি

মার্ক্সের: 'যে জাতি অন্য জাতিকে দাস করে, সে তার নিজেরই শেকল বানায়।'*

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন হল স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভ্রাতৃকল্প সংগ্রামী মৈত্রী, যারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুসারে বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের জন্য, শ্রমজীবীদের মূলগত স্বার্থের জন্য একত্রে সক্রিয় সংগ্রাম চালাচ্ছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল বাহিনী

সংগ্রামের পরিস্থিতি এবং পার্টিগুলির সম্মুখস্থ কর্তব্যের চরিত্র অনুসারে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কয়েকটি বাহিনীতে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী হল সমাজতান্ত্রিক দেশেদের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি।

এক্ষেত্রে সমান সমানদের মধ্যে প্রথম হিশেবে প্রধান ভূমিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির। এটি সবচেয়ে অভিজ্ঞ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী গণপার্টি যা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিকশিত সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণকরণে নেতৃত্ব দিচ্ছে, বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অগ্রবাহিনী হিশেবে এগিয়ে আসছে।

---

* মার্ক্স ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ১৬, পৃঃ ৪০৭।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে মিলিত ১ কোটি ৯০ লক্ষের বেশি কমিউনিস্ট। এ পার্টির প্রধান কাজ হল সোভিয়েত সমাজের বিকাশের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সংরচন এবং তা কার্যে পরিণত করার জন্য মেহনতিদের সংগঠিত করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সমাজের বৈজ্ঞানিক পরিচালনার মধ্যে পড়ে সেইসব লক্ষ্য ও কর্তব্য নির্ণয় যাতে পরিপক্ক সামাজিক প্রয়োজন, মেহনতিদের মূলগত স্বার্থ মেটে। সামাজিক বিকাশের অবজেকটিভ নিয়মগুলির দাবি পার্টি মনে রাখে এবং সমাজের বাস্তব বৈষয়িক ও আত্মিক সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে। নিজের বিপুল শক্তি তা চালিত করে বিকশিত সমাজতন্ত্রের আরো সম্পূর্ণীকরণে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে আইন হিশেবে বিধিবদ্ধ হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি হল সোভিয়েত সমাজের পথপ্রদর্শক ও পরিচালক শক্তি, তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংগঠনাদির কোষকেন্দ্র।

সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলিতে কয়েক কোটি কমিউনিস্ট ঐক্যবদ্ধ, সভ্যসংখ্যা ও প্রভাবের দিক থেকে তারা হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৃহত্তম বাহিনী। নিজ নিজ দেশে এই পার্টিগুলি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের নেতা ও পরিচালক শক্তি। অর্থনীতির অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ, নতুন সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন,

সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবনযাত্রার বিকাশ, মেহনতিদের কমিউনিস্ট শিক্ষায় লালন, সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের নির্ভরযোগ্য রক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যাদির সমাধান করে তারা।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরেকটি বৃহৎ বাহিনী হল পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিরা। তাদের অনেকগুলিই বড়ো বড়ো শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে, রাজনৈতিক জীবনে হয়ে উঠেছে প্রভাবশালী শক্তি। সাম্রাজ্যবাদের পীঠভূমিগুলিতে তারা কাজ চালায় এই কথা মনে রেখে যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান চালিকা ও সংগঠক শক্তি হল শ্রমিক শ্রেণী। একচেটিয়া পুঁজির প্রভুত্ব বিলোপে প্রলেতারিয়েত ছাড়াও, কৃষক, গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী, সাধারণ কর্মচারী, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া স্তর অর্থাৎ জাতির অধিকাংশই আগ্রহী।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিরা যেসব কর্মসূচি পেশ করে, প্রগাঢ় গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সঙ্গে যা জড়িত, তার প্রধান কথাগুলি এই:

— শান্তি এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ; অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অবসান ও নিরস্ত্রীকরণে উত্তরণের প্রয়াস; দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে পরস্পর লাভজনক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমঝোতার বিকাশন;

— বৈদেশিক, সর্বাগ্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বহুজাতিক একচেটিয়া আর নানা ধরনের রাষ্ট্রীয়-

একচেটিয়া সঙ্ঘের হামলা থেকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা;

— অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলির জাতীয়করণ এবং জাতীয়কৃত ও অন্যান্য উদ্যোগগুলির ওপর জনগণ আর মেহনতিদের গণসংগঠনের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন;

— গ্রামীণ মেহনতিদের স্বার্থে কৃষির প্রগাঢ় পুনর্গঠন;

— মেহনতিদের স্বার্থে স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন;

— মেহনতি জনগণের আয়ত্তাধীন করে জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষণ ও বিকাশ;

— পৃথক পৃথক থেকে সর্বজাতীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে মেহনতিদের ও তাদের গণসংগঠনগুলির অংশগ্রহণের প্রসরণ;

ব্যক্তিগত ও যৌথ গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রসার; শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে চালিত দমনমূলক আইন নাকচ; রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিঘাত।

এইসব দাবির জন্য কমিউনিস্ট পার্টির বদ্ধপরিকর সংগ্রামে ব্যাপক মেহনতি জনগণের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স, ইতালি, পোর্তুগাল, স্পেন, জাপান প্রভৃতি অনেক পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শাসক বুর্জোয়া মহল কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান হিশেবে না নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আর পারছে না।

সরকারে কমিউনিস্টদের স্থান গ্রহণে প্রচণ্ড বাধা দেয় দেশের ভেতরকার আর বাইরের প্রতিক্রিয়া। এটা হল পুঁজিতান্ত্রিক দেশের জীবনে তাদের বর্ধমান গুরুত্ব, ব্যাপক লোকসাধারণের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা আর প্রভাবের সাক্ষ্য। ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানি, নরওয়ে প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার নানা দেশেও কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়ছে।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি দেশের প্রগাঢ় সংকটের পরিস্থিতিতে, চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী ও নয়া-ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির সক্রিয়তা বাড়লেও নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় ও প্রসারিত করেছে। পার্টির সভ্যসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ব্যাপক: ক্ষমতার যেসব কর্মনির্বাহী সংস্থায় কমিউনিস্ট ও তাদের সহযোগীরা সংখ্যাধিক তাদের আওতায় বাস করে দেশের অর্ধেকের বেশি লোক।

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি একটি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি। সভ্যসংখ্যা ৭ লক্ষাধিক। ২৮ হাজার প্রাথমিক কমিউনিস্ট সংগঠন কাজ চালায় কার্যত দেশের সমস্ত বড়ো বড়ো উদ্যোগে; প্রতিটি ফরাসি শহরে এবং বহু গ্রামে এগুলি সক্রিয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে, বিভিন্ন গণসংগঠনে বেশ প্রভাব আছে কমিউনিস্টদের।

বর্তমান কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠে কমিউনিস্ট আন্দোলন জনগণকে, বৈপ্লবিক শক্তিদের সমবেত করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরেকটা বাহিনী হল এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিরা। নিজ নিজ দেশের জাতীয় মুক্তি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সাঁচ্চা যোদ্ধা হিশেবে তারা নিজেদের যোগ্যতা দেখিয়েছে। ঔপনিবেশিকতা আর তার পরিণাম চূড়ান্তরূপে দূর করার জন্য এই পার্টিগুলি দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট, ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী ফ্রন্ট গঠনের জন্য, সুসঙ্গতভাবে প্রগাঢ় সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে তারা।

লাতিন আমেরিকা আর ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের জঙ্গী কমিউনিস্ট বাহিনীগুলি ক্রমেই রীতিমতো প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। এই মহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পরিণত হয়েছে বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিতে। বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে লাতিন আমেরিকান কমিউনিস্টরা পোক্ত হয়ে উঠেছে, গড়ে তুলছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবের পূর্বশর্ত।

সংগ্রাম এখানে জটিল হয়ে উঠছে এইজন্য যে বেশ কয়েকটি দেশে নবজীবনের জন্য চেষ্টিত জনগণের পথ রোধ করে আছে প্রতিক্রিয়াশীল, সামরিক শাসন। কমিউনিস্টদের প্রায়ই কাজ করতে হয় অবৈধ অবস্থায়, মাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হবার অপরাধেই প্রায়ই জীবনদানের ঝুঁকি নিতে হয় তাদের।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপের বিশ্ববীক্ষা, পদ্ধতি-প্রকরণ ও ব্যবহারিকতার ভিতি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। তাতে সম্ভব হয় ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রধান প্রশ্ন বেছে নেওয়া, বর্তমান যুগের সমাজজীবন ও শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব প্রক্রিয়াগুলিকে সুগভীর ও সর্বাঙ্গীণ রূপে বিচার করা, সঠিক ভাবে এবং যথাসময়ে প্রধান আঘাতের লক্ষ্য স্থির করা; মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও গৃহীত লক্ষ্য অনুসারে সংগ্রামের বহুবিধ রূপ ও উপায় নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা; শ্রেণী শত্রুর কাতারে অন্তর্বিরোধ ও মতভেদকে কাজে লাগানো, প্রয়োজন হলে প্রধান নীতিগুলি বিসর্জন না দিয়ে সাময়িক আপোসেও যেতে পারা।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে খুবই তাৎপর্য ধরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও আঞ্চলিক সাক্ষাৎ, তাদের দ্বারা প্রণীত ও গৃহীত দলিলগুলি।

১৯৫৭ সালের ১৪-১৬ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিদের সম্মেলন। তাতে সংরচিত ও গৃহীত হয় বিবৃতি। এই বছরেরই ১৬-১৯ নভেম্বরে ৬৪টি দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির সম্মেলন চলে। তাতে গৃহীত হয় শান্তির ঘোষণাপত্র। বিবৃতিতে থাকে বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্যের কথা, বিশ্বাঙ্গনে শক্তি বণ্টনের পরিবর্তন, যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যার বিশ্লেষণ। সূত্রবদ্ধ হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের

মূলগত নিয়মবদ্ধতা, যা সমস্ত দেশের পক্ষে একই।

১৯৬০ সালের নভেম্বরে বসে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির আরো একটি সম্মেলন। তাতে যোগ দেয় ৮১টি পার্টির প্রতিনিধিদল। গৃহীত হয় বিবৃতি এবং সারা বিশ্বের জনগণের উদ্দেশে আবেদন। বিবৃতিতে বিশ্ব বিকাশের কারিকা হিশেবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ভূমিকা বৃদ্ধি, নতুন বিশ্ব যুদ্ধ নিবারণ এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য বর্তমান কালের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সংগ্রামের পথ, ঔপনিবেশিক দাসত্বের ব্যবস্থা ভেঙে যাবার পর জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত, শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির সামনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন কর্তব্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানা হয়।

৭৫টি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির সম্মেলন হয় ১৯৬৯ সালের জুন মাসে। তাতে রচিত ও গৃহীত হয় 'বর্তমান পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্তব্য এবং কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির কর্মের ঐক্য' নামক দলিল এবং 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ১০০তম জন্মবার্ষিকী বিষয়ে' আবেদন। জনগণের কাছে 'ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, মুক্তি ও শান্তি'র জন্য ডাক দেওয়া হয়, গৃহীত হয় 'শান্তি রক্ষার আহ্বান।'

দলিলগুলিতে দেওয়া হয় বর্তমান পর্যায়ে

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মূলনীতি। তাদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হল:

— মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ততা; কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্যের মূলীভূত বনিয়াদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে ভাবাদর্শীয় ঐক্য;

— প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের জন্য সর্বতোভাবে প্রযত্ন। সাধারণ লক্ষ্যের জন্য একত্র সংগ্রামে সম্মতি; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সাধারণ কর্তব্য বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি একত্রে যেসব মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তে আসে, প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক স্বেচ্ছায় তার অনুসরণ; মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির স্বাধীনতা ও সমাধিকার; স্বদেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিতে চালিত হয়ে প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পলিসি প্রণয়ন করে; নিজ দেশের শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতি জনগণের কাছে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে পার্টি দায়িত্ববদ্ধ।

— কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় পার্টি গঠন ও পার্টি জীবনের লেনিনীয় মান অনুসরণ;

— কমিউনিস্ট আন্দোলনের পঙক্তিতে উপদলীয় ক্রিয়াকলাপের অমার্জনীয়তা;

— দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে, শোধনবাদ, গোঁড়ামি ও জাতিবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম;

— কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বিতর্ক দেখা দিলে আলোচনা-পরামর্শ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে তার মীমাংসা।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগ করেছে ইউরোপের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির সম্মেলন (বার্লিন, জুন ১৯৭৬)। বার্লিন সম্মেলনের অংশীরা ঘোষণা করে যে তারা 'মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের মহান ভাবনাগুলির ভিত্তিতে, প্রতিটি পার্টির সমাধিকার ও সার্বভৌম স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লিপ্তি, প্রগতিশীল সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামে বিভিন্ন পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা কঠোরভাবে মেনে নিজেদের আন্তর্জাতিক, কমরেডসুলোভ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা ও একাত্মতা বিকশিত করে যাবে। নিজ দেশে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এবং নিজেদের শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের নিকট প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির যে দায়িত্ব, তা মুক্তি আর স্বাধীনতা সংহতির জন্য, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর সারা বিশ্বে শান্তির জন্য সংগ্রামে সমস্ত দেশের মেহনতিদের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন ও জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক একাত্মতার সঙ্গে জড়িত।'*

যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে ১৯৮০ সালে ইউরোপের শ্রমিক ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্যারিস বৈঠক। ন্যাটো ব্লক

---

* ইউরোপে শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক প্রগতির জন্য। ইউরোপের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির সম্মেলনের মোট কথা প্রসঙ্গে। বার্লিন, ২৯-৩০ জুন, ১৯৭৬, পৃঃ ৩১।

পশ্চিম ইউরোপে নিউক্লিয়ার অস্ত্রবাহী নতুন মার্কিন রকেট বসাবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ইউরোপে যে গুরুতর বিপদ দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে মহাদেশের জনসাধারণের সংগ্রাম সক্রিয় করে তোলায় এ বৈঠক সাহায্য করেছে।

ভ্রাতৃকল্প পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপ উন্নয়ন এবং তাদের প্রয়াস সমন্বয়ের ব্যাপারে বৃহৎ তাৎপর্য ধরেছে ৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে আর ৮০'র দশকের গোড়ায় লাতিন আমেরিকার (১৯৭৫), মধ্য আমেরিকা আর মেক্সিকোর (১৯৭৪ ও ১৯৮০), আরব দেশগুলির (১৯৭৬, ১৯৭৮ ও ১৯৮১) কমিউনিস্ট পার্টিদের আঞ্চলিক সমাবেশ ও সম্মেলন। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরে ভূমধ্যসাগরীয় পূর্বাঞ্চল, মধ্য প্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়া, লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির প্রতিনিধিরা মিলিত হন। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় এ মহাদেশের ইতিহাসে প্রথম উষ্ণমণ্ডলীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৈঠক।

প্রতি বছর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সাক্ষাৎ হয় প্রচুর। ভ্রাতৃপার্টিগুলির এইরূপ এবং অন্যান্য ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

সক্রিয় আন্তঃপার্টি সহযোগিতার একটা প্রতিফলন হল কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের প্রসার। বহু ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ স্থাপিত

হয় পার্টি কোষ ও স্থানীয় সংগঠন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা পর্যন্ত সর্বস্তরে। বিশেষ গুরুত্ব ধরে পার্টি নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাক্ষাৎ। পার্টি কংগ্রেসগুলির কাজে পারস্পরিক যোগদানেও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিকাশ পায়।

ভ্রাতৃপার্টিগুলির মধ্যে খুবই জনপ্রিয় তাদের তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক যৌথ পত্রিকা — 'শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যা।' পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদে আছে প্রায় ৬০টি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি। প্রকাশিত হয় ৩৪টি ভাষায় এবং প্রচারিত হয় বিশ্বের ১৪০টির বেশি দেশে।

শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ইদানীং যেসব বিজয় লাভ হয়েছে তা অর্জনে সাহায্য করেছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্য, তাদের যৌথ, একাত্ম ক্রিয়াকলাপ। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য ভ্রাতৃপার্টিগুলি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগ্রামী আন্তর্জাতিক ঐক্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সতত সযত্ন।

দুই ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের বর্তমান যুগে খুবই তাৎপর্য ধরে অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সোশ্যালিস্ট, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, শ্রমিকদের আস্থাভাজন সংগঠনাদির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সহযোগিতা। কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের অবস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই সর্বদা ঘোষণা করে যে শান্তি এবং তীব্র আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির গঠনমূলক সমাধানের

পক্ষপাতী যেকোনো রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে নিজেদের প্রয়াস মিলিত করতে তারা প্রস্তুত।

কমিউনিস্টরা মিলিত একই ভাবাদর্শে — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, শত্রু তাদের একই — সাম্রাজ্যবাদ, লক্ষ্যও এক — সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের জন্য সংগ্রামে সাফল্যের এই হল অবজেকটিভ পূর্বশর্ত।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আর প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বস্ততা, নিজেদের জনগণের স্বার্থ এবং সমাজতন্ত্রের সাধারণ কর্মযজ্ঞের নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ সেবা — এই হল কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়ার ফলপ্রদতা ও সঠিক দিশার অত্যাবশ্যক শর্ত, নিজেদের ঐতিহাসিক লক্ষ্যার্জনে সাফল্যের গ্যারাণ্টি।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট ও পতন

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটা মূলাঙ্গ হল দুনিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। বিশ্বের বিপুলাংশ অধিবাসীদের ওপর কোনো না কোনো আকারে ঔপনিবেশিক পীড়ন চাপিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ। তা গড়ে তোলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, যা চূড়ান্ত রূপ

নেয় উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের গোড়ায়। ৪০-এর দশক নাগাদ যেসব দেশ তার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের লোকসংখ্যা প্রায় ৬৬ কোটি, তখনকার বিশ্বজনের ৩০·৬ শতাংশ।

ঔপনিবেশিক পীড়ন হল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সবচেয়ে নিষ্ঠুর রূপ। পদদলিত করা হয় দাসত্বে ফেলা জাতিদের মর্যাদা, তাদের বলা হত 'হীন', 'নিম্ন বর্গের' জাতি। এসব দেশের সম্পদ হিংস্রের মতো লুঠ করা হত, জনগণের ওপর চলত নির্মম পীড়ন। ডজন ডজন দেশের ভাগ্য স্থির হয়ে যেত সেসব দেশের লোকেদের দিয়ে নয়, লন্ডন আর প্যারিস, ব্রুসেলস আর রোম, ওয়াশিংটন আর লিসবনের কলোনিওয়ালাদের হাতে।

গোলাম হয়ে পড়া জাতিরা নিজেদের অবস্থা কখনো মেনে নেয় নি। ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়েছে তারা। এই কারণেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হল জাতীয় পীড়নের বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় প্রতিঘাত, জাতীয় পীড়নের উচ্ছেদ তার লক্ষ্য।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রগাঢ় সংকটের অবজেকটিভ ভিত্তি হল প্রভুদেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া আর উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মধ্যে বিরোধের বৃদ্ধি। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের সূত্রপাত ঘটায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। এই প্রসঙ্গে জহরলাল নেহরু লিখেছিলেন, 'সোভিয়েত বিপ্লব মানবসমাজকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে এবং যে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছে তা নির্বাপিত হবার

নয়। বিশ্ব যে নতুন সভ্যতার দিকে চলেছে, তার ভিত পেতেছে তা।*

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কারা যোগ দেয়?

প্রলেতারিয়েত — ঔপনিবেশিক পীড়নের সবচেয়ে বদ্ধপরিকর ও সঙ্গতিপরায়ণ প্রতিপক্ষ, জাতীয় মুক্তির সর্বাধিক অটল যোদ্ধা। কোনো সংকীর্ণ স্বার্থপর লক্ষ্য তার নেই, পদানত দেশটির সমগ্র জনগণের মৌল স্বার্থ সে প্রকাশ করে পূর্ণাকারে। বৈদেশিক পুঁজিপতিদের শোষণ ও বর্ণবিদ্বেষী পীড়ন থেকে অসহ্য কষ্ট ভোগ করে শ্রমিক শ্রেণী।

কতকগুলি দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকায়, শ্রমিক শ্রেণী অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। আফ্রিকা মহাদেশে শিল্পশ্রমিক ৪০ লক্ষ, যেখানে মোট অধিবাসী সংখ্যা হল ২৫ কোটি। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বে যেতে পেরেছে। এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে, লাতিন আমেরিকায় প্রলেতারিয়েত বেশি বিকশিত। এখানে তারা দানা বেঁধেছে বহু বছর ধরে এবং বহু ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে প্রভাবশালী ও সংগঠিত সামাজিক শক্তিতে। বর্তমানে লাতিন আমেরিকায় শিল্প ও কৃষির শ্রমিক সংখ্যা আড়াই কোটি, এশিয়ায় প্রায় ৬ কোটি। জাতিসঙ্ঘের তথ্য অনুসারে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা গত ২৫ বছরে বেড়েছে আড়াই গুণ।

---

* Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India.—London: Meridian, 1951, p. 14.

কৃষক সম্প্রদায় — এরা হল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান গণশক্তি এবং প্রলেতারিয়েতের প্রধান সহযোগী। উন্নয়নশীল দেশগুলির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি হল কৃষক, গুরুতর বৈপ্লবিক অভিযানে তারা সক্ষম। ভূমিহীনতা, নয়া-উপনিবেশিকদের পেটোয়াদের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক পীড়ন আর স্বেচ্ছাচার, গ্রামাঞ্চলে জমিদার আর কুসীদজীবীদের জুলুম — এসব মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে কৃষকদের।

বহু দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় শহুরে পেটি বুর্জোয়ারা। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে তারা জড়িত, ফলে প্রায়ই বুর্জোয়ার দিকে তারা ঝোঁকে। কিন্তু অন্যদিকে, সাধারণত, তারা নিজেরাই শ্রমপ্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেয় এবং তাদের বৈষয়িক অবস্থা বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেক খারাপ। নয়া-উপনিবেশিকদের পীড়ন, বৈদেশিক কোম্পানি তথা বেনিয়ান বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে শোষণ ও সর্বনাশা প্রতিযোগিতা তাদেরও ঠেলে দেয় জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে।

জাতীয় বুর্জোয়া, জাতীয় বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের ওপর নয়া-উপনিবেশিকদের পীড়নের চাপ অনুভব করে। জাতীয় বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য বহু দেশেই অল্পসংখ্যক। তাহলেও তাদের মধ্য থেকে এসেছেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা।

এই সামাজিক শক্তিরা অংশ নেয় জাতীয় মুক্তি

আন্দোলনে। জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনগণ শোষণের খোদ ভিত্তিটাকেই আক্রমণ করে, পরিণত হয় 'বিশ্ব রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের বৈপ্লবিক ধ্বংসের সক্রিয় কারিকায়।'*

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট হল পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার প্রথম পর্যায়ে চলে সর্বাগ্রে জাতীয় রাষ্ট্রপাট ও স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদের অধীন দেশগুলির জনগণের একরোখা সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত বড়ো বড়ো বৈপ্লবিক অভিযান। যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হিটলারি জার্মানি ও সমরবাদী জাপানের ওপর বিজয়লাভে সোভিয়েত জনগণ নির্ধারক অবদান যোগ করে, তার পরে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট প্রচণ্ড বেড়ে উঠে তার পতন ঘটায়। এই পর্বে বিলুপ্ত হয় জার্মান, ইতালিয়ান, জাপানি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ায় নিজেদের উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না, এশিয়া ও আফ্রিকার একসারি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয় তারা। শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিশ্বব্যাপী ভাঙন।

সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ দুর্বলতা, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদয় ও বিকাশ, শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪৪, পৃঃ ৫।

আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলির আঘাতে চূর্ণ হয় জাতি পীড়নের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা। ৭০-এর দশকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি কার্যত সম্পূর্ণ হয়। উপনিবেশবিরোধী মুক্তি বিপ্লবগুলির বিজয়ের ফলে ১৯৮৫ সাল নাগাদ দেখা দিয়েছে ১১৫টি নতুন রাষ্ট্র, আফ্রিকাতেই রয়েছে ৫০টি স্বাধীন দেশ। মুক্ত দেশগুলিতে বাস করে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার ৭০ শতাংশের বেশি লোক।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ধ্বংস হল তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক থেকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদয়ের পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, বিশ্ব নবায়নের বৃহত্তম কারিকা।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার এত দ্রুত পতনের কারণ কী?

প্রথমত, অসাধারণ বেড়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্রের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক প্রভাব। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুলি সরাসরি বিপুল সমর্থন জানায় এবং স্রেফ তাদের অস্তিত্বটাই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শক্তিকে, তার সমরযন্ত্রকে আটকে রাখে।

দ্বিতীয়ত, গুরুতর বৈষয়িক এবং ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ক্ষতি সইতে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদকে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয় তার সবচেয়ে মারমুখী বাহিনীর ধ্বংসে এবং অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শক্তির গুরুতর দুর্বলতায়।

তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে। পরাধীন দেশের জনগণের অতি ব্যাপক স্তরে তা ব্যাপ্ত হয়। যুদ্ধের মধ্যে বেশ কয়েকটি উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে যথেষ্ট বেড়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণী। প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিগুলির তৎপরতা। সক্রিয় হয়ে ওঠে জাতীয় বৈপ্লবিক সংগঠনাদি।

চতুর্থত, পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের কেন্দ্রস্থলেই শ্রেণী-সংগ্রাম বাড়িয়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক পলিসির দৃঢ় বিরোধিতা করে তারা, জাতীয় স্বাধীনতার যোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্মতার আন্দোলন গড়ে তোলে।

পঞ্চমত, বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিদের মধ্যে সংহতি সুদৃঢ় হয়।

নয়া-উপনিবেশবাদ কী জিনিস?

নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তাদের অসমান, পরনির্ভর অবস্থা কাজে লাগিয়ে শোষণের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য সম্পর্ক গড়ে তোলে, তার গোটা ব্যবস্থাটাই

হল নয়া-উপনিবেশবাদ। তার কাজ হল নবীন রাষ্ট্রগুলিকে সত্যকার স্বাধীন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে না দেওয়া, স্বাধীন অর্থনীতি গঠনে বাধা দেওয়া, বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে এইসব দেশকে ধরে রাখা, কাঁচামালের লেজুড়, পুঁজি লগ্নি আর বাজারের লাভজনক ক্ষেত্র হিশেবে তাদের রেখে দেওয়া, তাদের সমাজতন্ত্রমুখী হয়ে ওঠা বন্ধ করা।

উন্নয়নশীল দেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও সাম্রাজ্যবাদ তার পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও মুক্ত দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন ও অধিবাসীদের শোষণ সাম্রাজ্যবাদের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েই থেকে গেছে। নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা গড়তে ও গুছিয়ে তুলতে, বহুসংখ্যক মুক্ত রাষ্ট্রকে নিজের সঙ্গে বেঁধে রাখতে সাম্রাজ্যবাদ সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নশীল যে দেশগুলিতে বাস করে দুই শতাধিক কোটি মানুষ, তা কার্যত হয়ে আছে নীরন্ধ্র দারিদ্র্যের একটা অঞ্চল। ৮০'র দশকের গোড়ায় মুক্ত দেশগুলিতে সমগ্রভাবে মাথাপিছু আয়ের মান ছিল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় ১১ গুণ নিচে। গত তিন দশক ধরে এই ব্যবধান কমে নি, বেড়েই যাচ্ছে। ব্যাপারটা কেবল আপেক্ষিক দারিদ্র্য নিয়েই নয়। প্রশ্নটা কোটি কোটি লোকের নিরক্ষরতা আর অজ্ঞানতা, বারোমেসে অপুষ্টি আর বুভুক্ষা, ভয়াবহ শিশুমৃত্যু, মহামারী নিয়েও।

নয়া-উপনিবেশবাদের কৌশলগুলো কী?

নয়া-উপনিবেশবাদের যে পদ্ধতিটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তা হল অর্থনীতির দিক থেকে স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজি, বিশেষত রাষ্ট্রীয় পুঁজি রপ্তানি। এতে করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় না করেই, পুঁজি রপ্তানিকারক রাষ্ট্রের কাছে উন্নয়নশীল দেশের অধীনতা বজায় রাখা, এমনকি বাড়িয়ে তোলাও সম্ভব হয়। রাষ্ট্রীয় পুঁজির রপ্তানি চলে সাধারণত 'সাহায্য', 'দান' এবং ঋণের নামে আর আন্তর্জাতিক একচেটিয়া এইসব দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করার অছিলায় উৎপাদনের লাভজনক প্রধান প্রধান শাখায় নিজেদের উদ্যোগের শাখা স্থাপন করে। আর ও ব্যাপারে পছন্দ করা হয় তেল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ আর সেইসব রাষ্ট্রকে যারা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কে উৎসাহদান আর বৈদেশিক পুঁজির সঙ্গে অংশীদারির পথ নিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পশ্চিমী একচেটিয়ার লগ্নি থেকে যে মুনাফা আসে তা গড়ে নিজ দেশে লগ্নির তুলনায় মোটামুটি দেড়-দুই গুণ বেশি।

উন্নয়নশীল দেশকে পশ্চিম যে 'সাহায্য' দেয়, তাতে তাদের উৎপাদনী শক্তির বিকাশে সহায়তা করা হয় সামান্যই। এমন কায়দা করা যাতে প্রাপ্ত ঋণ, ক্রেডিট, তহবিল খরচ করে ফেলে দেশটা নতুন ঋণের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। তদুপরি, 'সাহায্য' প্রায়ই দেওয়া হয় যথেষ্ট চড়া সুদে, ফলে অনেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের আর্থিক পরাধীনতা বেড়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে তাদের মোট বৈদেশিক ঋণ ৮০,০০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে

যায়। কেবল বার্ষিক সুদ মেটাতেই লাগে বিপুল একটা টাকা — ১৬-১৭,০০০ কোটি ডলার। দেখা দেয় একধরনের 'রুদ্ধ চক্র' যাতে বহু দেশ নতুন ঋণ আর ক্রেডিট নিতে বাধ্য হয় আসলে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নয়, পুরনো দেনার 'জমে ওঠা' সুদ মেটাবার দায়ে। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের হাতে থাকে অর্থনৈতিক হুমকি আর রাজনৈতিক চাপের জোরদার হাতল।

নয়া-উপনিবেশবাদের আরো* একটা কৌশল হল এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে অস্ত্রপ্রতিযোগিতার মধ্যে টেনে আনা। ১৯৮২ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশগুলির ভাগে ছিল বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ১৬ শতাংশ (১৯৭০ সালে ৭·২)। সদ্যোমুক্ত দেশগুলির সৈন্যবাহিনীতে আছে দেড় কোটি লোক, বিশ্বের সমস্ত সৈন্যের ৬০ শতাংশ। এখন সারা বিশ্বের অস্ত্র রপ্তানির ৭৫ শতাংশই যাচ্ছে এই দেশগুলোয়। ১৯৭৮-১৯৮২ সালে সামরিক ব্যয় বেড়েছে: পশ্চিম এশিয়ায় ১৮০০ কোটি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮০০ কোটি, লাতিন আমেরিকায় ৭৫০ কোটি ডলার।

নয়া-উপনিবেশবাদী ব্যবস্থায় একটা বড়ো জায়গা নেয় বহির্বাণিজ্যে অসমান বিনিময়।

উন্নয়নশীল দেশে তাঁবেদার সরকার বা ডিক্টেটরি শাসন প্রতিষ্ঠার মতো সুপরীক্ষিত পদ্ধতিও প্রয়োগ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। এসব ক্ষেত্রে সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের উৎকোচে ক্রয়, চক্রান্ত,

রাষ্ট্রীয় কু'দেতা, প্রগতিশীল নেতাদের হত্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। জনগণ যখন আত্মবিক্রীত সরকারের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা তখন 'স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র' রক্ষার অছিলায় মুক্তি আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে, প্রায়ই এমনকি সোজাসুজি সশস্ত্র হস্তক্ষেপই চালায়। এর পরিষ্কার দৃষ্টান্ত হল ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর যুদ্ধ, গ্রেনাডায় হানা, ইত্যাদি।

সাম্রাজ্যবাদীরা যে নয়া-উপনিবেশবাদ অনুসরণ করে, তা চালিত পরনির্ভর দেশগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ আটকে রাখা, তাদের অর্থনীতিকে একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, তাদের বিকাশকে পুঁজিতান্ত্রিক পথে চালানোর লক্ষ্যে।

বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পথ

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর এসব দেশের জনগণের সামনে বিকাশের দুটি পথ খোলা থাকে: পুঁজিতান্ত্রিক আর অপুঁজিতান্ত্রিক। ব্যাপারটা হল এই যে পুঁজিতান্ত্রিক নিগড় থেকে মুক্ত দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকে প্রচুর: মুক্তির পর তাদের একদল বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পথ ধরে এগিয়েছে, আর অন্যেরা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক কায়েম করেছে।

যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্য সেসব দেশে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠা কার্যত কঠিন, কেননা নিজেদের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে নিজেদের সম্পদের বড়ো

একটা অংশের ওপর তাদের অধিকার সীমাবদ্ধ। পংজিতান্ত্রিক দুনিয়ার নানা ধরনের সংকটাত্মক ঘটনাদি আর সামাজিক-অর্থনৈতিক বিরোধের তীব্রায়ণ পংজিতান্ত্রিক পথগামী দেশের অর্থনীতি বিকাশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

দৃষ্টান্ত হিশেবে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে ধরা যাক। এ অঞ্চলে জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজের অক্ষমতা দেখিয়েছে পংজিতন্ত্র। শিল্প বিকাশের সমস্ত সাফল্য সত্ত্বেও মেহনতি জনগণ দিন কাটায় অসহ্য কষ্টকর অবস্থায়। ব্রেজিলে অধিবাসীদের ৮০ শতাংশের ভাগে পড়ে জাতীয় আয়ের কেবল ৩৩ শতাংশ।

অধিবাসীদের দারিদ্র্য আর অভাব-অনটন, আয় বণ্টনে রীতিমতো অসমানতা, যাচ্ছেতাই সামাজিক অন্যায় — আজকের দিনে এগুলি হল লাতিন আমেরিকান পংজিতন্ত্রের অচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গি কতকগুলি দিক। আর এটা তেমন পংজিতন্ত্র যা অন্যান্য অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলির চেয়ে বেশি বিকশিত, অনেক এগিয়ে আছে।

কিছুকাল আগেও আফ্রিকান পংজিতন্ত্রের দেখন-ঠাট ছিল 'আফ্রিকার মহাকায়' নাইজেরিয়া। সাড়ে সাত কোটি লোকের এই দেশটি তেল আহরণে, বহির্বাণিজ্যের আয়তনে, বিনিয়োগের পরিমাণে আফ্রিকায় ছিল প্রথম স্থানে। তেলের বাজার 'ফেঁপে ওঠায়' নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল 'কৃষ্ণ মহাদেশের' বহু রাষ্ট্রের কাছে ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু

অচিরেই নাইজেরিয়ার বাহ্য সচ্ছলতার পেছনে দেখা গেল যথেষ্ট নীরস একটা ছবি। মার্কিন সাংবাদিক এই বিবরণ দিয়েছেন: 'নাইজেরিয়ার প্রায় ৮০ শতাংশ শিল্পোৎপাদন ভোগ্য পণ্যের শাখাগুলিতে। প্রথম স্থানে আছে পানীয় দ্রব্যের উৎপাদন, তারপর টেক্সটাইল, তৈলদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য। বড়ো বড়ো লগ্নি করা হয়েছে মোটর গাড়ির সংযোজন আর বৈদ্যুতিক দ্রব্য উৎপাদনের উদ্যোগে। একসারি ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলির ৯০ শতাংশই আমদানি করা উপাদানের ওপর নির্ভরশীল।'* ১৯৮৩ সালে বাজেটের ঘাটতি দাঁড়ায় ৮২০ কোটি, বৈদেশিক ঋণ ১৪০০ কোটি ডলার।**

আর তথাকথিত নাইজেরীয় 'গণতন্ত্র'টি কী বস্তু যেটিকে তুলে ধরা হয়েছিল সারা আফ্রিকার দৃষ্টান্ত আর আদর্শ হিশেবে? সাধারণ নাইজেরীয় পরিণত হয় মুষ্টিমেয় লোকের দাসে, যাদের প্রধান স্বার্থ ছিল কেবল নিজেদের ক্ষমতা যেকোনো মূল্যে চিরস্থায়ী করে রাখাতেই নয়, দেশের সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতেও, যেখানে সাধারণ নাগরিকেরা ডুবে থাকছিল নিঃস্বতায়।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের এই ভবিষ্যদ্দর্শন ছিল যে নির্দিষ্ট একটা ঐতিহাসিক

---

* International Herald Tribune, 17-18, XII, 1983, p. 13.

** Jeune Afrique, 11.1.1984.

পরিস্থিতিতে অতীতের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী ও দেশেরা সমাজতন্ত্রে চলে আসতে পারে বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায়টা বাদ দিয়েই। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিকাশের তেমন পথ নিশ্চিত হতে পারে যেসব মূলগত শর্তে, তার বৈশিষ্ট্য বিচার করেছিলেন লেনিন। সর্বাগ্রে সেটা হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব যারা স্বল্পবিকশিত দেশগুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন করতে সক্ষম, নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখাতে পারে কিভাবে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা যায়।

বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের বাস্তব কর্মযোগে কার্যে রূপায়িত হচ্ছে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবনা। গত দুই দশকে এশিয়া ও আফ্রিকায় গড়ে উঠেছে প্রায় ১৩ কোটি লোক নিয়ে সমাজতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলির একটা বিস্তীর্ণ এলাকা। বর্তমানে এই রাষ্ট্রগুলির বেশির ভাগই আফ্রিকায় অবস্থিত। তাদের ভাগে আছে মহাদেশটির — ভূখণ্ডের ২৬ এবং অধিবাসীদের প্রায় ২২ শতাংশ।

সমাজতন্ত্রমুখিতার মূলকথাটা কী?

সমাজতন্ত্রমুখিতা বলতে বোঝায় সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণে চলে আসার জন্য সদ্যোমুক্ত দেশগুলিতে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সামাজিক-রাজনৈতিক, বৈষয়িক-টেকনিকাল ও আত্মিক পূর্বশর্ত গঠনের দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি হল শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহল, শিক্ষার্থী যুবজন, ফৌজ, কর্মচারী, ক্ষুদ্র জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি, শহরের

আধাপ্রলেতারীয় স্তরগুলিকে নিয়ে শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপগুলির একটা ব্যাপক জোট।

বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তি হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, সামন্ততন্ত্রবিরোধিতা, প্রগাঢ় গণতান্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত। জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে এই কর্মসূচি যত রূপায়িত হতে থাকবে, বৈপ্লবিক গণতন্ত্রও ততই আসবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কাছাকাছি।

কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও সমাজতন্ত্রমুখী প্রতিটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই তাদের প্রয়াস চালিত করে একইপ্রকার মূলধারায়। সেটা হল সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া, স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্তদের অধিষ্ঠানের ক্রমশ বিলোপ; অর্থনীতিতে জনরাষ্ট্রের জন্য নির্ধারক ঘাঁটির ব্যবস্থা এবং উৎপাদনী শক্তির পরিকল্পিত বিকাশে উত্তরণ; গ্রামে সমবায় আন্দোলনে উৎসাহদান; সামাজিক জীবনে মেহনতি জনগণের ভূমিকা বর্ধন; জনগণের অনুগত জাতীয় কর্মনির্বাহকদের দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রমিক সংহতি; বহির্নীতির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র।

গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির, আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার উদ্যোগগুলির জাতীয়করণ। এ ব্যবস্থা পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত, কেননা একচেটিয়ার মালিকানাধীন সম্পত্তি হল উপনিবেশের জনগণ যে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করেছে তারই পুঁজিতে পরিণতি। সাফল্যের সঙ্গে জাতীয়করণ চালানো হয়েছে

আলজেরিয়া, সিরিয়া, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে। আলজেরিয়ায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে উৎপাদিত হচ্ছে দেশের ৯০ শতাংশ শিল্পদ্রব্য। ইথিওপিয়ায় জাতীয়কৃত হয়েছে সমস্ত বড়ো বড়ো এবং বেশির ভাগ মাঝারি ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলি হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। রাষ্ট্রীয় সেক্টরে এ ছাড়াও থাকে রাষ্ট্র কর্তৃক নবগঠিত ও নির্মীয়মান উদ্যোগাদি, ব্যাংক, খনি ও প্রসেসিং শিল্প, বহির্বাণিজ্যের সংগঠন প্রভৃতি। সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলিতে জাতীয় আয় উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলির ভাগ পেঁছয় ৩০-৫০ শতাংশে। তদুপরি উৎপাদনে, পুঁজি লগ্নিতে, কর্মসংস্থানে, অর্থনীতির আগুয়ান শাখাগুলির বিকাশে রাষ্ট্রীয় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজতন্ত্রমুখী অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রীয় সেক্টর হল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র আর ব্যক্তিমালিকানাপ্রসূত স্বতঃস্ফূর্তির বিরুদ্ধে একটা শক্তি। প্রগতিশীল ভূমিকা তা পালন করে, কেননা সাধারণ জাতীয় স্বার্থে বৈষয়িক, শ্রমরূপী ও আর্থিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় তাতে, অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবেগ ত্বরণে ও তার মান উন্নয়নে সাহায্য হয়।

প্রধান একটা ধারা বলে গণ্য হয় উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়ন, অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের ভূমিকা বৃদ্ধি, বিদ্যমানগুলির আধুনিকীকরণ ও নতুন শিল্পোদ্যোগ স্থাপন, কৃষি সমেত অর্থনীতির সমস্ত শাখাকে আধুনিক টেকনোলজিকাল ভিত্তিতে আনয়ন।

যেমন কঙ্গো জনপ্রজাতন্ত্রে গত দশকে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে বছরে ১২-১৭ শতাংশ। তবে তার মানে এই নয় যে ছোটো-বড়ো প্রতিটি দেশকেই বহুমুখী শিল্প সমাহার স্থাপন করতে হবে। কোনো একটা দেশে শিল্পের যে শাখাগুলি ফলপ্রদ হতে পারে সেগুলিকেই বিকশিত করা সমুচিত।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির বিকাশের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল ব্যাপক কৃষকসাধারণের স্বার্থে কৃষির পুনর্গঠন। তার মধ্যে পড়ে ভূমিমালিকানার পুরনো রূপ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অচল-হয়ে-পড়া কৃষি পদ্ধতির বিলোপ, কৃষি উৎপাদনের টেকনিকাল পুনঃসজ্জা, সমবায় ও রাষ্ট্রীয় খামারের বিকাশ।

যেমন ইথিওপিয়ায় গড়া হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার কৃষক সমিতি, ৫০ লক্ষাধিক লোক তাতে ঐক্যবদ্ধ। আগে যে জমি ছিল অভিজাত আর জমিদারদের, তা সব তুলে দেওয়া হয়েছে কৃষকদের হাতে। গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর নিয়োগ নিষিদ্ধ, গড়া হচ্ছে কৃষকদের উৎপাদনী সমবায়, তাতে ভূমি ও শ্রমের হাতিয়ার যৌথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশের বিকাশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মবদ্ধতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিপাদিত করেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। যেমন:

— বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের ক্ষমতায় আগমন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অবস্থানে তার ক্রমশ উত্তরণ;

— বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তাতে মেহনতিদের ভূমিকা বৃদ্ধি;

— মেহনতিদের গণসংগঠন নির্মাণ, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি;

— মেহনতি কৃষকদের সরাসরি অংশগ্রহণে তাদের স্বার্থে প্রগাঢ় কৃষি পুনর্গঠন, সমবায়ের সুসঙ্গত পলিসি;

— বৃহৎ ও মাঝারি বৈদেশিক ও স্থানীয় ব্যক্তিসম্পত্তির জাতীয়করণ, পাকাপোক্ত রাষ্ট্রীয় সেক্টর গঠন;

— সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ গঠন, মেহনতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক-টেকনিকাল পূর্বশর্ত গড়ার লক্ষ্যে চালিত অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ;

— সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন, যার মধ্যে পড়ে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠন, সমাজতন্ত্রমুখিতার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মেহনতিদের শিক্ষাদান, বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শের প্রচার;

— সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বহির্নীতি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী ও নিবিড় সহযোগিতা।

সমাজতন্ত্রমুখিতা একটা দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। সোজাসুজি সমাজতন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়, সেরূপ নির্মাণ সম্ভব প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চৌহদ্দিতে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধরনের পার্টির পরিচালনায়, আবশ্যিক বৈষয়িক-টেকনিকাল পূর্বশর্ত থাকলে।

সমাজতন্ত্রমুখিতা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়, এটা হল সচেতনভাবে পরিচালিত প্রক্রিয়া। তার

বিকাশের পর্যায় থাকে। কোনো কোনো রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রমুখিতার পথ নিয়েছে সম্প্রতি, কেউ-বা আবার বেশ কয়েক বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কোনো কোনো রাষ্ট্র পদার্পণ করল বিকাশের দ্বিতীয় দশকে।

সমাজতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলির বিকাশের ওপর বিপুল বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। তানজানিয়ার প্রেসিডেণ্ট জ. নিয়েরেরে ঘোষণা করেছেন যে উৎপাদনের উপায়ের ওপর যৌথ মালিকানার নীতি নিয়ে সমাজতন্ত্রই হল একমাত্র ব্যবস্থা যা দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের দাবি মেটায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে একমাত্র গত্যন্তর — সমাজতন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সদ্যোমুক্ত দেশগুলির সহযোগিতা

সমাজতান্ত্রিক আর সদ্যোমুক্ত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা একটা নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সমাধিকারী পরস্পর লাভজনক সহযোগিতা ও সহকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয় অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল সাহায্য, কর্মী প্রস্তুতিতে সহায়তা, আর্থিক সংস্থান

ইত্যাদি। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সহযোগিতা চালাচ্ছে ৯০টি উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে। তাদের সহায়তায় গঠিত হয়েছে ও হচ্ছে ৪৫০০টির বেশি শিল্প ও কৃষির উদ্যোগ, তৈরি হয়েছে ১০ লক্ষাধিক বিশেষজ্ঞ।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদের সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ একটি রূপ হল সমাধিকারী ও পরস্পর লাভজনক বাণিজ্য। বাণিজ্য চলে দীর্ঘকালীন আন্তঃসরকারি চুক্তির ভিত্তিতে। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে আমদানির ওপর শুল্ক একেবারে তুলে দিয়েছে। যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ৯০ শতাংশ রপ্তানিই যায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। যন্ত্রপাতি যা পাঠানো হয় সেগুলি সেরা মানের, সেখানকার আবহাওয়ার উপযোগী করে তাতে অদলবদল করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররা উন্নয়নশীল দেশেদের দেয় ১০-১২ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ক্রেডিট বছরে ২-২·৫% হারে। অর্থনৈতিক সাহায্য কোনো রাজনৈতিক বা অন্যান্য শর্তাধীন নয়, তা ব্যবহৃত হয় কেবল উৎপাদনের লক্ষ্যে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে সাহায্য দেয় তার ২/৩ ভাগই যায় এসব দেশের জাতীয় শিল্পোন্নয়নে। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রেডিটে ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির পক্ষে নিজেদের স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলা সহজ হয় আর তার

শর্ত খাতক দেশের মর্যাদাহানিকর নয়। তাদের সাহায্যে নির্মিত উদ্যোগের পরিচালনা বা মুনাফায় কোনো অংশ নেয় না সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। অর্থনৈতিক নির্মাণে তাদের যা অভিজ্ঞতা সেটা তারা সাগ্রহে এবং বিনামূল্যে তুলে দেয় এইসব দেশের ব্যবহারে। বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরা গোটাগুটি এক-একটা শিল্প সমাহার সুসজ্জিত করে দেয়, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্যোমুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বহিরর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত ও সুগভীর করে তোলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরিষদভুক্ত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ চালিত হয় লেনিনের এই কথা থেকে যে এইসব জাতি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হতে পারে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নে, সজ্ঞানে বা সচেতন না থেকে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর অর্থনৈতিক আবশ্যিকতা স্বীকারে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।*

মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াসী দেশ ও জাতিগুলি প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার আগ্রাসনী পলিসিতে দৃঢ় প্রত্যাঘাত হানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ। নতুন শক্তি অনুপাতের পরিস্থিতিতে বহু ক্ষেত্রে এশিয়া ও

---

* দ্রঃ লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪২, পৃঃ ১০৭।

আফ্রিকার জনগোষ্ঠীগুলির ব্যাপারে খোলাখুলি হস্তক্ষেপ করার সাহস পায় না সাম্রাজ্যবাদ। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধিতে কেবল যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উত্থানে সাহায্য হয়েছে তাই নয়, এমন পরিস্থিতিও তা গড়ে দিয়েছে, যাতে আগেকার ঔপনিবেশিক প্রভুত্বাধীন অনেকগুলি রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কম যন্ত্রণাকর উপায়ে, সশস্ত্র সংগ্রাম বিনাই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন।

আন্তর্জাতিকতাবাদী ধ্যানধারণায় চালিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল সাহায্য দেয় উন্নয়নশীল দেশগুলিকে। আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সাহায্য করে তাদের নিজস্ব সামরিক বলের, প্রতিরক্ষাসামর্থ্যের শক্তিবৃদ্ধিতে। সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে শক্তির মৈত্রী হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, মুক্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের রণনীতি

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রধান শক্তি কেবল এইখানে নয় যে তা নতুন কমিউনিস্ট জীবন নির্মাণের ধ্যানধারণায় শ্রমজীবীদের সশস্ত্র করে। পারমাণবিক

প্রলয় থেকে মানবজাতিকে রক্ষা, সমস্ত জনগণের শান্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মতো শক্তির আরো বৃদ্ধির জন্য সংগ্রামেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটা প্রবল অস্ত্র।

মার্কস আগেই দেখিয়ে গেছেন যে যুদ্ধের সামাজিক মূল প্রোথিত থাকে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী সমাজের প্রকৃতিগত বৈরিতার মধ্যে। পুঁজিতন্ত্রে যুদ্ধের কারণ হল মুনাফার পিছনে বুর্জোয়াদের ছোটা। মুনাফার লোভেই বুর্জোয়া 'জাতীয় কুসংস্কারকে কাজে লাগায়, লুঠেরা যুদ্ধগুলোয় রক্তপাত করে, ছিনিমিনি খেলে জনগণের সম্পদ নিয়ে।'*

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দেখিয়েছে যে পুরনো শোষক সমাজ আর তার অর্থনৈতিক নিঃস্বতা ও রাজনৈতিক উন্মত্ততার জায়গায় অনিবার্যই আসবে এমন সমাজব্যবস্থা, যার আন্তর্জাতিক নীতি হবে শান্তি, কেননা প্রত্যেকটি জাতিরই থাকবে একই প্রভু — শ্রম! সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর জোট 'নির্মূল করবে সবরকম যুদ্ধ', জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের সর্বোচ্চ নীতি হবে নৈতিকতা ও ন্যায়ের সাধারণ মানবিক বিধি। মার্কস বলেছেন, তেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্য সংগ্রাম হল 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের অঙ্গ।'**

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ১৬, পৃঃ ১১।

** ঐ।

সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম কাজটাই যে ছিল শান্তির ডিক্রি গ্রহণ, অসাধারণ তার প্রতীকী তাৎপর্য। ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর) ২য় সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশনে লেনিনের প্রতিবেদনক্রমে গৃহীত হয় এটি। কংগ্রেসের একজন অংশী মহান এই ঘটনাটার এই বর্ণনা দিয়েছেন: 'ক্লেশজর্জর লোকেদের প্রাণ শান্তির জন্যে আকুল।... 'কী ভায়া, শান্তি স্থাপন হবে, নাকি হবে না?' — প্রায়ই জিগ্যেস করছিল প্রতিনিধিরা।

শেষ পর্যন্ত লেনিন উঠে দাঁড়ালেন এবং সে সম্পর্কে বললেন। উত্তেজিত প্রথম কয়েকটা কথাই লোককে একেবারে আকৃষ্ট করে নিল, 'শান্তির প্রশ্নটা একটা টনটনে প্রশ্ন, অসহ্য প্রশ্ন, তা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, লেখা হয়েছে আপনারাও তা নিয়ে নিশ্চয় কম আলোচনা করেন নি।'

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'কেবল শান্তির কথাই ভাবি, বলাবলি করি, সত্যি বলেছ কমরেড লেনিন!'

লেনিন তার জবাবে বললেন, 'তাহলে অনুমতি করুন, ঘোষণাটা পাঠ করে শোনাই...'

আর যখন তিনি 'শান্তির ডিক্রি' ঘোষণা করছিলেন, তখন এমন নিস্তব্ধতা যেন লোকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। তারপর সমস্ত হল যেন হাঁপ ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেলল, আর তার পরেই ফেটে পড়ল করতালির ঝড় আর বজ্রনাদ, উল্লাস ধ্বনি...'

ডিক্রিতে যুদ্ধকে 'মানবজাতির বিরুদ্ধে এক মহা অপরাধ' বলে ধিক্কার দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয়

সমস্ত জনগণের পক্ষে একই রকম ন্যায্য শর্তে, রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ বিনা অবিলম্বে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সংকল্প। স্বহস্তে ক্ষমতা নিয়ে জনগণ প্রথমেই শুরু করল শান্তির জন্য সংগ্রাম, নিজেদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করল সমগ্র মানবজাতিকে।

একই সময়ে প্রথম শ্রমিক-কৃষক সরকার সারা দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করল যে নতুন রাশিয়া আগ্রাসনের আপোসহীন শত্রু, দখলদারি যুদ্ধের শত্রু, সেই সঙ্গে জাতিতে জাতিতে শান্তি ও মৈত্রীর সঙ্গতিপরায়ণ পক্ষপাতী।

লেনিন রচনা করেন শান্তিকামী বৈদেশিক পলিসির মূলনীতি, বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধীন, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। কী তার অর্থ? শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অর্থ হল জাতিগুলির মধ্যে বিতর্কমূলক প্রশ্ন সমাধানের উপায় হিশেবে যুদ্ধ বর্জন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার মীমাংসা; রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, পরস্পরের স্বার্থ বিবেচনা; অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, প্রতিটি জাতির স্বাধীনভাবে স্বদেশের সমস্ত প্রশ্ন সমাধানের অধিকার স্বীকার; সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্ব ও অঞ্চলের অখণ্ডতাকে কঠোরভাবে মেনে চলা; পরিপূর্ণ সমতা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিকাশ।

শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখিয়েছে

লেনিনবাদ। শান্তির পরিস্থিতিতে সহস্রগুণ দ্রুত কাটিয়ে ওঠা যায় পুরনো দুনিয়া থেকে পাওয়া পশ্চাৎপদতা, প্রস্ফুরিত হয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, অবারিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধা। যেসব কারিকায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়ে ওঠে, তা নির্ধারণ করেছে লেনিনবাদ। তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব ধরে:

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি, যার মধ্যে যুদ্ধে আগ্রহী শ্রেণী বা সামাজিক গ্রুপ নেই;

সমাজতন্ত্রের বর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি যা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সংযত রাখে;

ভূগোলকের জনগণের স্বার্থের পক্ষে সমাজতন্ত্রের শান্তিকামী পলিসির উপযোগ্যতা;

পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র, উপনিবেশ, পরাধীন দেশগুলির মেহনতি জনগণের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও চেতনার বৃদ্ধি, জাতিতে জাতিতে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষায় তাদের বর্ধমান আগ্রহ;

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী, আন্তঃএকচেটিয়া বিরোধ, যাতে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানো সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে;

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে কারবারি সম্পর্ক রাখায় কিছু কিছু বুর্জোয়া মহলের স্বার্থাগ্রহ।

তবে শান্তিতে সহাবস্থানের অর্থ মোটেই সাম্রাজ্যবাদীদের 'বুঝিয়ে সুজিয়ে' রাজি করানো — তাদের 'ভালোমানুষ হবার জন্য' মিনতি করা নয়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিটা 'বোঝানো সোজানোর' নীতি নয়, 'তোয়াজ' করার নীতি তো একেবারেই নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের কাছে শান্তি ভিক্ষে করা নয়, শান্তিকামী শক্তিদের একত্রে সতেজ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শান্তি চাপিয়ে দেওয়াই হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতির অর্থ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কেবল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্র নিয়ে। তাই পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কে এ নীতির অনুসরক সমাজতন্ত্রের বৈদেশিক পলিসি আর স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য অন্যান্য জনগণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের একাত্মতার মধ্যে কোনো স্ববিরোধ নেই। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম নাকচ হতে পারে না।

বিপরীত সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতি কমিউনিস্টদের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাপকতম জনসাধারণকে, সাম্রাজ্যবাদের জঙ্গী শক্তিগুলিকে অচল করে রাখে, প্রতিবিপ্লবের রপ্তানি, মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সংগ্রামকে কঠিন করে তোলে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল বিশ্ব বিকাশের অবজেকটিভ চাহিদা, বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থাটার স্থিতিশীলতার ভিত্তি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প, সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো সমাধান নেই। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান স্রেফ কেবল যুদ্ধের

অবিদ্যমানতাটুকুই নয়। এটা এমন একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যাতে প্রাধান্য করে সামরিক শক্তি নয়, সুপ্রতিবেশিত্ব আর সহযোগিতা, সমগ্র জনগণের হিতার্থে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির, সাংস্কৃতিক মূল্যগুলির ব্যাপক বিনিময় চলে। সামরিক প্রয়োজনে বিপুল সম্পদের অপচয় থেকে মুক্তি পেলে শ্রমের ফলকে পুরোপুরি সৃজনের লক্ষ্যে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। যেসব রাষ্ট্র স্বাধীন বিকাশের পথ নিয়েছে, বাইরের হামলা থেকে তারা রক্ষা পেতে পারে, ফলে জাতীয় ও সামাজিক উন্নতির দিকে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হয়। সমস্ত রাষ্ট্রের যৌথ প্রয়াসে গোলকব্যাপী সমস্যাগুলি সমাধানের অনুকূল সুযোগ খুলে যেতে পারে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতির স্বার্থ মেটে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭শ কংগ্রেসে (১৯৮৬) সংরচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সর্বব্যাপী ব্যবস্থার নীতিগত বনিয়াদ। এ ব্যবস্থায় আছে:

১। সামরিক ক্ষেত্রে

— পারমাণবিক শক্তিগুলির পক্ষ থেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে তথা তৃতীয় কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যেমন পারমাণবিক তেমনি সাধারণ যুদ্ধ বর্জন;

— মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা নাকচ, নিউক্লিয়ার অস্ত্রের সমস্ত পরীক্ষা বন্ধ এবং তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, রাসায়নিক অস্ত্র নিষেধ ও তার বিলুপ্তি, ব্যাপক সংহারের অন্যান্য উপায় নির্মাণে আপত্তি;

— যথোচিত বলে যা সুবিবেচিত তেমন সীমার মধ্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাষ্ট্রগুলির সামরিক সম্ভাব্যতার মাত্রা হ্রাস;

— সামরিক জোটগুলির বিলোপ, তার একটা ধাপ হিশেবে তাদের প্রসার ও নতুন জোট সৃষ্টিতে অস্বীকৃতি;

— সামরিক বাজেটের সমানুপাতিক ও সমপরিমেয় হ্রাস।

২। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

— আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজেদের বিকাশের পথ ও রূপের সার্বভৌম নির্বাচনের অধিকারের প্রতি শর্তহীন শ্রদ্ধা;

— আন্তর্জাতিক সংকট ও আঞ্চলিক সংঘাতগুলির ন্যায্য রাজনৈতিক নিয়মন;

— রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি, বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার, তাদের সীমানা অলংঘনীয়তার সত্যকার গ্যারাণ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা সমাহার সংরচন;

— স্থলভাগে, আকাশে ও সমুদ্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ পথের নিরাপত্তা সমেত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিবারণের ফলপ্রদ পদ্ধতি প্রণয়ন;

৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

— আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপে সব ধরনের বৈষম্য নাকচ; বিশ্ব সমাজের সরাসরি সুপারিশের মধ্যে না পড়লে অর্থনৈতিক অবরোধ ও নিষেধের পলিসি বর্জন;

— একত্রে ঋণগ্রস্ততা সমস্যার ন্যায্য নিয়মনের পথ সন্ধান;

— নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, যাতে সমস্ত রাষ্ট্রের সমান অর্থনৈতিক নিরাপত্তা গ্যারাণ্টিকৃত;

— সামরিক বাজেট হ্রাসের ফলে যে সঙ্গতি মুক্তি পাবে, তার একাংশ বিশ্ব সমাজের, সর্বাগ্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির কল্যাণে নিয়োগের নীতি সংরচন;

— মহাকাশের গবেষনা ও শান্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে, সভ্যতার ভাগ্য নির্ভর করছে যেসব বিশ্ব সমস্যার ওপর, তার সমাধানে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।

৪। মানবিক ক্ষেত্রে

— শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ভাবধারা প্রচারে সহযোগিতা; সাধারণ অবজেকটিভ অবগতি, জনগোষ্ঠীগুলির জীবনের পারস্পরিক পরিচয়ের মান বৃদ্ধি; তাদের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্মতির সম্পর্ক দৃঢ়করণ।

— সামূহিক জাতি সংহার, বর্ণগত বেড়ার, ফ্যাসিবাদ এবং অন্য সবধরনের বর্ণগত, জাতিগত বা ধর্মীয় ঐকান্তিকতার প্রচার আর তার ভিত্তিতে লোকেদের মধ্যে বৈষম্যের উৎপাটন;

— প্রতিটি দেশের আইন মান্য করে মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার;

— পরিবারের সংযুক্তি, বিবাহবন্ধন, লোকেদের ও সংগঠনাদির মধ্যে যোগাযোগ বিকাশের যে প্রশ্ন, মানবিক ও গঠনমূলকতার প্রেরণায় তার সমাধান;

— সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহযোগিতার বৃদ্ধি ও নতুন রূপের সন্ধান।

এই ভিত্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি থেকে আসে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই। মূর্ত-নির্দিষ্ট সোভিয়েত বহির্নৈতিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে তা পুরোপুরি মেলে। এগুলির দ্বারা চালিত হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হয়ে উঠতে পারে সর্বোচ্চ সর্বজনীন নীতি।

দুই ব্যবস্থার অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিভূমি। দুই ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হল বর্তমান যুগের অবজেকটিভ নিয়ম।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার নির্ধারক ক্ষেত্র হল বৈষয়িক উৎপাদন, যাতে শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে যায় সমাজ জীবনের সমস্ত দিকের বিকাশ। পুঁজিবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় থাকে একটা তীব্র, উত্তেজনাময় শ্রেণী-সংগ্রামের চরিত্র। বিনা সংগ্রামে বিশ্ব পুঁজিতন্ত্র তার অবস্থান ছেড়ে দেয় না। দুই বিপরীত ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বেশ একটা গুরুত্ব ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিযোগিতা শুরু করতে হয় নানা দিক থেকে তার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থায়। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের আগে

পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল কৃষিপ্রধান পশ্চাৎপদ দেশ। গৃহযুদ্ধ এবং ১৯১৮-১৯২২ সালে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ থেকে সামরিক হস্তক্ষেপের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পোৎপাদন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ৪৫-৫০ গুণ কম। সোভিয়েত অর্থনীতির প্রচণ্ড ক্ষতি হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে। তার ফলে মোট যে বৈষয়িক লোকসান যায়, সেটা সে সময়কার পক্ষে বিরাট একটা অংক — ২৬,০০০ কোটি রুবল। নিশ্চিহ্ন হয় দেশের জাতীয় সম্পদের প্রায় ৩০ শতাংশ। মারা যায় ২ কোটির বেশি সোভিয়েত মানুষ, যেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যা ৫ কোটি। এগুলির সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত ধ্বংস হয়ে যাওয়া সোভিয়েত নগর, গ্রাম, উদ্যোগ ইত্যাদির মূল্য।

তা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের সুবিধার কল্যাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিহাসের পক্ষে অল্প কালের মধ্যেই বিপুল সাফল্য লাভ করে অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতির বিকাশে। দুই ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ একটা সূচক হল বৈষয়িক উৎপাদনের, শিল্পের বিকাশের হার। এ হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েক গুণ বেশি। শিল্পোৎপাদনের পরিমাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপের পশ্চিম জার্মানি, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মতো বড়ো বড়ো দেশের মোট পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গেছে।

বর্তমানেই জীবনযাত্রার মানের কয়েকটা দিকে (কর্মের নিশ্চিতি, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিনামূল্যে

শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক বীমার সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা, বিশ্রাম, ক্রীড়া ইত্যাদি) সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এগিয়ে আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের লোকেরা জানে না শোষণ, বেকারি, সংকট, বেতনে জাতিগত বা অন্যান্য বৈষম্য কী জিনিস। আগামী দিনের জন্য তাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো নাগরিকদের সামাজিক রক্ষণের সর্বব্যাপী ব্যবস্থা কোনো একটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশেও নেই।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ একটা সূচক হল বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল প্রগতি। পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞান ও টেকনিকের নির্ধারক তাৎপর্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন লেনিন। তিনি বলেন, '...সেই জিতবে, যার আছে চমৎকার টেকনিক, সংগঠনশীলতা, শৃঙ্খলা, আর সেরা যন্ত্রপাতি।'* বর্তমানে সমগ্রভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে বৈষয়িক-টেকনিকাল বনিয়াদ আছে, তাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল প্রগতির বৃদ্ধিহার আরো বেশি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত পুঁজিতন্ত্র পরাস্ত হতে পারে এবং হবে এই জন্য যে উৎপাদনী শক্তি, বিজ্ঞান, টেকনিক ও সংস্কৃতি বিকাশের এমন নতুন প্রেরণা সমাজতন্ত্র উন্মুক্ত করে যা বুর্জোয়া ব্যবস্থার পক্ষে

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৬, পৃঃ ১১৬।

অনধিগম্য, শ্রমের অনেক বেশি উৎপাদনশীলতা তাতে সম্ভব।

বলাই বাহুল্য, আগামী বিকাশের কোনো একটা দিকের বিকাশ ধারার খুঁটিনাটির ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্নটাকে যদি খুঁটিনাটি বা সম্ভবপর আপতিকতার দিক থেকে বিচার না করি, লেনিন যা বলেছেন, যদি 'ব্যাপারটাকে তার বিপুল পরিসরে ধরা হয়, তাহলে টুকরো-টুকরা, খুঁটিনাটিগুলো ঝরে যায় আর যে মূল চালিকা শক্তি বিশ্ব ইতিহাসকে নির্ধারিত করে তা স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'* আর ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি যদি জানা থাকে, যদি ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তাহলে দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের পরিণাম ফলটাও হয়ে ওঠে স্বতঃস্পষ্ট — বিশ্বায়তনে কমিউনিজমের বিজয়।

শান্তি — সমাজতন্ত্রের আদর্শ

সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ে সূচিত হয় যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পথে বাধা দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্র রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের বিপুল শক্তি। শান্তির জন্য সংগ্রামের নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজতন্ত্র। শোষণ ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে যুদ্ধের

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৪০, পৃঃ ১৬৭।

মতো তার ফলশ্রুতিকে তা মৃত্যুদণ্ডিত করছে। লেনিন এই কথায় জোর দেন যে 'যুদ্ধের সমাপ্তি, জাতিতে জাতিতে শান্তি, লুণ্ঠন ও বলপ্রয়োগের অবসান — ঠিক শান্তিই হল আমাদের আদর্শ...।'*

যুদ্ধের জন্য সংগ্রাম হল সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রের মহত্তম একটা শ্রেষ্ঠত্ব। জনগণকে যাতে ধোঁকা দিয়ে যুদ্ধে টানা না হয় যুদ্ধ যাতে চুকে যায়, শান্তির পাকাপোক্ত পরিস্থিতি গড়ে ওঠে, এই ছিল অস্তিত্বের গোটা সময়টা ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র পলিসির লক্ষ্য। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে লেনিন বলেছিলেন, 'এবার শান্তির জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এটা কঠিন সংগ্রাম। কে ভেবেছিল যে শান্তি সহজেই পাওয়া যায়, ঠোঁট থেকে শান্তির কথাটা খসানো মাত্রই বুর্জোয়া আমাদের তা প্লেটে করে এনে দেবে, সে একেবারে বাতুল।'**

বর্তমানে শান্তি রক্ষা ও পাকা করা একটা সর্বমানবিক সমস্যা। পারমাণবিক যুদ্ধ কোনো মহাদেশকেই কৃপা করবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'জেহাদের' আয়োজন করছে। কমিউনিজমকে ইতিহাসের ভস্মস্তূপে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অসাধ্য একটা লক্ষ্য গ্রহণ করেছে মার্কিন শাসক মহল — বিশ্বের প্রগতিশীল

---

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩০৪।

** লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ১১৬।

পরিবর্তনের পথে বাধা দেওয়া ঐতিহাসিক বিকাশের গতিকে পেছনে ঠেলা।

পারমাণবিক এবং ব্যাপক সংহারের অন্যান্য অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় পাকের পর পাক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে কল্পনাতীত অর্থ ব্যয় করছে। কোটি কোটি ডলার ঢালা হয়েছে স্ট্রাটেজিক আক্রমণ শক্তি বাড়িয়ে তোলায়, প্রথম নিউক্লিয়ার আঘাত হানার অস্ত্র গড়ায়, রাসায়নিক অস্ত্র সঞ্চয়ে, মহাজাগতিক হানাদারি কমপ্লেক্স নির্মাণ ইত্যাদিতে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোতায়েন করেছে প্রথম আঘাতের নিউক্লিয়ার রকেট 'পেরশিঙ্গ-২' এবং ক্রুইজ রকেট, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের নিরাপত্তা ক্রমাগত বিপন্ন করে তুলছে।

শান্তির পক্ষে অসাধারণ একটা বিপদ হল মহাজগতের সামরীকরণের মার্কিন পলিসি। শত শত কোটি ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খরচ করছে স্পুতনিক-বিরোধী ব্যবস্থা গড়ার জন্য, যা প্রধানত কাজ করবে সামরিক উদ্দেশ্যে।

পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা, তার আগুনে পুড়ে ছাই হতে পারে শত শত কোটি লোক, জীবন বিলুপ্ত হতে পারে পৃথিবী থেকে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনী শক্তির বেপরোয়া দুষ্প্রয়াসী ক্রিয়াকলাপে মানবজাতির সামনে আজ যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সেটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি

এবং সেটা আমরা উচ্চ কণ্ঠেই ঘোষণা করে সে বিপদের দিকে গোটা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সামরিক শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের প্রয়োজন নেই, অন্যদের ওপর হুকুম চালাবার কোনো ইচ্ছে নেই আমাদের, কিন্তু যে সামরিক ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে, সেটা নষ্ট হতে আমরা দেব না। কারো যেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে: আমাদের প্রতিরক্ষাসামর্থ্য সুদৃঢ় করার জন্য, জঙ্গী হয়ে ওঠা দুষ্প্রয়াসীদের গরম মাথা ঠাণ্ডা করবার মতো যথেষ্ট উপায় যাতে আমাদের থাকে তার জন্য ভবিষ্যতেও আমরা সযত্ন থাকব।'

সোভিয়েত কমিউনিস্টরা শান্তির যে কর্মসূচি রচনা করেছে, বিশ্বের জনগণের কাছে তা সুবিদিত। এ কর্মসূচিতে সর্বাগ্রে নিম্নোক্ত কর্তব্যগুলি গ্রহণ করা হয়েছে:

— ভ্রাতৃকল্প সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঐক্য অবিচলে সুদৃঢ় করে এবং নতুন সমাজ নির্মাণে তাদের সহযোগিতা বাড়িয়ে তুলে শান্তির সংহতিতে তাদের সক্রিয় একত্র অবদান বর্ধন;

— শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক, ক্রমবর্ধমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সঞ্চিত অস্ত্রের হ্রাসে এবং নিরস্ত্রীকরণে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা;

— আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমনকে আরো সুগভীর করা, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর লাভজনক সহযোগিতায় তার রূপায়ণের জন্য সবকিছু করা, ১৯৭৫ সালের হেলসিঙ্কির সারা ইউরোপীয় সম্মেলনের উপসংহার দলিলকে পুরোপুরি বাস্তবে

পরিণত করা, ইউরোপে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা বিকাশের পথ সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা;

— এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির একত্র প্রয়াসের ভিত্তিতে এশিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে এগিয়ে যাওয়া;

— আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ না করার জন্য বিশ্ব চুক্তি সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা;

— পীড়ন, জাতিদের সমাধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘনের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সমস্ত অবশেষ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কর্তব্য বলে গণ্য করা;

— আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈষম্য ও সর্ববিধ কৃত্রিম প্রতিবন্ধক বিদূরণ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে অসাম্য, হুকুমদারি, শোষণের যেকোনো প্রকাশ বিলোপের জন্য চেষ্টা করা।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রথম প্রয়োগ না করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান দুনিয়ার ভাগ্যের পক্ষে তার গুরুত্ব বিপুল। এ প্রতিশ্রুতি গ্রহের শান্তিকামী সমস্ত শক্তির কাছ থেকে উদ্দীপ্ত সাড়া ও সমর্থন লাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে: পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচি রচনা, গ্রহণ ও ধাপে ধাপে কার্যে পরিণতি, স্ট্রাটেজিক অস্ত্র সীমিতকরণ ও হ্রাস, ইউরোপে পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ ও হ্রাস, সকলের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষেধ, পারমাণবিক অস্ত্র আর ছড়াতে না

দেওয়া, রাসায়নিক অস্ত্র নিষেধ ও বিলোপ, মহাকাশে যেকোনো ধরনের অস্ত্র স্থাপন নিষেধ, সাধারণ অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা সীমিতকরণ ও হ্রাস, সামরিক বাজেট হ্রাস, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ক্ষেত্রের সকৃতি ও নতুন আবিষ্কারকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা, ইত্যাদি। অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এইসব ব্যবস্থার সমাহার কার্যে পরিণত হলে মানবজাতির বিপুল বৈষয়িক সম্পদের সাশ্রয় হতে পারে এবং তাতে করে সামাজিক প্রগতির গতিবেগ অনেক বাড়বে এবং প্রধান কথা — পারমাণবিক বিপর্যয়ের বিপদ দূর হবে।

শান্তির জন্য সংগ্রাম কমিউনিস্টদের একটা ট্যাকটিকাল চাল নয়, যা বলে থাকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা, এ হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি। শান্তির পলিসি হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈদেশিক নীতির সাধারণ লাইন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কমূলক সমস্ত প্রশ্ন সমাধানের পক্ষপাতী সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু বলাই বাহুল্য, কেবল সমতা, একই রকম নিরাপত্তা আর অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার ভিত্তিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বহির্নীতি, তার কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের নানা উদ্যোগকে অনুমোদন ও সমর্থন করে বিশ্বের শান্তিকামী জনসমাজ।

পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তির চিন্তা লোকে করে আসছে বহুদিন থেকে। খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতকেই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) শান্তিতে সমস্ত কলহের মীমাংসা হবার স্বপ্ন দেখতেন। যুদ্ধ পরিহার করে পাকাপোক্ত শান্তি স্থাপনের একটা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন জাঁ-জাক রুসো। কিন্তু মার্কস যা বলেছেন, 'শান্তির আগে যুদ্ধই পেল পরিণত রূপ।'*

তার মানে এই নয়, যে শান্তিকে ভবিষ্যতেও একঘরে হয়ে থাকতে হবে। স্বর্ণকবচধারী অতৃপ্ত রণদেবের সামনে থেকে সংকোচে সরে যেতে হবে তাকে আর অতীতের মতো তার রক্তাক্ত জয়যাত্রা শেষ হবে করোটির স্তূপে। না, বিশ্ব সভ্যতার প্রকৃতি, তার বিকাশের নিয়মটাই এমন যে মানবজাতির অস্তিত্বের একমাত্র শর্তই হল জাতি ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুপ্রতিবেশী সম্পর্ক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেদের সঙ্গে বর্তমানে শান্তির পক্ষপাতীদের দলে রয়েছে জোট-বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলিরও একটি বড়ো গ্রুপ, যুদ্ধে যাদের আগ্রহ নেই, জাতীয় পুনর্জন্মের জন্য যাদের দরকার শান্তি। শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলি, খণ্ড ৪৬, অংশ ১, পৃঃ ৪৬।

স্বীকার করছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ব্যাপক জনসমাজও, কাণ্ডজ্ঞান রাখে বুর্জোয়া সমাজের এমন চিন্তাশীল রাজনীতিকরাও।

জনগণের জীবন থেকে যুদ্ধ বর্জনের প্রশ্নটা অতি জরুরি এবং পুরোপুরি বাস্তব একটা কর্তব্য। আজকের মতো এতটা দুরবস্থার ভয় যুদ্ধে আগে কখনো ছিল না। কিন্তু শান্তির পক্ষে দণ্ডায়মান এত প্রবল শক্তিও আগে দেখা যায় নি কখনো। শান্তি রক্ষার প্রধানতম কারিকা হল সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা। তার পরাক্রম বৃদ্ধি, উৎপাদনী শক্তির অবিরাম বিকাশ, বিকশিত সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণীকরণের দিকে সাফল্য, প্রতিরক্ষার সুদৃঢ়তা — এ সবই হল শান্তির জন্য কার্যকর সংগ্রাম।

শান্তি রক্ষা ও পারমাণবিক প্রলয় নিবারণের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হল বিশ্ব শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গুরুরা শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রত দেখেছিলেন কেবল পীড়ন, শোষণ, দারিদ্র্য আর অধিকারহীনতার অবসান করার মধ্যেই নয়, রক্তাক্ত যুদ্ধ থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়াতেও। যে শক্তিগুলির শিয়রে মরণ, তারা কোটি কোটি লোককেও নিজেদের সঙ্গে কবরে টেনে নিয়ে যাবে, শ্রমিক শ্রেণী এটা হতে দিতে পারে না। শান্তির জন্য দৃঢ় সংকল্পে সংগ্রাম চালায় তারা।

শ্রমিকেরা হল রাজনৈতিক দিক থেকে অগ্রণী শ্রেণী। অন্যদের চেয়ে তারা ভালো করে ও গভীর ভাবে বোঝে যুদ্ধ বাধার আসল কারণ, তাই যুদ্ধ নিবারণের

সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি সে সামনে তুলে ধরে। প্রলেতারিয়েত বেশি সংগঠিত ও সম্মিলিত, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সঙ্গতিপরায়ণ সংগ্রাম চালায় তারা। তাদের মস্তো একটা সুবিধা এই যে তাদের নেতৃত্বে রয়েছে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিরা, যারা সবচেয়ে অগ্রণী একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব — মার্কসবাদ-লেনিনবাদে চালিত। বর্তমানে নতুন বিশ্ব যুদ্ধ নিবারণের চাইতে জরুরি কর্তব্য আর কিছু নেই। সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, ৮০'র দশকে তা সঞ্চয় করেছে অভূতপূর্ব শক্তি। বর্তমানের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন হল সমস্ত মহাদেশে ব্যাপকতম জনগণের এক আন্দোলন, যারা লড়ছে সাম্রাজ্যবাদ, তার আগ্রাসন ও পীড়নের পলিসির বিরুদ্ধে শান্তির জন্য। পারমাণবিক মৃত্যু রোধ হল পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে শত শত কোটি লোকের সাধারণ সাধনা। বিভিন্ন তাদের রাজনৈতিক মতামত, ধর্মবিশ্বাস, বিশ্ববীক্ষা, কিন্তু মিলিত তারা মানুষের সর্বোচ্চ অধিকার — বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তায়।

সাম্প্রতিক যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়েছে ৭০ আর ৮০'র দশকের সংযোগস্থলে, তাতে পরিষ্কার দেখা যায় পরস্পরের সঙ্গে জড়িত দুটো পর্যায়। প্রথমটা চলে ১৯৮৩ সালের শেষ পর্যন্ত, যখন রূপলাভ করছিল শান্তিকামী শক্তিগুলির বিশ্ব কোয়ালিশন, পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রথম আঘাতের নতুন নিউক্লিয়ার রকেট বসাবার মার্কিন ও ন্যাটো পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যখন জনগণের প্রতিবাদ

আন্দোলনের ফলপ্রসূ রূপের সন্ধান চলছিল। এই পর্বে যুদ্ধবিরোধী অভিযানের বিপুল তরঙ্গ জাগে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপানে। জার্মান ফেডারেশন, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্কে শান্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ যাত্রায় লোক হতে থাকে দশ লক্ষ অবধি। এইসব দেশের ইতিহাসে এই প্রথম যুদ্ধবিরোধী অভিযান হয়ে দাঁড়ায় সর্বাধিক জনবহুল বিরাট একটা ব্যাপার। যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামের অভূতপূর্ব এই জোয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ফল হল এই যে পারমাণবিক যুগে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন এসে গেল সাধারণ লোকের মনোযোগের কেন্দ্রে, নিজের জীবন আর পৃথিবীতে সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আন্দোলনে ব্যক্তিগত যোগদানের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল তারা।

১৯৮৩ সালের শেষে যখন ইউরোপ মহাদেশে এসে গেল 'পেরশিঙ্গ-২' আর ক্রুইজ রকেট, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তখন প্রবেশ করল তার বিকাশের নতুন পর্যায়ে। যুদ্ধবিরোধী গণ আন্দোলনের প্রধান প্রয়াস হল মার্কিন রকেট মোতায়েন বন্ধ করা, স্থাপিত রকেটগুলিকে সরানো, রকেট বসাবার আগে ইউরোপের পূর্বে ও পশ্চিমে যে অবস্থা ছিল সেটা ফিরিয়ে আনা, পারমাণবিক অস্ত্র বহির্ভূত অঞ্চল গড়া, পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার তদবস্থ রাখা, জীববিদ্যাঘটিত ও রাসায়নিক অস্ত্র নিষেধ, পারমাণবিক অস্ত্র প্রথম প্রয়োগ না করার চুক্তি সম্পাদন, মহাকাশের সামরীকরণ হতে না দেওয়া।

বর্তমান যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী, কলকারখানার কর্মিবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি। যারা সাম্রাজ্যবাদী সামরিকতায় ধিক্কার দিচ্ছে, লাগাম-ছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতা আর মহাকাশে তা প্রসারিত করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর প্রতিবাদ যাত্রায় অংশ নিচ্ছে, এরাই রয়েছে তাদের প্রথম সারিতে। এরাই পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী শক্তির ঐক্যে, শান্তি, প্রগতি, মানবজাতির আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামে তাদের সমবেত করায় নির্ধারক অবদান যোগ করছে।

জনগণের চেতনায় এই নিশ্চয়তা দৃঢ় হচ্ছে যে যুদ্ধ আর অস্ত্র ছাড়া পৃথিবী বাস্তবে সম্ভব, বিশ্ব যুদ্ধ একটা সর্বনাশা অনিবার্যতা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির নতুন সংস্করণে (১৯৮৬) জোর দেওয়া হয়েছে, 'যুদ্ধ নিবারণ করা, প্রলয় থেকে মানবজাতিকে বাঁচানো যায়। এটাই হল সমাজতন্ত্রের, আমাদের গ্রহের সমস্ত প্রগতিশীল শান্তিকামী শক্তির ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

'বিশ্ব বিকাশের সমগ্র গতি থেকেই সমর্থিত হচ্ছে বর্তমান যুগের চরিত্র ও মর্মার্থ বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ। এটা হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উত্তরণের, দুই সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার যুগ, সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের যুগ, ঔপনিবেশিকতার ধ্বংসের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার আগ্রাসন ও পীড়ন পলিসির

বিরুদ্ধে শান্তি, গণতন্ত্র আর সামাজিক প্রগতির জন্য সামাজিক বিকাশের প্রধান চালিকা শক্তি বিশ্ব সমাজতন্ত্র, শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন, সদ্যোমুক্ত রাষ্ট্রগুলির জনগণের গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলনের সংগ্রামের যুগ।'

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ, সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্মাণ, সদ্যোমুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংহতি চলছে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতিকে ঠেলে এনেছে নতুন বিশ্ব যুদ্ধের সীমায়। আর তার ছাপ পড়ছে গ্রহের জনগণের সম্মুখস্থ সমস্ত জরুরি সমস্যার সমাধানে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপে প্রধান হয়ে উঠছে শান্তির জন্য সংগ্রাম। কমিউনিস্টরা সর্বদাই ছিল পীড়ন আর মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। এখন তারা আরো লড়ছে মানব সভ্যতা রক্ষার জন্য, মানুষের জীবনের অধিকারের জন্য।

ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ

অজ্ঞেয়বাদ — বিশ্বকে পুরোপুরি বা অংশত জানা সম্ভব নয়, এই মতবাদ।

অত্যুৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকট — পুঁজিতন্ত্রে কিছু কাল পর পর এত বেশি পরিমাণে মাল উৎপাদিত হয় জনগণের আয় অপেক্ষাকৃত নিচু থাকায় যা বিক্রি হতে পারে না। তার প্রধান কারণ পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর বৈষয়িক সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত পদ্ধতির মধ্যে মূলগত বিরোধ।

অধিবিদ্যা — দ্বান্দ্বিকের বিপরীত চিন্তাপ্রণালী। বিকাশকে তা অগ্রাহ্য করে অথবা তাকে পরিণত করে স্রেফ পরিমাণগত পরিবর্তনে, বিকাশের অভ্যন্তরীণ উৎস (ভেতরকার বিরোধ) তা দেখতে পায় না।

অর্থনৈতিক নিয়মাদি — মানব সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগ চলে যা অনুসারে তেমন অবজেকটিভ নিয়মগুলি।

অস্তিত্ব (সত্তা) — মানুষের চেতনার বাইরে, তার ওপর নির্ভর না করে যা বিদ্যমান, বাস্তবতা।

আইন (অধিকার) — আচরণের আদর্শ, নিয়ম, যা নিয়ম রূপে নিবদ্ধ ও রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক কার্যকৃত হয়, নির্দিষ্ট সমাজটির শাসক শ্রেণীর স্বার্থে তা সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ — দেশেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের আঞ্চলিক বণ্টন, এক-এক ধরনের উৎপাদনে তারা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করে।

আমদানি -- দেশের ভেতর বাজারে বিক্রির জন্য বাইরে থেকে নিয়ে আসা পণ্য ও পুঁজি।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র — বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি ও শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে সমাজ পুনর্গঠনের মতবাদগুলি।

উৎপাদনী শক্তি — উৎপাদনের যেসব উপায়ের সাহায্যে বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্ট হয়; এবং লোকেরা যারা

উৎপাদনের হাতিয়ারগুলিকে চালু করে এবং নির্দিষ্ট কিছু উৎপাদনী অভিজ্ঞতা আর শ্রমাভ্যাসের সুবাদে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে।

উৎপাদনী সম্পর্ক — বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, পরিভোগের প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক যা হল সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ।

উৎপাদনের উপায় — বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয় (যন্ত্রপাতি, বীজ, জ্বালানি ইত্যাদি) তার সমষ্টি।

উৎপাদনের নৈরাজ্য — ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক নিয়মগুলির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ায় বিকাশের অন্ধ প্রকোপ, বিশৃঙ্খলা, অসমানতা।

উৎপাদনের প্রণালী — উৎপাদন এবং ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য, উৎপাদনের উপায় এবং ভোগ্য বস্তু উৎপাদনের জন্য লোকেদের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ লাভের ইতিহাস-নির্দিষ্ট প্রণালী। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্ক দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত।

উপরিকাঠামো — কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের (রাষ্ট্র, পার্টি, সামাজিক সংগঠন, ইত্যাদি) রাজনৈতিক,

আইনী, নৈতিক, ধর্মীয় সম্পর্কের সমষ্টি এবং সামাজিক চৈতন্যের রূপ (রাজনীতি, আইন বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, শিল্প)। উপরিকাঠামো ভিত্তি দ্বারা নির্ধারিত এবং তাকেও প্রভাবিত করে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের একটি মূলাঙ্গ, সমাজবিদ্যার সাধারণ তত্ত্ব। সমাজবিকাশের সবচেয়ে সাধারণ নিয়ম ও চালিকা শক্তি বিষয়ে বিজ্ঞান।

ঔপনিবেশিকতা — সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দেশের জনগণকে সোজাসুজি পদানত করে রাখার পলিসি।

কমিউনিজমবিরোধিতা — সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার ভাবাদর্শ ও পলিসি, কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে দেখায়।

গোষ্ঠীতন্ত্র (oligarchy) — শোষণমূলক রাষ্ট্রে শাসনের একটি রূপ, যাতে ক্ষমতা থাকে অল্পসংখ্যক একদল অতিধনী লোকের হাতে।

চার্টিস্ট (ইংরেজি charter বা সনদ থেকে) — উনিশ শতকের ৩০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ৫০-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত ইংরেজ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক-

রাজনৈতিক দাবির (সনদ) ভিত্তিতে গণ বিপ্লব আন্দোলনের অংশী।

জাতীয় আয় — নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে (সাধারণত বার্ষিক) দেশে উৎপাদিত বস্তুর মূল্য।

জাতীয়করণ — ভূমি, শিল্পোদ্যোগ, ব্যাংক, পরিবহণ ইত্যাদির ওপর ব্যক্তির বদলে রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা।

দর্শনের মূল প্রশ্ন — অস্তিত্বের সঙ্গে চেতনার, বস্তুসত্তার সঙ্গে ভাবকল্পের সম্পর্ক। তার দুটি দিক: ১) কোনটা আদি — বস্তুসত্তা নাকি চেতনা এবং ২) বিশ্বকে কি জানা সম্ভব?

দাসপ্রথার সমাজ — মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম বৈরগর্ভ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ সমাজে উৎপাদন চলত উৎপাদনের উপায় এবং খোদ উৎপাদক-দাসেদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ, বৈরী শ্রেণী (দাস এবং দাসমালিক) ছিল তার বনিয়াদ।

দ্বন্দ্বতত্ত্ব — প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার সর্বাধিক সাধারণ নিয়মগুলি বিষয়ে বিদ্যা। উদ্‌ঘাটিত করে সমস্ত বিকাশের অভ্যন্তরীণ উৎস — বিরোধের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন, বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা, বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি, প্রকৃতি, সমাজ, চিন্তনের সাধারণ নিয়মগুলির বিদ্যা।

নয়া-উপনিবেশবাদ — এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় প্রভুত্ব বজায় রাখা বা নতুন চেহারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাম্রাজ্যবাদী পলিসি।

নিয়ম — ঘটনার অভ্যন্তরীণ, গুরুত্বপূর্ণ, সুদৃঢ়, পুনরাবৃত্ত, আবশ্যিক যোগাযোগ। যে কোনো বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল অবজেকটিভ নিয়মের জ্ঞানলাভ।

নীতিশাস্ত্র — অন্যান্য মানুষ আর সমাজের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে লোকেদের পালনীয় নিয়ম আর আদর্শের সমগ্রতা।

পণ্য — শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য, যা নিজের ভোগের জন্য নয়, বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদিত।

পরম সত্য — বিচার্য বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান, যা প্রজ্ঞানের আরো বিকাশেও খণ্ডিত হয় না।

পার্টি — কোনো একটা শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের মূলগত স্বার্থ প্রকাশক রাজনৈতিক সংগঠন, তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নেতৃত্ব দেয়।

পুঁজি — মূল্যের সমষ্টি, ভাড়া খাটানো শ্রমশক্তি শোষণ করে যা বাড়তি মূল্য জোগায়।

পুঁজিতন্ত্র — উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মজুরি-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট — বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন সংকট, যা পরিব্যাপ্ত যেমন অর্থনীতি, তেমনি রাজনীতি ও ভাবাদর্শেও, পুঁজিতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার এমন একটা দশা যাতে সূচিত হয় উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির ভাঙন এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন।

পুনরুৎপাদন — অবিরাম নতুন করে জীবনধারণের উপকরণ বানানো, উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি।

প্রলেতারিয়েত — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায় যেসব লোকের হাতে নেই, ফলে সে উপায়ের মালিক পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়, মজুরি-খাটা তেমন লোকেদের শ্রেণী।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি — বাহ্যত যাই থাক বুর্জোয়ার ধনবৃদ্ধির তুলনায় শ্রমিকদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকদের শ্রমে উৎপন্ন সমস্ত সম্পদে তাদের ভাগ ক্রমাগত হ্রাস)।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা। তা কাজে লাগানো হয় সে বিপ্লবের বিজয়ে উৎখাত শোষক শ্রেণীকে দমন, সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা — জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত জনগোষ্ঠীর সমতা ও সমাধিকার মানে এমন বিশ্ববীক্ষা। শোষণ, পীড়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা সমস্ত দেশের মধ্যে কর্মের ঐক্য ও একাত্মতা দাবি করে।

বনিয়াদ — উৎপাদনী সম্পর্কগুলির সমষ্টি, নির্দিষ্ট এক একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপ অনুযায়ী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

বস্তুবাদ — দর্শনের প্রধান দুই ধারায় একটি, দর্শনের মূলগত প্রশ্নে যা সঠিক উত্তর দেয়। ভাববাদের বিপরীতে বস্তুবাদের কাছে বস্তুসত্তাই আদি, চেতনা গৌণ।

বস্তুসত্তা (matter) — চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে

বিদ্যমান এবং চেতনায় প্রতিফলিত অবজেকটিভ বাস্তবতা বোঝায় এমন একটা দার্শনিক বর্গ।

বাজেয়াপ্ত — এক্ষেত্রে একটি সামাজিক শ্রেণী কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে অপর শ্রেণীর সম্পত্তি হরণ (বিনা ক্ষতিপূরণে অথবা ক্ষতিপূরণ সহ)। যেমন, উন্নয়নশীল অনেক দেশে বৈদেশিক একচেটিয়ার সম্পত্তি জাতীয়করণ।

বাড়তি মূল্য — মজুরি-খাটা শ্রমিকের শ্রমশক্তির যা মূল্য, তা ছাড়াও অতিরিক্ত যে মূল্য সে উৎপাদন করে এবং পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করে বিনামূল্যে।

বিকশিত সমাজতন্ত্র — কমিউনিস্ট সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী, অবজেকটিভ ক্ষেত্রে নিয়মসঙ্গত একটি পর্যায়। তার বৈশিষ্ট্য উৎপাদনী শক্তি ও সম্পর্কের উচ্চ মাত্রার বিকাশ, সমাজতন্ত্রের যৌথ ভিত্তির সুসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এই পর্যায়ে সব দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, লোকেদের চাহিদা ক্রমেই পুরোপুরি মিটতে থাকে, তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

বিপ্লব — আমূল ওলটপালট, ইতিহাসের দিক থেকে অচল হয়ে পড়া একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বেশি প্রগতিশীল অন্য আরেকটা ব্যবস্থায় উত্তরণের উপায়।

বিরোধ, দ্বান্দ্বিক — সমস্ত বিষয় ও ঘটনার মধ্যে বিপরীত, প্রতিদ্বন্দ্বী দিক ও প্রবণতা, যা একই সঙ্গে ঐক্য আর প্রতিক্রিয়ায় সংযুক্ত; সমস্ত সত্তার বিকাশের উৎস।

বিশ্ববীক্ষা — বিশ্ব এবং তার নিয়মাদি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির, ধারণাদির সমগ্রতা, যাতে প্রকাশ পায় মানুষের পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা, প্রকৃতি ও সমাজের ঘটনাদি সম্পর্কে তার মনোভাব।

বুর্জোয়া — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে আধিপত্যকারী শ্রেণী, তাদের হাতে থাকে উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপায়াদি, মজুরিতে খাটানো শ্রম শোষণ করে দিন কাটায়।

বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা — অসমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমষ্টি। গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের পর্বে, তার বৈশিষ্ট্য শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক স্বল্পবিকশিত দেশগুলির শোষণ, নয়া-উপনিবেশবাদী সম্প্রসারণ।

বেকারি — পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্নিহিত একটি ঘটনা। এতে শ্রমক্ষম লোকেদের একটা অংশের কাজ জোটে না। শ্রমের মজুদ বাহিনী গড়ে তোলে তারা।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম (সমাজতন্ত্র) — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি মূলাঙ্গ, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়মবদ্ধতা, সমগ্রভাবে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিষয়ে বিজ্ঞান।

বৈরবিরোধ — যে বিরোধ সবচেয়ে তীব্র রূপ নেয় এবং সাধারণত সংগ্রামরত একটি বিরোধী পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে যার অবসান হয়।

ভাববাদ — দর্শনের মূলগত প্রশ্নের সমাধানে বস্তুবাদের বিপরীত একটি প্রধান দার্শনিক ধারা। ভাববাদের কাছে আত্মিকটা মুখ্য, বস্তুটা গোণ। ভাববাদ দুই রকমের — সাবজেকটিভ আর অবজেকটিভ। অবজেকটিভ ভাববাদ আদি হিশেবে ধরে আত্মা, পরম ভাবকল্প, ঈশ্বরকে। সাবজেকটিভ ভাববাদ ব্যক্তিগত চেতনাকে আদি বলে গণ্য করে।

ভাবাদর্শ — দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা ব্যবস্থা, শেষ বিচারে যাতে প্রকাশ পায় সামাজিক শ্রেণীগুলির স্বার্থ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা রূপ দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি অখণ্ড বৈজ্ঞানিক তন্ত্র। প্রকৃতি

ও সমাজের বিকাশের নিয়ম, সমাজতন্ত্রের বিজয়, কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের বিদ্যা।

মালিকানা — উৎপাদনের উপায় এবং তৎসৃষ্ট বৈষয়িক সম্পদ দখল করার অধিকার সূচক পারস্পরিক সম্পর্ক।

মোট সামাজিক উৎপন্ন — সমাজে নির্দিষ্ট একটা কালের মধ্যে (সাধারণত বছর) যে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদিত হয় তার সমষ্টি।

রপ্তানি — বাইরের বাজারে পণ্য, পুঁজি, সেবাব্যবস্থা প্রেরণ।

রাজনীতি, পলিসি — শ্রেণী, জাতি ও অন্যান্য সামাজিক গ্রুপের মধ্যে সম্পর্কঘটিত ক্রিয়াকলাপের ধারা। এ সম্পর্কের মূলকথা হল কোনো একটা শ্রেণী, জাতি, পার্টির স্বার্থে রাষ্ট্র ক্ষমতা জয় করা, বজায় রাখা, কাজে লাগানো।

রাষ্ট্র — শ্রেণী সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল হাতিয়ার।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আধুনিক রূপ, তার বৈশিষ্ট্য হল পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা, ফিনান্স পুঁজির সর্বাধিক মুনাফা লাভ,

শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাভুক্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে একচেটিয়া অর্থনৈতিক শক্তির মিলন।

লেনিনবাদ (প্রতিষ্ঠাতা ভ. ই. লেনিনের নামানুসারে) — মার্কসবাদ বিকাশের নতুন পর্যায়, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ, উপনিবেশবাদের পতন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিজয়ের যুগ, পুঁজিতন্ত্র থেকে মানবজাতির কমিউনিজমে উত্তরণ যুগের মার্কসবাদ।

শোধনবাদ — শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারা, পুনর্বিচার, 'সংশোধন', 'নবায়ন' ইত্যাদির নামে তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করতে চেষ্টিত।

শোষণ — প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের অতিরিক্ত, মাঝে মাঝে আবশ্যিক শ্রমেরও একাংশ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিক কর্তৃক বিনামূল্যে আত্মসাৎকরণ।

শ্রম -- মানুষের উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপ, যে প্রক্রিয়ায় সে প্রাকৃতিক বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে নিজের চাহিদা পূরণ করে।

শ্রমশক্তি — মানুষের খাটবার সামর্থ্য, বৈষয়িক সম্পদ

উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় লোকে যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ করে তার সমষ্টি।

শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার পরম (অনপেক্ষ) অবনতি — পুঁজিতন্ত্রে প্রলেতারিয়েতের জীবনযাত্রার মান নেমে যায়, তা প্রকাশ পায় শ্রমিকদের বর্ধমান বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা পূরণের মাত্রা হ্রাসে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা — নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের মধ্যে (ঘণ্টা, দিন ইত্যাদি) শ্রমিক কর্তৃক যতখানি উৎপাদিত হয়, তার সামর্থ্য।

শ্রমের হাতিয়ার — যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কলকব্জা, যেগুলির সাহায্যে জীবনধারণের উপকরণ লাভের জন্য লোকে জমি চষে, প্রকৃতির সম্পদকে পুনর্গঠিত করে।

শ্রেণী (সামাজিক) — ইতিহাসের দিক থেকে সামাজিক উৎপাদনের নির্দিষ্ট একটি ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান, সর্বাগ্রে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুসারে যারা বিভিন্ন, জনসমষ্টির তেমন সব বড়ো বড়ো গ্রুপ।

শ্রেণী-সংগ্রাম — শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রাম, বিরোধগর্ভ সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলগত চালিকা শক্তি।

সমরশিল্প কমপ্লেক্স — পুঁজিতান্ত্রিক দেশে একচেটিয়া সামরিক শিল্পপতি, সামরিক মহল আর রাষ্ট্রযন্ত্রের আমলাতান্ত্রিকদের জোট, একচেটিয়া পুঁজির প্রভুত্ব কায়েম করার স্বার্থে অস্ত্র প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী।

সমাজতন্ত্র — কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়, উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা এবং সমাজের সমাধিকারী সভ্যদের শোষণমুক্ত শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা — স্বাধীন, সার্বভৌম, সমাধিকারী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহমিতালি, যাদের স্বার্থ ও লক্ষ্য একই, চলেছে সমাজতন্ত্রের পথে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন — আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ প্রক্রিয়া সুবিকশিত করা, তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের মান কাছাকাছি আনা ও সমান করে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রয়াসের মিলন ও পরিকল্পিত সমন্বয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অঙ্গ, ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি লাভ এবং নতুন উন্নততর, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃজনের প্রক্রিয়া।

সামন্ততন্ত্র — দাসপ্রথার জায়গায় আসা বৈরগর্ভ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তার ভিত্তি হল ভূমির ওপর সামন্তদের মালিকানা এবং সামন্তদের জমিতে ছোটো ছোটো কৃষিকর্মে নিযুক্ত কৃষকদের অধীনতা।

সামাজিক শ্রম বিভাগ — সমাজে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যে পার্থক্য, যাতে উৎপাদকেরা জাতীয় অর্থনীতির এক-একটা শাখায় (শিল্প, কৃষি, পরিবহণ ইত্যাদি) বিশেষজ্ঞতা অর্জন করে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — সামাজিক বিকাশের এক-একটা ধাপ, ইতিহাসের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী উপরিকাঠামো।

সাম্রাজ্যবাদ — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র, তার বিকাশের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল।

সার্বভৌমত্ব — অভ্যন্তরীণ ও বহির্নৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ তাতে চলতে পারে না।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশনালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers,
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union.

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

সেলেজনেভ ল., ফেতিসভ ভ.। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)।

জটিল সংজ্ঞা ব্যবহার এড়িয়ে লেখকদ্বয় বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বকে পাঠক দরবারে হাজির করেছেন, উল্লেখ করেছেন আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য ও জটিলতার কথা এবং পেশ করেছেন এর সাধারণ রূপরেখা আর তা রপ্তের নানা পথ ও পদ্ধতি।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী অনুধাবনে যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম চর্চার প্রয়োজন আছে, এই বইয়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যকার সংগ্রামের পটভূমিকায় আধুনিক সামাজিক বিকাশের বিশ্ব সমস্যাবলীর অনুসন্ধান চালিয়েছে।

বইটি রচিত হয়েছে সাধারণ পাঠকবৃন্দের কথা মনে রেখে।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

কিরিলেঙ্কো গ., করশ্‌নভা ল.। দর্শন কী? (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)।

দর্শন কী? এর উৎস কোথায় এবং এর বিষয়বস্তু কী? প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের নিয়মকানুনই-বা কী? পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে মানুষ কীভাবে জ্ঞান লাভ করে? দর্শন কি জ্ঞান অথবা দৃঢ় বিশ্বাস? এই বইয়ের লেখকদ্বয় এইসব এবং দর্শন জগতের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

জনবোধ্য আকারে লিখিত এই বইয়ে স্থানলাভ করেছে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নানা নিয়ম ও বর্গের বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান চালিয়েছে জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিশাস্ত্র বিকাশের, এবং খুলে ধরেছে বিজ্ঞান রূপে দর্শনের শ্রেণী চরিত্র।

বইটি রচিত হয়েছে দর্শনের নানা প্রশ্নে আগ্রহী সবার জন্য।

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ·আ·ক·খ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বই:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সহায়িকা
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
অর্থশাস্ত্র কী
দর্শন কী
বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
পুঁজিতন্ত্র কী
সমাজতন্ত্র কী বোঝায়
কমিউনিজম কী
শ্রম কী
উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
সম্পত্তি-মালিকানা কী
শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম
পার্টি কী
রাষ্ট্র কী
বিপ্লব বলতে কী বোঝায়
উৎক্রমণ পর্ব বলতে কী বোঝায়
মেহনতি মানুষের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়
বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী